জামারানের পীর

ইমাম খোমেনী (রহঃ) স্মরণে নিবেদিত সংকলন

بسم الله الرحمن الرحيم

জামারানের পীর

ইমাম খোমেনী (রহঃ) স্মরণে নিবেদিত সংকলন

জামারানের পীর

ইমাম খোমেনী (রহঃ) স্মরণে নিবেদিত সংকলন

প্রকাশকাল ঃ
২৪ জিলহজ্জ, ১৪১৪ হিজরী
২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০১ বাংলা
৪ জুন, ১৯৯৪ ঈসায়ী

প্রকাশনায় ঃ
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
বাড়ী নং-৫৪, সড়ক নং-৮/এ
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা-১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৩২৯৩৬৩, ৩২৯৩৭০

প্রচ্ছদ ঃ
আরিফুর রহমান

মুদ্রণ ঃ
চৌকস, ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা - ১০০০,
ফোন - ৪১৪৩৯৩, ৪১১৫৪৯

JAMARANER PEER

A Compilation dedicated in memory of Imam Khomeini (R:) Published on the occasion of the 5th demise anniversary of Hazrat Imam Khomeini (R:). The great leader of the Islamic Revolution and founder of the Islamic Republic of Iran, By Cultural Centre of the Islamic Republic of Iran. House No. 54, Road No. 8/A, Dhanmondi R/A, Dhaka, Bangladesh.

মুখবন্ধ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) একটি প্রজ্বলিত শিখার নাম, একটি ইতিহাস। আদর্শছোঁয়া ব্যক্তিত্বের মূর্ত প্রতীক, সংগ্রামী চেতনার সরব অভিব্যক্তি।

ইমাম খোমেনী (রহঃ) এমন একটি প্রতীকী নাম যিনি ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিত্বে উন্নীত হয়েছিলেন। সংগ্রামের কন্টকাকীর্ণ পথ বেয়ে ,ইসলামী আদর্শকে ধারণ করে, আধ্যাত্মিক চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে এ জ্ঞান তাপস হয়ে উঠেছিলেন প্রাজ্ঞ; এবং যথার্থ অর্থেই একজন জিন্দাপীর।

যিনি স্বীয় জীবনের অর্থ খুঁজতে আল্লাহর রাহে উৎসর্গিত হয়েছিলেন কায়মনোবাক্যে। আমলে, জীবনাচারে, সংগ্রামে, নির্দেশনায় তিনি ছিলেন ভারসাম্যের আধার।

জ্ঞান সাধনা ও অনুশীলনের পথে তিনি যেন বহতা নদী। সতত প্রবহমান ঝর্ণাধারা। একইসাথে ধর্মশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র ও সুফীবাদে অসাধারণ পাণ্ডিত্য তাঁকে দিয়েছে প্রকৃত জীবনের সন্ধান, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে করেছে পারদর্শী। জ্ঞান রাজ্যে প্রবেশ করে চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জনের মাধ্যমেই তিনি পা বাড়িয়েছিলেন সংগ্রামমুখর জীবনের পথে। তাই আমৃত্যু জ্ঞান তাকে দিয়েছে দিশা, আমল দিয়েছে ভরসা। দূরদৃষ্টি, দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞা তাঁকে করেছে আপোষহীন। সমস্ত গায়রুল্লাহর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাগুত ও মিথ্যার বিরুদ্ধে খোদার সৈনিক হিসেবে দাঁড়াবার হিম্মত।

গভীর ও দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত ইতিহাসের এ বিরল ব্যক্তিত্ব শুধু বিপ্লবের রূপকারই ছিলেন না, সফল বিপ্লবের নায়ক এবং সংগঠকও ছিলেন। শুধু বিপ্লবীই ছিলেন না, একটি জাতিসত্তার উত্থানকে সংস্কারের ছোঁয়ায় এমনভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন যার নজির সমসাময়িক ইতিহাসে একটিও নেই।

তাঁর ব্যতিক্রমী দিক নির্দেশনা, দাওয়াত ও অছিয়ত পৃথিবীর জালেমদের মাথাব্যথার কারণ হলেও তিনি ছিলেন দুনিয়াজোড়া স্বাধীনতাকামী ও মজলুম মোস্তাজাফদের পরীক্ষিত বন্ধু। শুধু ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রেক্ষাপটেই নয়, বিশ্ব মানবতা ও সংগ্রামী মানুষের বন্ধু মহান ইমাম যেন জীবদ্দশার চেয়েও আজ অধিকতর শক্তিশালী। অনেক বেশী প্রেরণার, অনুকরণ ও অনুসরণের অনুপম এক পবিত্র স্মৃতিময় উৎস।

তাই দুনিয়াজুড়ে ইমাম খোমেনী (রহঃ) হয়ে উঠেছেন গবেষণার সমৃদ্ধ বিষয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তি চরিত্র, নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য, বিপ্লবের ধরন, সমাজ বদলের রূপরেখাসহ তাঁর রেখে যাওয়া কর্মময় বর্ণাঢ্য জীবন নিয়ে সাধারণ মানুষ থেকে

বিজ্ঞ জনগোষ্ঠী সবাই প্রচুর ভাবছেন। ইসলামী ঐতিহ্য ও চেতনাসমৃদ্ধ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম ভ্রাতৃপ্রতিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের জনগণ শুরু থেকেই বিপ্লবের শর্তহীন সমর্থক ও অনুসন্ধিৎসু পর্যবেক্ষক। ইমামের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও মমত্ববোধ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বহুবার। রুশদী ইস্যু, হজ্ব প্রসঙ্গ, কুদস দিবসসহ আন্তর্জাতিক প্রতিটি বিষয়ে ইমামের ভূমিকাকে বাংলাদেশের মানুষ হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছে, প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে একজন যথার্থ অভিভাবকের ও আধ্যাত্মিক নেতার নির্দেশনা ভেবে।

৪ জুন '৯৪ ইমামের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী। ইসলামী ইরানের বাইরেও মুসলিম উম্মাহ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে এ মহান নেতাকে। সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা ও স্মরণ সভা ছাড়াও দেশে দেশে নতুন নতুন প্রকাশনা ইমাম খোমেনী (রহঃ) চর্চার পরিধিকে করেছে ব্যাপক ও বিস্তৃত। বাংলাদেশের খ্যাতিমান ও প্রতিনিধিত্বশীল শিক্ষাবিদ, কবি-সাহিত্যিক-প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, আলেম ও বুদ্ধিজীবীদের হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার প্রতিফলন হিসেবে প্রকাশিত হলো ইমাম খোমেনী (রহঃ) স্মরণে নিবেদিত সংকলন 'জামারানের পীর'।

এ সংকলন শুধু ভালোবাসা ও শ্রদ্ধারই নয়; ইমামকে চর্চার নতুন মাত্রাও বটে। যাদের হৃদয় ছোঁয়া লেখায় এ সংকলন সমৃদ্ধ হলো তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানানোকে দায়িত্ব ভাবছি। সেই সাথে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা এমন একটি প্রকাশনাকে সম্ভব করেছে তাদের সবার প্রতি আমাদের থাকছে আন্তরিক মোবারকবাদ।

সীমাবদ্ধ আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে হলেও এ সংকলনে ইমাম খোমেনী (রহঃ)কে তুলে ধরার প্রয়াস ছিলো। তারপরও বলা যাবে না কিংবা দাবী করা সঙ্গত হবে না যে 'জামারানের পীর' একটি সম্পূর্ণ সংকলন।

এ সীমাবদ্ধতা স্বীকার করার পরও আমরা আশা করি এ সংকলন ইমামকে বুঝতে – জানতে সহায়ক হবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইমাম খোমেনী (রহঃ)-কে জান্নাতে উত্তম বিনিময় দিন। আমাদের দিন নাজাতের উৎকৃষ্ট পথের সন্ধান।

খোদা হাফেজ।

আলী আতারসাজী
কালচারাল কাউন্সেলর
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

সূচীপত্র

ইমাম খোমেনী ঃ আমার সাক্ষ্য ঃ সৈয়দ আলী আহসান ৯

ইমাম খোমেনীর রাজনৈতিক দর্শন ঃ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ১৫

এই যুগের এক সুফী সাধক ঃ ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী ২৩

ইমাম খোমেনী ঃ তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কবি মানস ঃ শাহাবুদ্দীন আহমদ ২৭

Imam Khomeini's Efforts in Unity of the Muslim Ummah : Dr. Md. Gholam Rasul ৩২

সমকালীন বিশ্বে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা এবং ইমাম খোমেনী (রহঃ) ঃ ডঃ আবু বকর সিদ্দীক ৪৮

বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার ঔপনিবেশিক স্বরূপ ও ইমাম খোমেনী'র (রহঃ) চিন্তাধারা ঃ অধ্যাপক আবদুন নূর ৫৯

মুসলিম ও মজলুম জনতার মুক্তির দিশারী ঃ সৈয়দ তোসারফ আলী ৬৯

ইসলামী বিপ্লবের সফল নায়ক ঃ আবুল কালাম আযাদ ৭৩

ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বের অপরিহার্যতা ঃ ডক্টর আব্দুর রহমান সিদ্দিকী ৭৯

ইমাম খোমেনী (রহঃ) ও বিশ্বের নির্যাতিত জনগণ ঃ আবদুল মুকীত চৌধুরী ৯৫

Imam Khomeini (R:) : His Contribution in Revival of True Islam : Masood Nizami ১০৫

প্রকৃত ইসলামের উপস্থাপন ও জাতিসমূহের উত্থানে ইমাম খোমেনী (রঃ)–এর ভূমিকা ঃ আজিজুল হক বান্না ১১১

কিংবদন্তীর পুরুষ ইমাম আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী ঃ অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম ১২৫

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী চক্রের মোকাবেলায় ইমাম খোমেনী (রহঃ) ঃ মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব ১৩১

১৪০০ শতকের আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব ইমাম খোমেনী ঃ ডঃ মোসলেহ উদ্দিন আহমদ তারেক ১৬০

তথ্য সাম্রাজ্যবাদ ও ইমাম খোমেনী ঃ মাসুদ মজুমদার ১৬৩

The Role of Imam Khomeini (R:) in The Resurgence of Real Islam in The Contemporary World : Muhammad Muzahidul Islam ১৮২

ইমাম খোমেনী ঃ একজন নির্ভরযোগ্য অভিভাবক ঃ অধ্যাপক ওয়াসেক বিল্লাহ ১৯৩
ইমাম খোমেনী (রহঃ) ছিলেন যোগ্য ওয়ারিশে নবী ঃ
এ কে এম মাহবুবুর রহমান ২১১
ইমাম খোমেনী (রহঃ) এবং নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা ঃ সাজ্জাদ পারভেজ ২২৫
ইমাম খোমেনী (রহঃ)–এর সফলতার কারণ ঃ জহির উদ্দিন মাহমুদ ২৩৫
ইমাম খোমেনী (রহঃ)–এর জীবনধারা ও চিন্তাধারা ঃ মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ ২৫৫
অসহায় মেঘের তিমিরে ঃ তালিম হোসেন ২৮১
জড়ীন শড়কের গান ঃ আশরাফ সিদ্দিকী ২৮২
ধারালো তলোয়ার (ইমাম খোমেনীর) ঃ আবদুস্ সাত্তার ২৮৫
সিন্দাবাদ ঃ আবুল খায়ের মুসলেহ উদ্দিন ২৮৬
Ayatullah Ruhullah Khomeni : A A Rezaul Karim Chowdhury ২৮৭
ইমাম খোমেনী ঃ মরহুম মেজর (অবঃ) এম, এ, জলিল ২৯১
IAMAM-E MUJTAHID-O-INQELAB-E-IRAN - Jamal Mashriqi ২৯২
রাখালের বাঁশির সুরে ঃ সিরাজুল হক ২৯৪
ইমামের উষ্ণীষ ঃ হাসান আবদুল কাইয়ুম ২৯৭
বিপ্লব ও মহান ইমাম ঃ আবদুল মুকীত চৌধুরী ২৯৮
তোমার আগমনে ঃ মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান ৩০০
ইমাম ঃ আবদুল হাই শিকদার ৩০২
মর্দে মুমিন ঃ মুহাম্মদ ঈশা শাহেদী ৩০৬
ইমাম ঃ সৈয়দ মুসা রেজা ৩০৭
আল্লাহ তো তাঁর উপর রহমত নাজিল করবেনই ঃ আহছান–উস–সামী ৩০৮

ইমাম খোমেনী ঃ আমার সাক্ষ্য

সৈয়দ আলী আহসান

জীবনে আমরা অনেক বিস্ময়ের সম্মুখীন হই এবং কোন কোন বিস্ময়ের ব্যাখ্যা আমরা খুঁজে পাই না। জীবনের ধারাক্রমের মধ্যে হঠাৎ কখনও ব্যতিক্রম আসে এবং সে ব্যতিক্রম সমগ্র জীবনের রূপ ব্যঞ্জনার পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। ইরানের ইসলামী বিপ্লব এরকম একটি ঘটনা। কেউ কি কখনও ভাবতে পেরেছিলেন যে, ইরানের শাহ একটি আদর্শের প্রবল আক্রমণে চরমভাবে শক্তিহীন হয়ে পড়বেন। ইরানকে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলেছেন। পাশ্চাত্যের সহায়তায় এক বিপুল অস্ত্র ভান্ডার তিনি গড়ে তুলেছিলেন যার সাহায্যে তিনি ভেবেছিলেন যে, সকল বিরোধিতাকে তিনি নিঃশেষ করবেন। একটি অবিচল দম্ভে তিনি নিজেকে আর্য মিহির বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং মধ্যযুগের কাইরাসের উত্তর সাধক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তার ইচ্ছা যতই আকাশস্পর্শী হোক না কেন, তার দম্ভ যতই প্রবল হোক না কেন, তার নির্মম অসহিষ্ণুতা যতই সর্বনাশা হোক না কেন কিন্তু একদিন ধর্মের অন্তর্গূঢ় শক্তির কাছে সেগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

পাকিস্তান আমলে পাকিস্তানের একনায়ক আইয়ুবের বন্ধু ছিলেন তিনি। আমরা তার গৌরব গাঁথার বহু বিবরণ তখন পড়েছি। সে সময় ইরানের শাহ আপন শক্তির দর্পে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। প্রাচীন পার্শিপোলিশে আকাশচুম্বী কলামবেষ্টিত উন্মুক্ত চত্বরের মধ্যে সেদিন সকল বিদেশী আগন্তুক প্রাচীন পারসিক সাম্রাজ্যের মহিমার নিদর্শন দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। দেয়ালগাত্রে অঙ্কিত প্রাচীন যুগের শিল্পীদের উৎকীর্ণ চিত্রাবলীর পাশে দাঁড়িয়ে সকলেই ভাবতে বাধ্য হয়েছিলেন যে আমরা একটি প্রাচীন মহিমার বিস্তারের মধ্যে অবস্থান করছি। কিন্তু এই সমস্ত প্রকাশ্য মহিমা এবং প্রতাপের আড়ালে কত নিষ্ঠুর কর্ম ব্যবস্থা যে ছিল তা কেউ জানেনি। শাহের আমলে আমি দু'বার ইরানে গিয়েছি। কিন্তু সেখানকার মানুষের অবস্থা উপলব্ধি করা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। আমি শুধু লক্ষ্য করেছি যে, পাশ্চাত্যের অনুকরণে এমন একটি সভ্যতা ইরানে গড়ে উঠেছে যেখানে ধর্মের বিশ্বাস অস্বীকৃত এবং ধর্মগত বিবেচনার কোন স্থান নেই। শিক্ষিত ইরানীরা আমাকে বলেছেন যে, তারা

লেখক ঃ জাতীয় অধ্যাপক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, খ্যাতিমান কবি ও লেখক।

এমন একটি জীবনধারা অনুসরণ করছেন যে জীবনধারা কর্মের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ধর্মের নীতি থেকে উদ্ভূত নয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন অগ্নিপূজকদের চিহ্নগুলো তারা নিজেদের জীবনের একটি বহমান স্মারক হিসাবে গ্রহণ করতে আগ্রহী। সরকারী ভবনগুলোর শিরোদেশে 'ওহুর মাজদার' প্রতীক চিহ্ন আমি দেখেছি। ইরানের শাহের একজন আত্মীয় পরিহাসচ্ছলে আমাকে বলেছিলেন যে, হাজার বছর ধরে ইসলাম ইরানে আছে, কিন্তু সেখানে একজনও মুসলমান নেই। এই উক্তিতে একটি কথা স্পষ্ট যে, শাহের আমলে চতুর নাগরিকরা ইসলামকে অস্বীকার করে চলত। নিষিদ্ধ পশু ছিল তাদের প্রতিদিনের আহারের উপঢৌকন। সুরা ছিল তাদের আপ্যায়নের সর্বপ্রধান পানীয়। এক কথায় নগরবাসী চতুর ইরানী শিক্ষিত সম্প্রদায় ধর্মকে অবহেলা করতে গৌরববোধ করত। জীবনের সকল ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের অভিপ্রায় এবং আনন্দকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করত। তারা ভাবত যথার্থ বিজয়ের চিহ্ন হচ্ছে ধর্মকে অস্বীকার করে অনিবার্যভাবে পাশ্চাত্যবোধকে স্বাগত করা।

দ্বিতীয়বার শাহের এক আত্মীয় আমাকে কাস্পিয়ান উপকূলে তার বাসায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তার গৃহে পাশ্চাত্য আনন্দ নির্বাহের সকল উপকরণই ছিল। নানা স্বাদের বিদেশী সুরা ছিল, শুকরের মাংস ছিল, স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য 'সৌনাবাথ' ছিল। রাত্রে পুরুষ এবং রমণীর আলিঙ্গনাবদ্ধ নৃত্যের আনন্দ ছিল। সেখানে অনেক অতিথি ছিলেন। ইরানী এবং বিদেশী বহু পুরুষ-রমণী ছিলেন। আমি দর্শক হিসাবে শুধু লক্ষ্য করছিলাম পাশ্চাত্যের উন্মাদনা তাদের দেহে-মনে কি রকম উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে। সে বার কাস্পিয়ান এলাকাটি আমি ঘুরে দেখেছি। রামসর এবং বাবুলসর নামক দু'টি স্থানে বিদেশী ট্যুরিস্টদের জন্য বড় বড় হোটেল তৈরী হয়েছে এবং সেসব হোটেলে নিষিদ্ধ স্বাদের, আনন্দের সুযোগ রয়েছে। আমি আমার বন্ধু সনতীকে জিজ্ঞেস করলাম, "হোটেলগুলো যেসব এলাকায় হয়েছে সেসব জায়গাগুলো আগে কাদের ছিল।" সনতী বলল, "এগুলো দরিদ্র কৃষকদের ছিল। তারা জায়গাটাকে নোংরা করে রেখেছিল। তাই তাদেরকে তুলে দিয়ে জায়গাগুলোকে পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে এবং বিদেশীদের জন্য আকর্ষণীয় করা হয়েছে।" আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "এখন এগুলোর মালিকানা কি সরকারের হাতে?" সনতী একটু বিব্রতভাবে উত্তর করল, "না, এগুলো পাহলভী ফাউন্ডেশনের সম্পত্তি।" সনতী আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল দেশের সংস্কৃতির সমৃদ্ধির স্বার্থে শাহ্ 'পাহলভী ফাউন্ডেশন' গঠন করেছেন।

শাহ ইরানকে পাশ্চাত্যের সর্বাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত করেছিলেন এবং ইরানের সামরিক বাহিনীকে মার্কিন এবং ইহুদী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত করতেন। শাহ ধারণা করতেন যে, তার পাহলভী রাজতন্ত্র আড়াই হাজার বছরের দীর্ঘকালের এবং এই রাজতন্ত্রের অবক্ষয় নেই। তিনি তার রাজতন্ত্রকে প্রবল শক্তিশালী করবার জন্য

বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শ এবং সাহায্য নিতেন। যে তেল ছিল ইরানের সম্পদ সেই তেল সম্পদ দরিদ্র জনসাধারণের কোন কল্যাণে আসেনি। তেলের বিনিময়ে শুধু মারণাস্ত্র আমদানী করা হয়েছে। এ ছাড়া ইরানের অর্থনীতি ছিল পরনির্ভরশীল। ইউরোপের বহুজাতিক করপোরেশনগুলো ইরানে তাদের প্রভাব সম্প্রসারিত করেছিল। ইরানের রাজবংশের লোকেরা, শাহের অনুগত ব্যক্তিবর্গের নির্মম স্বৈরাচারের পেষণে ইরানী জনসাধারণকে দীর্ঘকাল ধরে শাসন ও শোষণ করে আসছিল। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে কোন তৎপরতা কঠোর হস্তে দমন করা হত। 'সাভাক' নামক একটি গুপ্ত পুলিশ বাহিনী শাহের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন করত। এই বাহিনী বহুলোককে নির্মমভাবে হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করেছে।

ইরানে শাহের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদ আরম্ভ হয় তার নেতৃত্ব দেন ইরানের আলেম সমাজ। ইরানে এক সময় বৃটিশদের একচেটিয়া তামাক ব্যবসা ছিল। এই ব্যবসার বিরুদ্ধে আলেম সমাজ ফতোয়া প্রদান করেন এবং তাদের তামাক বর্জনের ফতোয়ার প্রভাব সুদূরপ্রসারী ছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এবং শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে সকল ক্ষেত্রেই আলেম সমাজ সাম্রাজ্যবাদ এবং রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। এর সর্বশেষ পরিণতি ইমাম খোমেনীর ইসলামী বিপ্লব। সর্বপ্রকার জুলুম এবং বঞ্চনা থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করবার জন্য ইমাম খোমেনী যে বিপ্লব আনলেন তার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি নেই। এক অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করেছিলেন এবং জনসাধারণের জন্য দুর্লভ সৌভাগ্য নিয়ে এসেছিলেন, রাজতন্ত্রের অহংকার এবং প্রতাপকে চিরকালের জন্য উচ্ছেদ করেছিলেন, একটি বিরাট পরাক্রমকে দুর্বল এবং হতশ্রী করেছিলেন, ইসলামের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সমস্ত মানুষকে এমনভাবে সংঘবদ্ধ করেছিলেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন এল। ইমামের প্রতিবাদ ছিল পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, বিজাতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, শাহানশাহর নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে। তাঁর সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনায় যে ক্রুদ্ধ আক্রোশ প্রকাশ পেয়েছিল সে আক্রোশের সামনে রাজতন্ত্র তার সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। শাহকে তিনি পরিত্যক্ত ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিলেন। ইমাম খোমেনী তাঁর নির্বাসিত জীবন শেষে দেশে যখন ফিরে এলেন তখন যে সংবর্ধনা পেয়েছিলেন সে সংবর্ধনার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কোন ঘটনা আজকের পৃথিবীতে নেই। আমি সেই সংবর্ধনার তাপ আমার দেশে বসে অনুভব করেছি। আমি কল্পনা করেছি ইমামকে সংবর্ধনার জন্য অগণন মানুষ মেহরাবাদ বিমান বন্দরে সমবেত হয়েছে। এই বিমান বন্দরকে আমি চিনি; দু'বার আমি ইরানে গিয়েছিলাম তখন এই বিমান বন্দরেই আমাকে অবতরণ করতে হয়েছে। অগণন মানুষ তাদের সংবর্ধনার কলকণ্ঠে বিমান বন্দরকে মুখরিত করেছিল। কোথাও তিল ধারণের স্থান ছিল না। চতুর্দিকে শুধু আনন্দে আত্মহারা মানুষ। এ সংবর্ধনার তুলনা নেই। সমস্ত মানুষ তাদের সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে এমন একজন নেতাকে সংবর্ধনা জানাতে এসেছে যিনি অসম্ভবকে

সম্ভব করেছেন। আমার কল্পনার দৃষ্টিতে ভাসছিল মানুষের সাগর। অজস্র মানুষ আত্মহারা, উদ্বুদ্ধ এবং মোহমুগ্ধ, তারা তাদের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে একটি অলৌকিক সময়কে প্রত্যক্ষ করতে এসেছে যখন একজন প্রজ্ঞাবান মানুষ শান্তি এবং সৌভাগ্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য শপথ ঘোষণা করবেন।

দীর্ঘকাল হল ইরানে ন্যায়ের পক্ষে, সত্যের পক্ষে, আর্তের পক্ষে এবং জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণ, আদর্শ এবং সমর্থনের বাণী নিয়ে এসেছিলেন উলেমা সম্প্রদায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অন্য কোন দেশ নেই যেখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ একমাত্র জ্ঞানী সম্প্রদায় করেছেন। ইরানের আলেমগণ তাঁদের জ্ঞানকে, প্রজ্ঞাকে এবং সত্যবাদিতাকে নির্যাতিত সাধারণ মানুষের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। ইসলাম ধর্ম তাদেরকে এমন একটি সাহস দিয়েছিল যে সাহসে বলীয়ান হয়ে প্রতিবাদ উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়েছিল। বিখ্যাত ইংরেজ পন্ডিত এডওয়ার্ড জি ব্রাউন পারস্যের আলেমগণের প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে 'পারসিক বিপ্লব' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থে দেশের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সমস্ত রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিবাদে আলেম সম্প্রদায়ের ভূমিকা ছিল সে ভূমিকার বিস্তারিত বিশ্লেষণ আছে। সম্রাট নাসিরুদ্দিন শাহ ১৮৯০ সালে ইংরেজদের ইরানে তামাক ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার দেন। এই অধিকারের ফলে ইরানের দরিদ্র চাষী সম্প্রদায় উৎপীড়িত হতে থাকে। সেই উৎপীড়নের বিরুদ্ধে একমাত্র আলেম সম্প্রদায়ই নেতৃত্ব প্রদান করেন। ১৮৯২ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ এবং রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন সর্বদাই আলেম সম্প্রদায়। প্রথমে যা ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন ক্রমশঃ তাই শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। এই শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রধান বিষয় ছিল রাজতন্ত্র বিলুপ্ত করে পবিত্র কোরআন ভিত্তিক সংবিধান প্রণয়ন করা। ইরানের পাহলভী সম্রাট বৃটেনের সহায়তায় আন্দোলনের কয়েকজন আলেমকে ফাঁসির রজ্জুতে হত্যা করে। ১৯৫২-৫৩ সালে মোসাদ্দেক যখন ইরানের তৈল সম্পদ জাতীয়করণ করেন তখন বৃটিশরা নানা কৌশল অবলম্বন করে শাহের সাহায্যে মোসাদ্দেকের পতন ঘটায়। এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত শাহের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আলেমদের প্রতিবাদ এবং বিক্ষুব্ধতা চলেছিল গোপনে। ডঃ মোসাদ্দেকের মন্ত্রিসভার পতনের পর আলেমদের বিরোধিতা ক্রমশঃ সংহত হতে থাকে। এ সময়কালেই ইমাম খোমেনী ধর্মীয় চিন্তানায়ক হিসাবে আবির্ভূত হন। তিনি সে সময় কোম নগরে কঠোর ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে আলেম সম্প্রদায় গড়ে তুলছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল ধরে তাঁর ছাত্রবৃন্দকে ধর্মীয় শিক্ষা দেন এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন এবং তাদেরকে নেতৃত্বের উপযোগী করে গড়ে তোলেন। ইমাম খোমেনী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে ধর্মই হচ্ছে বিপ্লবের প্রকৃত স্রষ্টা। তিনি তাঁর দেশে আল্লাহ প্রদত্ত কোরআন ভিত্তিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি

তাঁর শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে জনগণকে পুঁজিবাদ সম্পর্কে সচেতন করেছিলেন। অত্যাচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে সবাইকে কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং রাজতন্ত্রের কুটিল চক্রান্ত সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করে তুলেছিলেন। ইমামের বক্তব্যগুলো তাঁর রচিত 'কাশ্‌ফ-আল-আসরার' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বলা যেতে পারে যে, এ গ্রন্থের মাধ্যমেই তিনি ইরানের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রামের সূত্রপাত করেন। গ্রন্থটিতে তিনি বলেন যে, একমাত্র ধর্মই মানুষকে বিশ্বাসঘাতকতা এবং অপরাধের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। যারা ইরানের রাষ্ট্রীয় কর্ণধার তাদের আদৌ কোন ধর্মবিশ্বাস আছে কিনা সন্দেহ। তারা দেশের স্বার্থরক্ষা করেন বটে কিন্তু বাস্তবে তারা নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। যে সরকার আইন, সদবিচারকে উপেক্ষা করে, সে সরকারের ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই। তিনি আরো বলেন যে, একমাত্র আল্লাহর আইনই পৃথিবীতে টিকে থাকবে এবং সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হয়ে বিদ্যমান থাকবে। এরপর থেকে ইমাম খোমেনীর বিরুদ্ধে শাহের অত্যাচার বৃদ্ধি পেতে থাকে। আয়াতুল্লাহ বরুজারদীর ইন্তেকাল ঘটে ১৯৬১ সালে এবং তারপর একমাত্র ইমাম খোমেনীর ধর্মীয় নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটে। দেশের জনসাধারণ মনে-প্রাণে ইমাম খোমেনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করল এবং বিশ্বাস করতে লাগল যে, দেশের মুক্তি এই মহান নেতার মাধ্যমেই আসবে। তারা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করল যে, দেশের সবকিছুর শেষ মীমাংসা তাঁরই হাতে। ইরানের শাহ তখন অনুভব করতে লাগলেন যে জনসাধারণ তার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। এভাবেই ইমাম খোমেনী হয়ে পড়েছেন তার প্রবল প্রতিপক্ষ। শাহ তখন তার সেনাবাহিনী দিয়ে কোম শহর অবরোধ করেন এবং ইমাম খোমেনীকে বন্দী করেন। খোমেনীর গ্রেফতারের সংবাদ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়লে জনতা তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এরপর থেকে আরম্ভ হল ইমামের ওপর নানা রকম নির্যাতন। শাহ তখন ইমামকে দেশে অবরুদ্ধ রেখেছিলেন। কিন্তু তাতে ফল হয়নি। জনসাধারণের আবেগকে দমিয়ে রাখা যায়নি। শেষ পর্যন্ত ইমামকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। অবশেষে ১৯৬৪ সালে তুরস্কের ইজমিরে ইমাম খোমেনীকে নির্বাসন দেয়া হয়। এক বছর পর ১৯৬৫ সালে ইমামকে ইরাকের নাজাফে নির্বাসন দেয়া হয়। ইমামের সর্বশেষ নির্বাসন ঘটে ফরাসী দেশে। ইরাকে বাথ সরকার শাহের ইচ্ছানুসারে ইমামকে নানাভাবে অসুবিধায় ফেলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তিনি ইরাক থেকে প্যারিসে চলে যান এবং সর্বশেষে বিজয়ী নেতা হিসাবে ইমাম স্বদেশে ফিরে আসেন। তখন শাহের সর্বশেষ চিহ্নটুকু মুছে গেছে। দেশের অগণিত মানুষ অবিশ্বাস্য ত্যাগ এবং কোরবানী দিয়ে দেশকে কুশাসন থেকে মুক্ত করেছে। ইমাম খোমেনী দেশে ফিরে এসে বলেন যে, আমরা শাহের দুঃশাসন বহুদিন সহ্য করেছি। শাহের সাহায্যে আমেরিকা আমাদের সকল সম্পদ গ্রাস করেছিল। এ অবস্থা আর আমরা হতে দেব না। আমরা শাহের শাসনের সকল চিহ্নকে মুছে ফেলে

দিয়ে জনগণের ভোটে একটি সাংবিধানিক সংসদ এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রথম স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠা করব।

ইরানে ইসলামী বিপ্লবের সাফল্য সারাবিশ্বে অবিশ্বাস্য এক বিস্ময়কর ঘটনা। কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলমানদের ইতিহাসে বহু সাফল্যের ঘটনা থাকলেও এবং ইসলামী আইনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বহু মনীষীর আজীবন সংগ্রাম থাকলেও ইমাম খোমেনীই প্রথম জননায়ক যিনি একটি শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উৎখাত ঘটিয়েছেন এবং একটি যথার্থ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইমাম খোমেনীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কি করে তিনি তাঁর বিপ্লবকে সফল করলেন। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "মহান আল্লাহর নির্দেশেই তা সফল হয়েছে, আমার চেষ্টায় নয়।" যথার্থই এ সফলতা এসেছে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্যের ফলে। আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরশীলতা এবং তাঁরই সাহায্যের ফলে। ইমাম খোমেনী নিছক রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে কাজ করেননি। তিনি কেবল আল্লাহ এবং রাসূলের নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলেছেন মাত্র।

আমার জীবনে আমি অনেক ঘটনার সাক্ষ্য হয়েছি এবং যে সকল ঘটনার সাক্ষ্য হয়েছি তা এই উপমহাদেশ এবং আমার স্বদেশকে কেন্দ্র করে। প্রত্যক্ষদর্শী হওয়া ছাড়া অনেকগুলো ঘটনার অংশীদারও ছিলাম। কিন্তু আমার চিন্তাকে এবং মানসিকতাকে যে আন্দোলনটি সর্বাপেক্ষা অভিভূত করেছে তা হচ্ছে ইরানের ইসলামী বিপ্লব। এই বিপ্লবটি আমি প্রত্যক্ষ করিনি, কিন্তু এই বিপ্লব আমার মধ্যে এ বিশ্বাস এনে দিয়েছে যে ইসলামের শাশ্বত আদর্শকে যদি অবলম্বন করা যায় যে আদর্শ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, বিনয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং মানব কল্যাণের জন্য নিয়োজিত এবং নির্দেশিত সে আদর্শের জয় হবেই। বিধাতার ইচ্ছা যেখানে সকল সত্যকে ধারণ করে, সেখানে অসম্ভবও সম্ভব হয়। ধর্মের বিশ্বাসটি প্রথাগত ধর্মীয় আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ধর্মীয় বিশ্বাসটি যখন বিশুদ্ধ চিত্ত থেকে জাগে তখন তা সকল সর্বনাশকে বিনষ্ট করে মানুষকে সম্মানের বেদীতে বসায়। মানুষ তখন আল্লাহর প্রতিনিধি হয় এবং আল্লাহর সহায়তায় রাষ্ট্রীয় জীবনে, সামাজিক জীবনে এবং সাংস্কৃতিক জীবনে সফলতার প্রতিষ্ঠা ঘটায়। ইমাম খোমেনী তাঁর বিশ্বাসের দ্বারা, ত্যাগ ও বিনয়ের দ্বারা এবং আল্লাহর উপর অকুণ্ঠ নির্ভরতার দ্বারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

পার্থিব জীবনে ইমাম খোমেনী এখন নেই, কিন্তু তাঁর সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের প্রত্যক্ষে রয়েছে। তিনি তাঁর আদর্শের সিদ্ধির মধ্য দিয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

ইমাম খোমেনীর রাজনৈতিক দর্শন

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

বিংশ শতাব্দীতে যে সকল ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে ইমাম খোমেনীর বিপ্লবকে একটা প্রধান ঘটনা বলে অভিহিত করা যায়। এ বিপ্লবের ফলেই তিনি দেশ থেকে স্বৈরাচারী শাহের শাসনের অবসান করে ইসলামী শাসন প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন। যে কোন দেশের বা রাষ্ট্রের শাসনের প্রেক্ষাপটে একটা দার্শনিক মতবাদের ক্রিয়াশীলতা থাকে। আমেরিকার শাসনের প্রেক্ষাপটে যেমন গণতান্ত্রিক দর্শন বিরাজমান, তেমনি কিছুদিন পূর্বেও সোভিয়েত রাশিয়ার পটভূমিতে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ কার্যকর ছিল। বর্তমানে বিচ্ছিন্ন হলেও কোন কোন রাষ্ট্রে এখনও সমাজতন্ত্রের নীতি চালু রয়েছে।

ইমাম খোমেনী এবং তাঁর পরবর্তী রাষ্ট্রনায়কগণের নানা উক্তিতে দাবী করা হচ্ছে তারা তাদের রাষ্ট্রে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যে ইসলামী শাসনের ভিত্তি হচ্ছে আল্ কুরআন ও সুন্নাহ। এজন্য আল-কুরআন ও সুন্নাহতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র বা সরকারের রূপ কিরূপ সে সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন। মুসলিম জীবনে-ধর্ম ও রাজনীতিতে কোন পার্থক্য নেই। কোনও বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে ধর্মের ক্ষেত্রে মুসলিম, আর রাজনীতিতে সমাজতন্ত্রবাদী হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এজন্য ইমাম খোমেনী ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে মুসলিমদের পক্ষে ধর্মীয় ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রেই গ্রহণ করেছেন।

এ দুনিয়ায় ইসলাম প্রচারিত হওয়ার পরে হযরত রাসূল-ই-আকরাম (দঃ) এবং তারপরে খোলাফা-ই রাশেদীন যে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন তা সম্পূর্ণভাবে ইসলাম ভিত্তিক ছিল। তবে হযরত আলীর শাহাদাতের পরে প্রথমে উমাইয়াদের এবং তাদের পরে আব্বাসীয়দের শাসনকালে তা ক্রমশঃ ইসলামী ব্যবস্থা থেকে সরে যায়। যদিও মুসলিমরা এ দুনিয়ার নানা যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে, তবুও ইসলামের মূলনীতি কুরআন-উল-করীম ও হাদিস শরীফের ভিত্তিতে তারা পরবর্তীকালে রাষ্ট্র বা সমাজ গঠন করেনি। একজন মুসলিম মনীষী মন্তব্য করেছেন- Islam has its birth at Mecca, its growth at Medina, its decay

---

লেখক ঃ জাতীয় অধ্যাপক, খ্যাতিমান দার্শনিক ও লেখক।

at Damascus and its death at Baghdad. অর্থাৎ ইসলামের জন্ম হয় মক্কায়, তার বৃদ্ধি হয় মদীনায়, তার ক্ষয় হয় দামেস্কে এবং মৃত্যু হয় বাগদাদে। তার এ কথাগুলোর মধ্যে আংশিক সত্য রয়েছে। ১২৫৮ খৃঃ অব্দে হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস হওয়ার পরে যদিও উসমানী তুর্কিগণ ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার উত্তর কূলে এক বিরাট সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করেছিল, তবুও সে সাম্রাজ্যে তারা কুরআন ও সুন্নাহর আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা করেনি। বরং উল্টো দিকে তারা তাদের বিশেষ বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। এ ধারা দীর্ঘকাল ছিল অব্যাহত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এ দুনিয়াতে আবার ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য সৈয়দ জামাল উদ্দীন আল্ আফগানী তাঁর Pan-Islamism বা নিখিল বিশ্বে ইসলামী মতবাদ প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। তবে তিনি তাঁর জন্মস্থান ইরানে বা তৎকালীন প্রধান মুসলিম দেশ তুর্কিতে বা মুসলিম প্রধান মিশরে ঠাঁই পাননি। তিনি মুসলিম প্রধান দেশগুলো থেকে অমুসলিম স্বৈরাচারীদের শাসনের অবসান করে সে দেশগুলোকে সংঘবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তবে তিনি ইসলামে রাজনৈতিক দর্শন কী তা সূক্ষ্মভাবে বলেননি। সম্ভবতঃ স্বেচ্ছাচারিতা ও ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের কারণে তিনি এ সব ব্যাপারে নজর দেয়ার সময় পাননি।[১] সৈয়দ জামালের পরে যে ব্যক্তি সুন্নী বিশ্বে বিশেষত আরব সমাজে সংস্কারক হিসাবে দেখা দিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন শেখ মুহাম্মদ আবদুহু। মূলতঃ দু'জনেই ইসলামের মৌলিক উৎসগুলোর দিকে প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন। দু'জনেই ধর্মীয় অনুশাসনগুলোর বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যার উপর জোর দিয়েছিলেন। তবে সৈয়দ ছিলেন অনিবার্যভাবে একজন যোদ্ধা ও কর্মী। আবদুহু ছিলেন একজন সংস্কারক ও চিন্তাবিদ। সৈয়দ মনে করতেন যে মুসলমানদের স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র পথ হচ্ছে তাদের জাগরণ। কিন্তু আবদুহু মুসলমানদের নৈতিক ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণের উপর বেশী জোর দিতেন।[২] তবে তাদের মধ্যে কেউই ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের নীতি সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেননি।

তাদের পরবর্তী শেখ আব্দুর রহমান কাওয়াকেবীও একজন চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তুর্কী একনায়কত্বের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তবে তিনিও কোন ইসলামী রাষ্ট্রের পরিকল্পনা পেশ করেননি। তাঁদের পরবর্তী সুন্নী চিন্তানায়কদের মধ্যে ছিলেন-আল্লামা ইকবাল লাহোরী। খোমেনীর চিন্তাধারা অনুসারে পাশ্চাত্য সম্বন্ধে তার গভীর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও ইকবাল বিশ্বাস করতেন যে মানব জাতির একটা সঠিক জীবন হতে প্রতীক বঞ্চিত। একই সাথে তিনি বিশ্বাস করতেন যে মুসলমানের কাছেই সেই মহাদর্শের সওগাত এসেছে। তাই তিনি মুসলমানদের পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও সম্পদ আহরণ করতে বললেও তাদের প্রতীকে সব ধরনের ইজমের প্রভাব থাকার ব্যাপারে সতর্ক করে দেন।[৩]

ইকবালের গুণাবলীর আরও একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আবদুহুর মত তিনিও কয়েকটা সমস্যা নিয়ে বিব্রত ছিলেন। তাঁর চিন্তা ছিল ইসলামের মৌলনীতি লংঘন না করে কিভাবে সম-সাময়িক আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান বের করা যায় সে সম্পর্কে আবিষ্কার করা। এ কারণে তিনি ইজতেহাদ ও ইজম প্রভৃতি বিষয়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করছিলেন। তাঁর কাছে বস্তুতঃ ইজতেহাদের হাদই ছিল ইসলামের মূল চালিকা শক্তি। ইকবালের আরো একটা কৃতিত্ব হচ্ছে তিনি ছিলেন একজন কবি এবং মুসলিম সমাজের দুঃখ-দৈন্য প্রভৃতিকে তিনি কাব্যে প্রকাশ করে তাদের আবার জীবনের জয়যাত্রার পথে উদবোধিত করেছিলেন। এ কথা সত্য যে তিনি তাঁর জীবনে মুসলিমদের জন্য একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন এবং সে রাষ্ট্র কুর'আন-উল-করীম ও হাদিসের বিধি-বিধান অনুসারে গঠিত হবে। তা সত্ত্বেও সে রাষ্ট্রের কাঠামো কিভাবে গঠিত হবে তার রূপ তিনি দিয়ে যেতে পারেননি। অনেকেই হয়ত জানেন না ১৯৩৮ সালে ইকবালের ইন্তেকালের পরে ১৯৪৭ সালে এ উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পূর্বে ও পশ্চিমে দুই খণ্ডে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনতিকাল পূর্বে, বোম্বাই শহরের মওদুদী মহল্লা নিবাসী সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্ভাব্যরূপ সম্বন্ধে কয়েকখানা পুস্তিকা লিখেছিলেন। সেরূপ পূর্ব পাকিস্তানে হিজরত করার পূর্বে ভারতের বর্ধমান নিবাসী আবুল হাশিম তাঁর Creed of Islam নামক ইংরেজীতে লিখিত পুস্তকে ইসলামী রাষ্ট্রের একটি রূপ তুলে ধরেছিলেন। তাকে এক্ষেত্রে অনুসরণ করেন মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী ও সুপ্রসিদ্ধ মাওলানা আকরম খাঁন। পরে ইসলামী রাষ্ট্র সম্বন্ধে পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য লোক আরও পুস্তকাদি প্রণয়ন করেছেন। শিয়াদের মধ্যে প্রথমে সংস্কার আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। প্রথমে মির্জা হাসান শিরাজী কর্তৃক পরিচালিত তামাক আন্দোলনকে শিয়ারাই পরিচালনা করেছিলেন। পরে আরও নানা বিষয়ে সংস্কার আন্দোলন দেখা দিলেও তারা এতে সক্রিয় না থাকায় কেবলমাত্র খোদাতাআলার মদদের উপর নির্ভর করার জন্য এ আন্দোলনগুলো ব্যর্থ হয়।

তারপরে দেখা দেয় ইরানের ইসলামী আন্দোলন। এ আন্দোলনের মধ্যে নানা দিক ছিল। তবে তার মধ্যে যেগুলো ছিল সর্বপ্রধান সেগুলো-

(১) ইরানের বুক থেকে নিরংকুশ ও বর্বরোচিত স্বৈরাচারের অবসান;

(২) সবধরনের স্বাধীনতা লাভ;

(৩) ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে ব্যবধান লোপ;

(৪) ইরানী মুসলিমদের নৃশংস হত্যা, রাজনৈতিক বন্দীদের কারাদণ্ড প্রদান ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ;

(৫) ইসলামী আইনের লংঘন, সরাসরিভাবে বা সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের দুর্নীতির প্রতিরোধ।

এভাবে ইরানে যে বিপ্লব দেখা দেয় তারই পরিণতিতে সে দেশে বর্তমানে ইরানী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ইমাম খোমেনীকে তাঁর সহযাত্রী কর্মীদের নিয়ে দীর্ঘকাল সংগ্রাম করতে হয়েছে। তিনি মহাবিপ্লবের পূর্বে নির্বাসিতও ছিলেন। বিপ্লবে জয়ী হয়েও তিনি তাঁর সমাজের জন্য কোন নির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করে যাননি। তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি বিভিন্ন স্থানে যে সকল বক্তৃতা দিয়েছেন সেগুলো থেকেই ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁর ধারণা প্রকাশ পেয়েছে এবং সেগুলোর আলোকেই বর্তমানকালে ইরানে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে।

তাঁর এ বিপ্লবের মূল লক্ষ্য ছিল তাঁর দেশে পরদেশীয় ও পরধর্মাবলম্বীদের নির্দেশে এবং অনুকরণে যে সমাজ গঠিত হয়েছে, তাকে সমূলে উৎখাৎ করে বিশুদ্ধ ইসলামী সমাজের প্রতিষ্ঠা। তাঁরই নির্দেশে ১৯৮৬ সালে তেহরানে তাদের বিজয়ের সপ্তম বার্ষিকী পালিত হয়। তাতে লেখক আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেছিলেন এবং ফার্সিতে বর্ণিত তাঁর ভাষণের ইংরেজী তরজমা শুনেছেন। তাঁর এ ভাষণ, অন্যান্য ভাষণ ও পুঁথি-পুস্তিকা থেকে যা সংগ্রহ করা হয়েছে তা থেকে তাঁর রাষ্ট্রীয় দর্শনকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যায়।

কুরআনুল করীম ও হাদীসের গ্রন্থাবলীই হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের মৌল ও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আর ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে মুজতাহিদগণ ইসলাম সম্পর্কে যে সব গ্রন্থাদি রচনা করেছেন এ দু'য়ের মধ্যে মৌলিকতার দিক দিয়ে যে পার্থক্য রয়েছে তা অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে। কেননা কুরআন ও হাদীসের গ্রন্থাবলীতে মানুষের সমগ্র জীবনকে অভিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন করে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে পেশ করা হয়েছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধান। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, মানুষের বাস্তব জীবন ও সমাজ সমষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পর্যায়ের কুরআনী আয়াতসমূহ ব্যক্তিগত ইবাদত সংক্রান্ত আয়াতের তুলনায় অনেক অনেক বেশী। হাদীসের যেকোন গ্রন্থ খুললেই তোমরা বুঝতে পার-সে তিনটি অধ্যায় হচ্ছে ইবাদত-বন্দেগী পর্যায়ের, আল্লাহর সংগে মানুষের সম্পর্ক পর্যায়ের আর নৈতিক চরিত্র পর্যায়ের কিছু সহজ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আর এ ছাড়া আর যা কিছু হাদীসের কিতাবাদিতে রয়েছে তা সবই সমাজ সমষ্টি। অর্থনীতি, মানবাধিকার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও সামষ্টিক রাজনীতি পর্যায়ের।[৪]

এতে সুস্পষ্টই বুঝা যায় ইমাম খোমেনী ইবাদত-বন্দেগী থেকে এ দুনিয়ার নানাবিধ বিষয় সম্বন্ধে কুরআন-উল-করীম ও হাদিসের উপর নির্ভর করেছেন। কোন দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে ভাবতে গেলেই প্রথমে প্রশ্ন উঠে-সে দেশের সার্বভৌমত্ব কার? তাঁর উত্তরে ইমাম খোমেনী কুরআন ও হাদীসের বাণী থেকেই বলছেন, সার্বভৌমত্ব ও আইন প্রদান করার নিরংকুশ অধিকার একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। উত্তরকালে শহীদ শ্রেষ্ঠ ইমাম হুসাইন (রাঃ) বিদ্রোহ করেছিলেন, যুদ্ধ করেছিলেন এবং কেবলমাত্র এই জন্যই তিনি শাহাদাত বরণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। তিনিই

ইয়াজীদকে বংশানুক্রমিক বাদশাহ মেনে নিতে ঘৃণার সাথে অস্বীকার করেছিলেন।[৫]

সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র আল্লাহর স্বীকার করে নিলে পরবর্তী প্রশ্ন উত্থাপিত হবে– সে সার্বভৌম রাষ্ট্রকে কে পরিচালনা করবেন? সার্বভৌমত্ব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তার প্রদত্ত বিধানসমূহ বাস্তবায়নকারী শক্তির উপস্থিতির গুরুত্ব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে তিনি তার ব্যবস্থার জন্য সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য বক্তব্য রেখে গেছেন। কারণ আল্লাহতা'আলা বলেছেন–"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে দায়িত্বশীল লোকদের।" এ আয়াতটির শেষ কথা হচ্ছে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব সম্পন্ন লোকেরা আনুগত্য বা উলিল আমরের আনুগত্য করা। সে উলিল আমর কে? তার বক্তব্য থেকে বুঝা যায় সে উলিল আমর হচ্ছেন ইমাম বা আল্লার তরফ থেকে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ। তাঁরা হচ্ছেন 'শরীয়ত ও বিবেক বুদ্ধির।' এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, খোদ রাসূলে করীম (সাঃ), খোলাফায়ে রাশেদীন ও আমীরুল মোমেনীন হযরত আলী (রাঃ)–এর সময়ও রাষ্ট্র পরিচালনা অপরিহার্য প্রয়োজনীয় ছিল এবং তা আমাদের বর্তমান সময়েও প্রয়োজনীয় থাকবে। এ কথাটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলবার জন্য আমি তোমাদের নিকট একটা প্রশ্ন তুলে ধরতে চাই। প্রশ্নটি হচ্ছে আমাদের ইমাম মেহেদী অদৃশ্য হয়ে আছেন এক হাজারের অধিককাল হবে।[৬] নবী করীম (সাঃ) ইসলামের যে সব আইন কার্যকর করেছিলেন, সে সব আইন তিনি প্রচার করেছেন, ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ করেছেন ও প্রাণপণ চেষ্টা সাধনা করেছেন। তারপরেও আরও তেইশ বৎসর ধরে যে সব আইন কার্যকর ছিল, তা কি সেই সময়কালের জন্য সীমাবদ্ধভাবে জারি হওয়ার জন্য এসেছিল? আল্লাহ কি শরীয়তের আইনের কার্যকারিতা ত্রিশ বা দুইশ বৎসর সীমাবদ্ধ থাকবে, তারপরে তা আর কার্যকরি থাকবে না বলে ঘোষণা করেছেন? এরূপ ধারণা পোষণ তো আমার মতে ইসলাম বাতিল হয়ে গেছে এমন ধারণার চাইতে অধিক খারাপ ও মারাত্মক।

খোমেনীর চিন্তাধারা অনুসারে ইমাম গায়েব থাকাকালেও মুসলিমদের পক্ষে শরীয়তী আইন পালন করতে হবে। সেই শরীয়তের আইনগুলো কে প্রবর্তন করবেন শিয়া আকিদা মতে তার কোন স্পষ্ট দলিল পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে খোমেনী স্পষ্টই বলছেন "ইমাম প্রচ্ছন্ন থাকাকালে তার মূল ভিত্তি কে হবেন এ বিষয়ে শিয়া মতে কোন শরীয়তী অকাট্য দলিল না থাকা সত্ত্বেও শরীয়তসম্মত শাসকের বিশেষত্বসমূহের বিপুলতা যার মধ্যে আছে বলে মনে করা যাবে তাকে জনগণের শাসক নিয়োগ করা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। সে বিশেষত্ব হচ্ছে আইনের জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতা আর তা আমাদের মধ্যকার বড় বড় ফিকাহবিদদের মধ্যেও এ যুগে পাওয়া যাবে; এরা সকলে একত্রিত হয়ে এ কাজের সংকল্প গ্রহণ করলে একটা তুলনাবিহীন বিশ্বস্ত ন্যায়বাদী রাষ্ট্র কায়েম করা খুব সহজেই সম্ভব হবে।" এতে বুঝা যাচ্ছে কুরআন উল করীম ও হাদীস শাস্ত্রে যারা গভীর জ্ঞান লাভ করেছেন অর্থাৎ যারা ইসলামী আইন–কানুনে পারদর্শী তারাই ইমামের অনুপস্থিতিতে দেশের আইন–কানুন

প্রণয়ন করবেন। তবে এখানেও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। এ সকল ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদ বা কেতাব শাস্ত্রবিদকে কে এ কাজে নিযুক্ত করবেন?

খোমেনী ইসলামী আইনে পারদর্শী ব্যক্তি সম্বন্ধে বলেছেন সে ব্যক্তি এমন নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী হবেন যা তাকে নবুয়্যাৎ বা ইমামতের কাজগুলোতে নিয়োজিত করবে। আমরা এখানে মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে কথা বলছি না। আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বাস্তব ও কর্মগত দায়িত্ব। এ বিলায়েত নেতৃত্ব-কর্তৃক লোকদের শাসন কার্য পরিচালনার রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার এবং শরীয়তের আইন বিধান জারি ও কার্যকর করার এ কাজ নিশ্চয়ই অতি বড় গুরুত্বের অধিকারী। এ কাজতো তার দ্বারাই সম্ভব তার পক্ষেই সমীচীন যে তার যোগ্যতা রাখে। তবে তা করার দরুন সে নিশ্চয়ই অতি মানব ধরনের কিছু হয়ে যাবে না। অন্যকথায় এ নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব হচ্ছে প্রশাসন, পরিচালনা, প্রতিষ্ঠান গড়া ও পরিচালনা এবং দেশের ব্যবস্থাপনা কার্যকর রাখা। এটা কোন বিশেষ বিশেষত্ব বা স্বাতন্ত্র বা কারুর পক্ষপাতিত্বের কথা নয়; নয়, কোন স্বার্থপরতার কথা। মূলতঃ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিপদ সংকুল বাস্তব কর্মত ৎপরতাপূর্ণ দায়িত্ব।

ফকীহর বিলায়াত (নেতৃত্ব কর্তৃত্ব) একটা বাহ্যিক ও আরোপিত ব্যাপার, এটা হল নিয়োগ দেওয়া একটা পদ,

নবী-রাসূল ও ইমামগণ যেরূপ আল্লাহ কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত এবং তাদের এই পদমর্যাদা যেরূপ একটা রুহানী পদমর্যাদা, ফকীহর পদে সে রকম আল্লাহ কর্তৃক রূহানী নিয়োগ নয়।

যে রকম শিশুর অভিভাবকত্ব একটা পদ যেপদে দায়িত্বশীল কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা যায়।

এই নিয়োগের কারণে ঐ ব্যক্তি শিশুর প্রকৃত পিতা হয়ে যায় না।[৮]

ফকীহদের জন্য বাঞ্ছনীয় হচ্ছে তারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে শরীয়তভিত্তিক সরকার গঠনের লক্ষ্যে তৎপরতা অবলম্বন করবেন।[৯] কেননা ফকীহগণকে তো আল্লাই এ কাজে নিযুক্ত করছেন।[৯]

অতএব বুঝা যাচ্ছে ইস্‌লামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ফকীহদের প্রয়োজন এবং ফকীহগণকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই নিযুক্ত করেন। এক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয় এই যে ইমাম খোমেনী যে রাজনৈতিক দর্শনের প্রবর্তন করতে চেয়েছেন তার মধ্যে শিয়া সম্প্রদায়ের আকিদা ও চিন্তাধারার প্রভাব রয়েছে। তাঁর চিন্তাধারা অনুসারে শিয়া সম্প্রদায়ের ইমামের গায়েব হওয়ার পরে এ সংকট সংকুল সময়ে ফকীহগণকেই ইস্‌লামী রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে। ফকীহগণকে স্বয়ং আল্লাহতা'আলা নিযুক্ত করবেন। তবে তারা আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ও ইমামগণের নীতি অনুসরণ করে ইস্‌লামী রাষ্ট্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা

করবেন। এক্ষেত্রে এ দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে সুন্নীদের মতবাদের কিছু পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ সুবহানা তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত আল্-কুর'আন ও আল্লাহর রাসূল (দঃ) কর্তৃক প্রভাবিত সুন্নাহর ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র ও সরকার গঠিত হয়েছিল তাতে দেখা গিয়েছিল রাসূলের (দঃ) প্রতিনিধি নিয়োগের ব্যবস্থা হয়েছিল মুসলিম উম্মাহ্ দ্বারা তাদের সম্মতির ভিত্তিতে। যদিও বর্তমান যুগের মত তাতে কোন ভোট গ্রহণ করা হয়নি। তবুও প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রাঃ) নিকট হযরত ওমরের (রাঃ) বয়েত গ্রহণ করার পরে তাতে কোন ব্যক্তিই আপত্তি প্রদান করেননি। তেমনি হযরত আবু বকরের ইন্তেকালের পূর্বে তিনি হযরত উমরকে মনোনয়ন দান করলে মুসলিম উম্মার পক্ষ থেকে কেউই আপত্তি করেননি। সে মতে হযরত উমর (রাঃ) তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে ছয়ব্যক্তি সহযোগে খলিফার নিয়োগের জন্য যে প্যানেল গঠন করেছিলেন তার বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মার পক্ষে কেউ আপত্তি করেনি। তাদের দ্বারাই হযরত উসমান (রাঃ) খলিফার পদে মনোনীত হয়েছিলেন। হযরত উসমান (রাঃ) বিরোধী দল কর্তৃক শাহাদাত প্রাপ্তিকালে তাঁর পরবর্তী খলিফা সম্বন্ধে কোনকিছু বলে যেতে পারেননি বলেই পরবর্তীকালে মুসলিম সমাজে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এতে বুঝা যায় খলিফার নির্বাচন নির্ভর করে মুসলিম জনগণের সম্মতির উপর। ইমাম খোমেনীর চিন্তাধারা পাঠে মনে হয় রাসূলের (দঃ) পরে স্বয়ং আল্লাহ হযরত আলীকে খলিফা নিযুক্ত করেছেন এবং পরবর্তীকালে খেলাফত ইমামগণের হাতে চলে গেছে। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ইমামগণের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। বিশেষতঃ শিয়াদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দেশ পারস্যে দীর্ঘকাল শাহ বা রাজাদের কর্তৃত্ব ছিল। শিয়া সমাজের লোকেরাও নানা দলে বিভক্ত হয়ে তাদের স্বকীয় মতবাদ প্রচার করেন। তখন ধর্মীয় মতবাদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় শাসনের কোন যোগ ছিল না বলে খিলাফতের প্রশ্ন উঠেনি। বর্তমানকালে ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি যোগ থাকায় ইমাম খোমেনীর পক্ষেই রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে খিলাফত বা ইমামতের প্রশ্ন অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। শিয়াদের মধ্যে নানা দল রয়েছে। তাদের প্রধান দুই দল হচ্ছে বার-ইমামপন্থী বা ইসনা আশারিয়া এবং সাত-ইমামপন্থী বা সাবিয়া-এ উভয় পন্থীদের মতানুসারে তাদের ইমাম এ দুনিয়া থেকে সরে পড়েছেন, তবে যথাসময়ে আবার আগমন করবেন। বারো ইমামপন্থীদের মতানুসারে সে অন্তর্ধানকারী দ্বাদশ ইমাম হচ্ছেন-হযরত আলীর দ্বাদশ বংশধর মুহাম্মদ ইবন-ই আল হাসান। অপরদিকে সাত ইমামের অনুসারীগণ মনে করেন যে লুকায়িত ইমাম হচ্ছেন ইমাম জাফর আস-সাদিকের পুত্র ইস্মাইল। তাকে প্রথমে তার পিতা মনোনয়ন করেন। তবে তার প্রাণদোষের জন্য তিনি মত পরিবর্তন করে তার ২য় পুত্র মুসা কাজেমকে তার পরবর্তী ইমাম বলে মনোনীত করেন। তা সত্ত্বেও শিয়াদের মধ্যে একদল লোক তার অনুসারী থেকে যায় এবং তারা ইসমাইলী বা বাতিনী বলে পরিচিত হয়।

ইমাম খোমেনীর আলোচনা থেকে মনে হয় তিনি ইসনা আশারীয়াদের ধারণা অনুযায়ী ইমামের লুকায়িত অবস্থা সম্বন্ধে আস্থাশীল এবং তারই অভাবে তার স্থলে ইমামের কাজ সমাধা করার জন্য ফকীহদের নিযুক্ত করার জন্য প্রস্তাব করেছেন। তবে

তারা ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করবেন। এতে আপত্তির কোন কারণ নেই। তবে ফকীহদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে তার চিন্তাধারা খুব পরিষ্কার হয়নি। তারা আল্লাহ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হতে পারেন তবে সে সম্বন্ধে জনগণের সম্মতি থাকা দরকার। জনগণ তাদের সম্মতি তখনই দিতে পারে যখন তারা তাদের চরিত্রের মধ্যে এমন সব গুণাবলী আবিষ্কার করবে যাতে তাদের দ্বারা কোনমতেই শরীয়তের আইন লংঘন হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এভাবে তারা তাদের চরিত্র ও আচরণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে নিঃসন্দেহ হলেই তা' তাদের দ্বারা তারা নির্বাচিত হবেন।

বর্তমানকালে এ দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র ইরানেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বলে জানা যায়। এ রাষ্ট্রের নায়ক বা ইমাম জনগণ কর্তৃকই নির্বাচিত হচ্ছেন। স্বয়ং ইমাম খোমেনীও জনগণ কর্তৃকই নির্বাচিত হয়েছিলেন। কাজেই এ রাষ্ট্রকে অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা যায় না। তবে এ রাষ্ট্রের কর্ণধার আল-কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রাষ্ট্রের সকল কাজকর্ম নির্বাহ করবেন। এ রাষ্ট্রের মালিকানা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর। এতে সকল মানুষেরই সমানভাবে ভোগ করার অধিকার রয়েছে। এতে শরীয়তের আইনের বিপরীত বা পরিপন্থী কোন নীতি গ্রহণ করা যাবে না এবং শরীয়তের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক সূত্রে উপস্থিত কোন কার্যই সহ্য করা যাবে না। তার যথাবিহিত শাস্তি শরীয়তী আইনের দ্বারাই হবে।

ফুটনোট ঃ

১। শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তজা মোতাহহারী, চলতি শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলন, পৃঃ ২২।
৪। ইমাম খোমেনী ঃ ইসলামী বিপ্লব কি ও কেন, পৃঃ ৩-৪।
৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭।
৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪।
৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১।
৯। ,, ৫২।
১০। ,, ৫২।

প্রমাণ পঞ্জী

(১) শহীদ আয়াত উল্লাহ মুর্তজা আল মোতাহহারী, শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলন-পৃঃ ২২।
(২) ঐ পৃঃ ২৬।
(৩) ঐ পৃঃ ৩১।
(৪) ইমাম খোমেনী ঃ ইসলামী বিপ্লব কি ও কেন-পৃঃ ৩-৪।
(৫) ঐ পৃঃ ৭।
(৬) ঐ পৃঃ ২৬।
(৭) ঐ পৃঃ ৪৯।
(৮) ঐ পৃঃ ৫১।
(৯) ঐ পৃঃ ৫২।
(১০) ঐ পৃঃ ৫২।

এই যুগের এক সুফী সাধক

ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী

আরবী ভাষায় 'ইরশাদ' শব্দটির অর্থ নির্দেশ। মুরশিদ তিনিই যিনি 'ইরশাদ' বা নির্দেশ দেন। সে অর্থে 'মুরশিদ কথাটির অর্থ, 'আধ্যাত্মিক গুরু' বলা যেতে পারে।

এটি ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, তুর্কী বিজয়ের বহু পূর্বেই সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম দিয়ে বহু আরবীয় বণিক ও ধর্ম প্রচারকগণ তৎকালীন বাংলায় আসতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে হযরত শাহ সুলতান রুমী (মহাস্থানগড়ে আগমন, ১০৫৩ ইং), হযরত শাহজালাল (ইন্তেকাল, ১৩৪৬ ইং), বাবা আদম মক্কী, শাহ সুলতান মাহী সওয়ার, খান জাহান আলী (ইন্তেকাল, ১৫৫৮ ইং), শাহ্ ইসমাইল গাজী, শেখ জালাল উদ্দীন তাবরেজি (ইন্তেকাল, ১১৫৫) প্রমুখ অসংখ্য মস্ত দরবেশের খানকা শরীফ বা আস্তানায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ভরে যায়। বলা বাহুল্য, তুর্কী বিজয়ের পর এসব সুফী দরবেশ বর্ধিত হারে এদেশে আসতে থাকেন এবং মুসলিম রাজশক্তির কাছ থেকে লাভ করেন তাজিম বা সম্মান। উইলিয়াম হান্টারের মতেঃ Before the country passed to us (British) they (Mussalmans) were not only the political but the intellectual power in India [Indian Mussalman' P. 133] আরবীয় সুফীবাদ যা পড়ে ইরানী Monistic সুফীবাদের প্রভাবে হ'ল আরও প্রাণতোষিণী তা সাধারণ লোকের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করতে থাকে যার প্রভাব বাংলার বহু মারফতী, মুরশীদী, দেহতত্ত্ব প্রভৃতি মরমিয়া সংগীতে পাওয়া যাবে। যেহেতু মুঘল আমলে শেখ সাদী, হাফিজ, জামী, নিজামী, ওমর খৈয়াম, মহাকবি ফেরদৌসী দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিচিতি লাভ করেন, যেহেতু রাজভাষা ছিল ফারসী সেহেতু পারস্য সুফীবাদের প্রভাব নানাভাবে এদেশে প্রভাব ও প্রসার লাভ করতে থাকে, যার প্রমাণ পঞ্চদশ থেকে উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্য এবং লিরিক সাহিত্য 'চৈতন্য মঙ্গল' কাব্যে (১৬শ শতাব্দী) জগাই মাধাই নামে দুইজন দূরাচারও মসনবী পাঠ করেঃ মসনবী আবৃত্তি করে থাকে নলবনে/ মহাপাপী জগাই মাধাই দুইজনে। এবং রাবন দশম শতাব্দী থেকেই দিব্য দর্শনের প্রভাবে আরবীয় সুফীবাদ 'প্রচ্ছন্নবাদের' আবির্ভাব হয়। তাঁদের মতে 'আল্লাই সৃষ্টি' এবং 'সৃষ্টিই আল্লা'। কেউ কেউ

লেখক ঃ শিক্ষাবিদ, কবি, লেখক ও লোক সাহিত্য বিশেষজ্ঞ

বলেন ইরানে এসে ভারতীয় বেদান্তের 'অদ্বৈতবাদ' দ্বারা তা প্রভাবিত হয়ে থাকতেও পারে। এঁদের মতে কুরানের দুই অর্থ–একটি 'প্রকাশ্য' এবং অপরটি 'অপ্রকাশ্য' বা 'মারিফাত'। এঁদের কারো কারো মতে সকল প্রেম এবং গোপন রহস্যের মূলে হল নূঁরে মুহাম্মদ'। এঁদের কাছে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) তাই বিশেষভাবে শ্রদ্ধেয়। বলাবাহুল্য বাংলার মরমিয়া সাধকগণও এই মতেই বিশ্বাসী যা তাদের অজস্র মরমিয়া সংগীতের মধ্যেও বিরাজমান। ইরানী সূফী সাধনারও পাঁচটি স্তর বা মোকাম–যেমন– (১) আলমই নাছুত (২) মালাকুত (৩) জবরুত (৪) লাহুত (৫) আলমই হাহুত ইত্যাদি। এই আধ্যাত্মিক যাত্রা বা অভিসারের প্রথম পর্যায়ে জড় প্রকৃতির স্তর, দ্বিতীয়টিতে স্রষ্টার শক্তি ঐশ্বর্য অনুভব, তৃতীয় স্রষ্টার ধ্যান বা তরিকত, চতুর্থ স্রষ্টার ধ্যানে সত্ত্বাহীন বা মারিফাত এবং পঞ্চমত কামেলিয়াত, ফানাফিল বা নির্বাণ শেষে স্রষ্টার সঙ্গে মধু–মিলন।

পারস্য সূফীদের 'সামা সংগীতের' অনুকরণে এইসব পীর আউলিয়া এবং তাদের শিষ্য প্রশিষ্যগণ অনেক সময় আল্লাহতায়ালা, হযরত নবী করিম (দঃ) এবং তাদের নিজ নিজ মুরশিদ বা ওস্তাদের সিফত বা প্রশংসামূলক গজল গানের মধ্য দিয়ে 'মারিফাত' বা খোদা প্রাপ্তির রহস্য বয়ান করতেন। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতেঃ "The old Bengali lyric tradition of which the oldest extant representative are the Charya poems of the Siddhas (Natha Mendicants) attained itself in the post-Muslim times to the Baul Songs on the one hand, and Baishnava Padas (Songs of Vaishnavas) on the others and with a dash of the Islamic spirit in it, became, Muslim Baul songs and Marifati or Mystic Islamic songs such as are heard from Muslim Mendicants over Bengal [Dr. S. K. Chatteijee, JASB, XIV (1943), P. 150].

মোটামুটি এই হল বাংলা সাহিত্য ও ঐতিহ্যের উপর সূফীবাদের প্রভাব।

আজকের যুগের মহান পুরুষ হযরত ইমাম খোমেনীর (রঃ) লিখিত কবিতা পড়তে গিয়ে মনে হ'ল তিনিও একজন 'আরেফ মনীষী'। মাওলানা রুমী, হাফিজ, ফরিদ উদ্দিন আত্তার, জামী, নিজামী, আমির খসরু প্রমুখ কবিদের ভাবধারা আশ্চর্যভাবে 'নূর উসসামাওয়াত ওয়াল আরদ' হয়ে তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে প্রকাশিত হয়েছে। ফারসী আধ্যাত্মিক কবিদের মতই তিনি তাঁর কবিতায় 'আস্তানা' (সাধকদের মিলন ঘর), 'ইল্‌বা' (বৃত্ত), 'আশেক' (আল্লাহ্‌প্রেমিক), 'বেহুঁশ' (আল্লাহ প্রেমে অজ্ঞান), 'এশক' (পরম প্রেম), 'মনজিল' (গন্তব্য), 'কেশ' (চুল; আল্লার সান্নিধ্য লাভের সূত্র) 'রিয়া' (আত্মম্ভরিতা), শারাব' (আল্লাহর প্রেম রস), 'সালেক' (সত্য

পথের যাত্রী), 'তিল' (পারস্য কাব্যে আল্লাহর সৌন্দর্যের তিল), 'সাকী' (প্রেমের মাধ্যম) প্রভৃতি–এই মহান আধ্যাত্মিক সাধকের মধ্যেও এসেছে পুরাতন সাধনার ধারা বেয়েই নতুন পাত্রে।

কবি খোমেনী (রহঃ) 'মাস্তানের আস্তানা' কবিতায় বলেন ঃ

প্রেমিকদের বাজারে যাবো চলে নির্দ্বিধায়
প্রিয়ার কানন থেকে আসবে নসীম পায় পায়

অন্যত্র ঃ

যে মন তব রূপ নেশায় নয় বেহুঁশ সে তো মন নয়
যে জন তব তিলের তরে নয় পাগল প্রাজ্ঞ সে নয়
মনের মানুষ হওরে যদি ছাড়ো নামের ইবাদত
সুজন প্রিয়া ছাড়া কারো এ মাহফিলে নেইকো পথ
জ্ঞান মারেফাত পায় না পথ যেতে নেশার নষ্টপুরী
আশেকানের মন নগরে বাতিলের নেই লুকোচুরি

আশ্চর্য, আমাদের অসংখ্য মারফতী, মুরশেদী এবং বাউল গানেও এই ভাবধারারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে। এসব ভাবের স্রোতে কারণ একই 'রহস্য সাধনা ভাণ্ডার' থেকে যে তাঁরাও এই উৎস সন্ধানী। হাফিজ, জামী অথবা খৈয়ামের মতই তিনি বলেন ঃ

প্রিয়া তোমার অধর তিলে হলাম আমি গেরেফতার
নেশা মাখা চাউনি তোমার দেখে আমার হয় বিমার
সাকী ওগো শরাব ঢেলে করো পূর্ণ পান পেয়ালা
মুছাবে যা হৃদয় থেকে নাম যশের মোহ জ্বালা
ঐ মদিরা হ'তে ঢালো পরান হবে যাতে ফানা
করবই বের মন থেকে প্রতারণার দেওয়ানা

তিনি প্রাচীন সাধকদের মতই বলেন ঃ

আমার হ'ল শেষ প্রিয়া যে মোর এলো না
কিচ্ছা আমার খতম হ'ল গচ্চার শেষ হলো না
এতো বছর গড়িয়ে গেল প্রিয়ার দয়া এলো না

অথবা অন্যত্র ঃ

টানো শরাব ভর পিয়ালা শুঁড়ি খানায় করো মৌজ
ঐ ফেরেশতার গুণ গাও দিল যিনি এমন ভোজ
তাঁর উপলব্ধি চরম উপলব্ধি–এই যমিনের যত অনু সব যে তব মেহমান
যত মন পাগল সব তোমার তরে পেরেশান
এমন কাউকে দেখি নাক যে তোমার খোঁজে নয়
যা কিছুই চাক না কেন লক্ষ্য তুমিই সুমহান
আনাল হকের ফরিয়াদ সে পথ শুধু মনসুরের
মওলা ওগো মদদ করো ধরতে পথ সজ্ঞানেই

শেষ কথা মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান অনূদিত ইমাম খোমেনীর (রহঃ) কবিতা পাঠ করে (দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯২) পাঠককুল সেই পুরাতন সুফীবাদের ধারায় স্নাত হয়ে অবাক বিস্ময়ে ভাববেন সুফীবাদের ফল্গুধারা বর্তমান যুগেও শেষ হয়ে যায় নাই এবং রাষ্ট্রনীতি এবং রাজনীতি যখন ধর্মের পবিত্র শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মানবতার আত্মাকে অগ্রসর করে নিয়ে যায়, সেখানে বিজয় অবশ্যম্ভাবী–সেই বিজয় একদা সম্ভব হয়েছিল ইসলামের আবির্ভাবের পর শুধু আরব নয়, বিশ্ব জাহানে।

কবি খোমেনীর (রহঃ) এইসব বাণী–তিনি নিজেই বলেছেন–'শহীদের রক্তের চেয়েও যা পবিত্র'–বিশ্বকে কি নাড়া দেয় তা দেখার জন্য আজ বিশ্ববাসী উন্মুখ। কারণ এক নোবেল বিজয়ী কবিও বলেছেন, আনতে হবে–সেই শান্তির পৃথিবী–

বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি,
স্তব হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে
উর্দ্ধমুখে নর–নারী।।
কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ,
কেন এ মান অভিমান।
বিতর বিতর প্রেম পাষাণ হৃদয়ে
জয় জয় হোক তোমারি ।।

ইমাম খোমেনী ঃ তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কবি–মানস

শাহাবুদ্দীন আহমদ

১৯৭৯–এর আগে আমি খোমেনীর নাম শুনিনি। তিনি পারস্য বা ইরানের অধিবাসী। এই ইরানের সঙ্গে উপমহাদেশের মুসলিমদের গভীর আত্মিক যোগ রয়েছে। এমনকি এর ভাষা ও সাহিত্যকেও উপমহাদেশের মুসলিমরা নিজেদের ঐতিহ্য বলে মনে করে এবং এটা শুধু উর্দু ভাষার ঐতিহ্য নয় বাংলা ভাষারও। প্রায় শ' পাঁচেক বছর ধরে ফারসী ভাষা উপমহাদেশের রাষ্ট্রভাষা থাকার জন্যে ইংরেজী ভাষার মত ফারসী ভাষার প্রভাব পড়েছে বাংলা সাহিত্য ও ভাষায়। ফারসী ভাষায় যাঁরা শ্রেষ্ঠ কবি সেই ফেরদৌসী, সাদী, জামী, নিজামী, রুমী, হাফিজ ও খৈয়ামের কাব্য শুধু উপমহাদেশে নয়, বাংলাদেশেও সুপরিচিত। বাংলাদেশে যাঁরা কাব্য–সাহিত্যের চর্চা করেন কিংবা ধর্ম–চর্চা করেন তাঁদের মধ্যে খুব কম লেখকই আছেন যাঁরা ঐসব প্রাতঃস্মরণীয় কবিদের নাম জানেন না। ১৭৫৭–এ পলাশী যুদ্ধে সিরাজ–উদ্দৌলার পতন ও ক্রমান্বয়ে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর ফারসীর জায়গা ইংরেজী দখল করলেও ফারসী–সাহিত্যের প্রভাব উপমহাদেশের সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়নি। আমরা ইকবাল, গালিব, হাফিজ প্রমুখ উর্দু কবির মারফৎ নতুন করে রুমী, জামী, খৈয়াম প্রমুখ কবিকে পেলাম। বাংলা ভাষাতে আমরা কান্তিচন্দ্র, নরেন্দ্র দেব, আকরম হোসেন, শহীদুল্লাহ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মনিরুদ্দীন ইউসুফ এবং বিশেষ করে নজরুল ইসলাম মারফৎ খৈয়াম, সাদী, ফেরদৌসী ও হাফিজকে নতুন করে পাই। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত পারস্যের মরমী কবিরা প্রভাবিত করেছেন। বিংশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যের দারুণ প্রভাবও সেই প্রভাবকে মলিন করতে পারেনি। এর কারণ মানব জীবনের কিছু চিরন্তন সমস্যা, সংকট ও জিজ্ঞাসা পারসী কাব্যে এমনভাবে প্রকাশিত হয়েছে যার অস্তিত্ব কালাতিক্রমী। সুতরাং বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালী পাঠকের পারস্য বা ইরানকে ভোলা সম্ভব নয়।

পারস্য বা ইরানের সঙ্গে বাঙ্গালী মুসলমানের আর একটি সম্পর্ক–ধর্মের। মুসলিমদের দ্বারা পারস্য বিজিত হলে সেখানে যেমন আরবীয় সভ্যতার প্রবেশ ঘটে তেমনি প্রাচীন পারস্য সভ্যতার দ্বারা আরবীয় সভ্যতা প্রভাবিত হয়। পাঠান এবং

লেখক ঃ কবি, প্রাবন্ধিক ও বিশিষ্ট নজরুল গবেষক

মোগল আমলে এই মিশ্রিত সভ্যতা ইসলামী সংস্কৃতির রূপ ধরে উপমহাদেশে প্রসার ও পুষ্টি লাভ করে। এর প্রভাব আমরা বুঝতে পারি যথা আজকের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ফারসী কবিদের লেখা গজল গেয়ে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি আমরা শ্রদ্ধা অর্পণ করি। শুধু আমাদের নগরের মিলাদ মাহফিলে নয়; গ্রাম-গ্রামান্তরের মিলাদ ও ওয়াজের মাহফিলে এখনও আমাদের আলেম-ওলামা ফারসী বা ইরানী কবিদের লেখা হামদ-না'ত পাঠ করে ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান এবং ওয়াজ নছিহত পালন করেন। উপমহাদেশের খুব কম মুসলমানই আছেন যাঁরা সাদীর এই বিখ্যাত নাতের সঙ্গে পরিচিত নন-

"বালাগাল উলা বিকামালিহি
কাশাফাদদুজা বিজামালিহি
হাসানাত জামিউ খেসালিহি
সাল্লু আলাইহে ওয়া আলিহি।"

পারস্যের সঙ্গে আমাদের এই সাহিত্য ও ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ছিল। কিন্তু আধুনিক ইরানের সমাজ জীবনের সঙ্গে আমাদের অনেকেরই নিবিড় পরিচয় ছিল না।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ইরানের রুশ-বৃটিশ শাসন মুক্তিতে আমরা ভেবেছি ইসলামী আদর্শের মুক্তি ঘটেছে। নজরুল ইসলাম ত্রিশের দশকে একটি ইসলামী কবিতায় লিখেছিলেন-

দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে
দ্বীন ইসলামী লাল মশাল
ওরে বেখবর তুইও ওঠ জেগে
তুইও তোর প্রাণ প্রদীপ জ্বাল।
গাজী মোস্তফা কামালের সাথে
জেগেছে তুর্কী সূর্য তাজ।
রেজা পাহলবী সাথে জাগিয়াছে
বিরান মুলুক ইরানও আজ।

বিদেশী শাসনমুক্ত করে রেজা খান ইরানের সমাজ জীবনে যে পরিবর্তন এনেছিলেন সেটাকে নজরুল ইসলাম ইসলামী জাগরণ ভেবেছিলেন; ভেবেছিলেন মুসলিম জাগরণ। কিন্তু আসলে রেজা খান 'তুরস্কে কামাল পাশা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের মত পারস্য প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন।' (১) এবং

সেখানেই তিনি থেমে থাকেননি। তিনি 'ইরানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ক্রমবর্ধমান মোল্লা শ্রেণীর বিরোধিতায় তিনি প্রজাতন্ত্রের স্থলে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন।' (২)

এখানে বলা আবশ্যক যে ইসলাম কখনও 'রাজতন্ত্র' আদর্শের মতবাদে বিশ্বাসী নয়। সুতরাং রেজাখান যে পাহলভী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের পুনঃস্থাপনের চেষ্টা চালান তা গভীরতর অর্থে ছিল ইসলাম বিরোধিতা। এখানে বলে রাখা ভালো যে তুরস্কের কামাল পাশার ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের সঙ্গেও ইসলামী আদর্শের কোন মিল ছিল না। ইসলামী আদর্শের মধ্যেই সাম্যবাদ, শান্তিবাদ ও গণতন্ত্রের আদর্শ নিহিত আছে। সুতরাং তাকে পাশ কাটিয়ে অন্য ধরনের পাশ্চাত্য-সৃষ্ট সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রবাদের বা গণতন্ত্রবাদী সমাজতন্ত্রের আদর্শকে প্রচার ছিল অর্থহীন যা ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ প্রক্রিয়া চিরস্থায়ী করার একটি কূটকৌশল। যা সচেতন ইসলামী চিন্তাবিদ, দেশপ্রেমিকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। যেসব দেশপ্রেমিক আলেম-ওলামা সাম্রাজ্যবাদীদের এই শোষণ-কৌশলকে প্রচলন হতে দেখে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন ইমাম খোমেনী ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

শহীদ আয়াতুল্লাহ মুর্তাজা মোতাহারী লিখিত 'চলতি শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলন' গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারছি যে প্রগতিশীল ইরান বলতে সে ইরানকে আমরা বুঝেছিলাম, যে ইরান ছিল স্বৈরাচার শাসক কবলিত স্বাধীনতাহীন ইরান। ইসলামের আবির্ভাবের পর ইরানে যে ইসলামী আদর্শের রাষ্ট্র, সংস্কৃতি ও শিক্ষাদর্শ গড়ে উঠেছিল সেই ইসলাম বিরোধী সংস্কৃতির পীঠস্থানে পরিণত হওয়া এক ইরান। বলতে গেলে পাশ্চাত্য-সংস্কৃতি গ্রাসিত এই ইরান ছিল মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এক পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষক।

চক্রান্তের কঠিনজালে আবদ্ধ এই ইরানকে ষড়যন্ত্রমুক্ত করে সেখানে ইসলামের হারানো আদর্শ পুনঃপ্রবর্তন করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল; শুধু অসম্ভব নয় প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল। খোমেনী সেই অকল্পনীয় ব্যাপারকে কল্পনীয় ও বাস্তবায়িত করেন এবং সে জন্যেই তিনি পরিণত হন অলৌকিক ব্যক্তিত্বে। বিংশ শতাব্দীতে যে ক'টি অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে ইরানের ইসলামী বিপ্লব যে তাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে জন্যে পাশ্চাত্যের সাংবাদিকরা পর্যন্ত যাঁরা শত্রুপক্ষের লোক বললে অত্যুক্তি হয় না, ইমাম রুহুল্লাহ্ খোমেনীকে ১৯৭৯- তে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসাবে শ্রদ্ধা জানাতে কার্পণ্য করেনি।

বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা জানার জন্য আমরা একটু পিছনে ফিরে তাকাতে পারি।

শাস্ত্রবিদেরা জানেন ইসলামই আল্লাহ্‌র একমাত্র ধর্ম এবং হযরত আদম (আঃ) ই ইসলামের প্রথম নবী। কিন্তু একেশ্বরবাদী এই ধর্ম বিভ্রান্ত মানুষের দ্বারা তার স্বরূপে কখনই বিকশিত হ'তে পারছিল না। আলোর মশাল জ্বালিয়ে যখনই সে সমুজ্জ্বল হওয়ার প্রান্তে উপস্থিত হয়েছে তখনই তা শয়তানের দূরভিসন্ধিতে গড়িয়ে পড়েছে অন্ধকারে। লক্ষ নবী ও পয়গম্বর সে অন্ধকার থেকে মানব জাতিকে যতবারই আলোকোদ্ভাসিত ভোরের দরওয়াজায় পৌছে দিয়েছে তখনই শয়তানী চক্রের মেঘ এসে তাকে গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে ফেলেছে। শেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী রাসুলে আকরাম (সাঃ) যখন ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করে বিশ্বকে আলোকময় করে তুললেন তখন শয়তানের সাময়িক মৃত্যু ঘটেছে বলে মনে হ'ল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেই শয়তান তার মুমূর্ষু শয্যা ছেড়ে উঠে বসল এবং ইসলামের বিশ্বব্যাপ্ত আলোকবর্তিকা মুছে ফেলার ঘোরতর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'ল। রাসুলের সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন, আহলে কেতাব, শত শত পীর-আউলিয়া, মুজাদ্দিদ, গাজী ও লক্ষ লক্ষ মুজাহিদের প্রাণের বিনিময়েও ইসলাম তার বিশুদ্ধ রূপ নিয়ে আবার দুনিয়ায় আবির্ভূত হ'তে পারছিল না। এ কথা সত্য মুসলিম মুজাহিদরা হাজার বছর ধরে বাতিল ও মুশরিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ইসলামের আলো পৌছে দিয়েছেন। কিন্তু তাকে সম্মুখীন হ'তে হয়েছে অসংখ্য বাধা-বিপত্তি, পশুশক্তির বিরুদ্ধতা, প্রতিহিংসা, জিঘাংসা, চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতার। বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে পৃথিবীতে সাম্য, শান্তি ও মানবতা প্রতিষ্ঠায় ও জ্ঞানের আদর্শ প্রজ্বলিত করার ভূমিকায় ইসলামী আদর্শের নিশান হাতে যে জাতি একদিন সভ্যতার শিখরে পৌছেছিল পৃথিবীর দৈত্যশক্তির সম্মিলিত ষড়যন্ত্রে তাকে আবার ধূলোয় লুটিয়ে পড়তে হয়। বিংশ শতাব্দীতে সেই ধূলোয় লুটোনো ইসলামী আদর্শের নিশানকে উঁচুতে তুলে ধরেছে ইরান-যার নেতৃত্ব দিয়েছেন ইমাম খোমেনী। এই বিস্ময়কর ঘটনার মহানায়ক যে তিনি তাতে কার সন্দেহ থাকতে পারে?

এই ধরনের মহানায়ক হওয়ার জন্য মানুষের কতকগুলো গুণের প্রয়োজন হয়। জ্ঞানী হওয়া, চিন্তাশীল হওয়া, দূরদর্শী হওয়া, শত্রু শক্তির চক্রান্ত অনুধাবন করার মত বুদ্ধিমান ও সচেতন হওয়া, কঠোর প্ররিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, সাহসী, স্থিতবুদ্ধি, প্রজ্ঞাবান ও বিনয়ী হওয়া এবং আরও অতিরিক্ত যে গুণ-আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া।

রুহুল্লা খোমেনী তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূর কাছে যে দু'টি আদর্শ পত্র লিখেছেন আমি তা পড়ে তাঁর চরিত্রের সেই মহামানবীয় গুণকে দেখতে পেয়েছি যা বিনয়ালঙ্কারে সুশোভিত। প্রকৃত জ্ঞানী অহংকার বর্জিত হবেন এই শিক্ষাই তিনি এই চিঠির মাধ্যমে তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূকেই শুধু নয় মানব সমাজকে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি নিজে মহাজ্ঞানী হয়েও মানুষকে জানিয়েছেন যে সর্বজ্ঞানী একমাত্র আল্লাহ্ একমাত্র তিনিই

সর্বশক্তিমান, সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি তাঁর পুত্রকে লেখা চিঠির এক স্থানে লিখেছেন–

"স্বার্থপরতা ও অহমিকা থেকে দূরে সরে পড়ো। কেননা তা হলো শয়তানের উত্তরাধিকার। এ স্বার্থপরতা ও অহমিকার মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর ওলী ও পবিত্র বন্ধুদের প্রতি বিনয় ও আত্মসমর্পণ করার বিষয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন থেকে বিরত থাকে। জেনে রেখো, বনী আদমের সকল দুঃখ–দুর্দশা এই শয়তানী উত্তরাধিকার থেকে উৎসারিত আর তা সকল ফেৎনার উৎস।" (৩)

মহা মানবদের স্বাপ্নিক হ'তে হয়; আশাবাদী, কল্পনার রাজা বা কবি। আমরা ইমাম খোমেনীকে কবিতা লিখতে দেখেছি। মূল ফারসী ভাষা আমার জানা না থাকাতে আমি তাঁর কাব্যরূপের চমৎকারিত্ব অনুধাবন করতে পারিনি। জনাব মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দীন খানের অনূদিত কবিতার মাধ্যমেই কবি খোমেনীকে আমার জানতে হয়েছে। ফলে খোমেনীর কাব্য–ছন্দ ও কাব্যরূপের সৌন্দর্য উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাঁর কাব্যবিষয় ও তাঁর চিন্তাধারা জানতে পেরেছি এবং একজন বিশ্বাসী খোমেনীর সঙ্গে একজন প্রেমিক খোমেনীকে সেখানে আবিষ্কার করেছি। আসলে একজন মানুষ সত্যিকার মানুষ ও শ্রেষ্ঠ মানুষ হন জ্ঞান ও প্রেমের সম্মিলনে। এখানে বলে রাখা ভালো যে প্রেম জ্ঞান ছাড়া সম্পূর্ণ নয় এবং জ্ঞান প্রেম ছাড়া সম্পূর্ণ নয়। মানুষের প্রতি অসাধারণ প্রেম ছিল বলেই ইরানে ইসলামী বিপ্লবে তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন। কিন্তু শুধু মানুষের প্রতি প্রেমই মানব–প্রেমে পূর্ণতা দেয় না আল্লার প্রতি বিশুদ্ধপ্রেমই মানবপ্রেমে পূর্ণতা দেয়। ইচ্ছাশক্তি ও আত্মশক্তিকে দেয় ইস্পাতের কঠিনতা। যার বলে বলীয়ান হ'য়ে মানুষ দুঃসাধ্য কাজ সাধন করে–যা ইমাম খোমেনী করেছেন। ইমাম খোমেনীর কবিতায় সেই আল্লাহ্‌প্রেমই নিরঙ্কুশ হয়ে দেখা দিয়েছে। আর তা প্রমাণ করেছে তিনি সাদী, হাফিজ, রুমী, জামিরই সত্যিকার উত্তরসূরী।

তথ্যপঞ্জী

১. ডকটর সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, "ইসলাম ও আধুনিক বিশ্ব"।
২. ঐ
৩. মুহম্মদ ফরিদউদ্দীন খান, "ইমাম খোমেনীর কবিতা"।

Imam Khomeini's Efforts in Unity of the Muslim Ummah

Dr. Md. Gholam Rasul

Some men are, like rain, gifts of Allah to mankind. The shower comes on a dry, parched and arid land and it begins to bloom and blossom with gold and glory. Great souls with their teachings resuscitate the dead humanity and human corpses begin to bestir themselves with life and action. Imam Khomeini (R) was indeed such a divine gift to his country and to humanity at large. He is one of the resplendent galaxy of scholars and savants, who have brought glory and greatness not only to Iran, but to the whole world by his noble character and glorious activities.

Born on 20th Jamadius Sani of 1320 Hijri at Khomeini (Iran) he came of a respectable family of learned and religious men. His father Syed Mustafa Musavi, a learned divine, fell a martyr, fighting against oppression and injustice, when his son Imam Khomeini was a child of five months. He was brought up by his virtuous mother Hazera and his sister, and his father's sister. His grandfather was Allama Syed Ahmad Musavi and his maternal grandfather was Ayatullah Mirza Ahmad. Imam Khomeini was well trained and educated. He was well-versed in philosophy, theology, sufism, Islamic law and jurisprudence, astronomy and Islamic sciences, besides Persian and Arabic literature. Like his ancestors he too adopted the profession of a teacher. He taught in the Madrassa at Qum (Iran). He inculcated to his pupils the paramount necessity of attaining purity of soul and spiritual and moral power. His sons Haji Sayed Mustafa and Haji Syed Ahmad and his three daughters Siddiqa, Farida and

---

Writer : Essaist and Professor Islamic History & Culture, Rajshahi University

Fatema were imbued with these ideals.

The Imam's immortal fame rests on the nobility of his mission with which he came to the world, and on the extraordinary courage of conviction, tenacity and valour with which he accomplished his mission, i.e. Islamic revolution, with glorious success against overwhelming odds and vehement opposition at home and abroad. Endowed with penetrating insight, spiritual vision, indomitable resolution and unflinching faith in the righteousness of his mission, he carried through undaunted with unswerving trust in Allah and with deep love for suffering humanity, determined to uproot moral laxity and all evils and corruptions, injustice and tyranny which were rampant in the Shah's regime, and to replace it with Islamic social and political order, based on democracy, justice and human brotherhood. The Shah's despotic regime brought Iran to the verge of ruin by allowing his family members, relatives and friends to indulge in all sorts of inhuman, anti-social and immoral activities. He led himself reckless life and connived at the diabolical crimes of his favourites and satellites. Absolutism and lawlessness replaced the rule of law from the country.[1] The savak (the Shah's secret police) was empowered to oppress the opposition. The Imam observed the perilous situation of his country and resolved to remove it and liquidate the Shah's regime by means of a country-wide revolution. The Shah and his associates, alarmed at the popularity and support that the Imam enjoyed, took resort to many devices; steps were taken to detach people from the Imam; men who praised the learning and virtues of the Imam, or tried to follow him were taken into custody and oppressed. The Imam's 'Risala', a book of religious law, was banned. A malicious and nefarious propaganda against the Imam was let loose. The un-Islamic and pro-zeonist regime of the Shah and some imperialist powers began to disapprove of the activities of the Imam,

who was of course alert about all possible eventualities.

The situation came to a head when the Shah, in order to purchase war materials, entered into a treaty with the USA for borrowing two hundred million dollars (News letter, June 1991, pp. 13 & 37). The Imam declared this treaty as repugnant to the Quranic ideals, and, as such, unacceptable (News Letter, June, 1991, p. 37). The Imam apprised the people of the treachery and conspiracy of the Shah against the country and its people from Najaf, his place of exile. His speeches recorded in tapes were on open sale in the shops of Qum and Tehran. The Shah had the Imam imprisoned on 5th June, 1963. The Imam's arrest led to violent uprising of the people in Tehran and other cities. To put down the popular upsurge the Shah's army and tanks were mobilised and a good number of people fell martyrs. But this only served to strengthen the movement. On the 4th November, 1964 the Imam was banished from Iran. First he was sent to Turkey, then to Najaf in Iraq. In 1977 the Imam's eldest son Alhaj Mustafa Khomeini fell a martyr at the hands of the Shah's Savak. The movement gathered further momentum. On 3rd October, 1978 the Imam was removed from Iraq and he was to be sent to Quwait. But the government of Quwait refused to give him asylum. The Imam then went to France. The popular discontent and resentment rose to a pitch. At this stage the Shah was deposed because of conspiracy of the western powers. On the Ist February, 1979 the Imam decided to leave Paris for Iran. The people hailed the Imam with great rejoicing after his exile of more than fifteen years. The movement that was launched on 5th June, 1963 culminated in a successful revolution in 1979.

The Imam succeeded in accomplishing the revolution by rousing the intellectuals and the people to the reality of the situation and by his right interpretation of Islamic ideals and teachings. He uprooted all sectarian and schismatic feuds and

dissensions and forged a national unity unprecedented in the history of Iran. He brought Shias and Sunnis on the common platform of brotherhood, equality and fraternity. He declared that meaningless disputes on minor ceremonial acts or differences of opinion on minor issues lead only to disunity and weakness, which only bring about national disaster and intervention of foreign powers. He called upon the Shias, Sunnis and others to co-operate and participate in the administration of their country and equal rights and priveleges were accorded to all citizens according to Islamic principles and practices of the Holy Prophet (from the messages of the Imam to his nation in 1400, 1401, 1402 & 1403 Hijri and the constitution of Republic of Iran)[2]. The Imam announced-'We are all brothers. Let us sink all differences of views between Shia and Sunni brothers. We are all muslims, believing in the same Holy Quran and Allah, who has no partner. What is in conformity with the Quran and Tauhid must be accepted and followed. (Paigham-i-Imam, 21.7.1980).

Thus a new nation was born with the Quranic ideal-'Hold fast to the rope of Allah and never disunite'. The Imam also desired other muslim countries to co-operate and unite to deliver them from the tutelage of foreign powers.

The celebrated Sufi poet of Iran Hafiz declared the same ideals in his Diwan —

'Imam not a Hanafi, nor a Shafei, nor a Hambali, Nor am I a Maleki, but I have the religion of love'.

This was the sublime ideal to which the venerable Imam adhered all through his life and this is the message that he has bequeathed to his nation and to all the nations and mankind at large.

Again, in the words of immortal Hafiz, the Imam is one of those pious souls, as pointed out in the following verse —

'Never dies one whose heart has been awakened with love,
Our names are written in the eternal record of the universe'.

(Diwan, V. 39)

The Shah, who boasted of his strong army, workers and most of the people, was sanguine of the stability of his power, but was at last compelled to take asylum with his family in foreign lands. The Shah, at the height of his power, announced — "Nobody can overthrow me. I have the support of 7,00,000 troops, all the workers and most of the people" — (Mohammad Reza Pahlavi, US News and World Report, 26th June, 1978). The Shah was so shortsighted as to forget that brute force, not based upon the consent of the people, does not last long. Rightly said Harold Laski : "Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely". But the lesson of history is often lost on despots enjoying absolute power. They forget that ultimately tyranny, corruption and injustice must yield to truth, justice and righteousness. The Holy Quran and history are replete with such instances.

As a matter of fact, his superb success in the most tough problem he tackled, undoubtedly makes the Imam deserving of the highest tribute; material resources and support of the people were of course with him, but what above all, gave him phenomenal success, was his firm conviction that truth would prevail in the long run, though he was hemmed in by formidable hardships and deterrent obstacles; as it has been said, faith sings like a bird in a dark night, the Imam too worked on in gloom and despondency with the flame of faith burning with him. He infused hope and confidence in his compatriots, who stood beside him, vowing to do or die. They knew that the enemy was powerful, but demoralised, resourceful, but vicious, and so ultimate victory was theirs.

The Islamic Revolution that the Imam and the Iranian people accomplished brought liberation from a despotic and

vicious regime and heralded a new regime of justice, peace and prosperity according to Islamic Shariah, and also paved the way for the emancipation of the other oppressed people of the world. The people of Afhganistan, Lebanon and Palestine were encouraged and inspired by the Revolution of Iran to fight their own battles of liberation.

Imam Khomeini after his success in his struggle for revolution, which has been accomplished some fourteen hundred years after the first great unprecedented and unparalleled revolution of Islam, the Holy Prophet had accomplished, ushered in a new epoch in the history of Iran and the modern world. In this revolution not only men but also women took active and heroic part in the liberation of their country. The men and women of Iran bore with uncommon patience and fortitude the tremendous sacrifies of precious lives of youths, scholars and leaders at the hands of the Shah's army and Savak for the sake of the liberation of Iran, their beloved motherland, from the clutches of the Shah and the pernicious influence of the big world powers, whose sleepless aim was to weaken and disunite the Muslim states and thereby undermine their strength and thwart their rise and awakening, which alone could serve their nefarious purpose and keep Muslim powers in their bondage. The Imam exhorted the world Muslims in 1979 to bear in mind that behind hundred crores of world Muslims the invincible power of Allah, Islam and faith is there to sustain them. They have, therefore, nothing to fear from the big nuclear powers; rather they must stand resolute and united to counteract their efforts to suppress them; unless these powers are overpowered, the Muslims cannot survive and achieve their real freedom. The concept of Tauhid is a power, which no Godless and unrighteous power can overpower; rather innumerable Prophets, including our last Prophet (peace be on him), have proved in their lives that attempts of powerful

enemies were baffled by their reliance on Allah and His strength (The Imam's message, cited in News Letter, May, 1990, pp. 28-29). The Imam inspired the whole nation to rise up determined to shake off the yoke of unrighteous power and establish the rule of Allah and His Quran in Iran (Ibid, p. 29). And the success in Iran will pave the way for others to follow. The Imam not only saved and strengthened his own country but attempted to save and strengthen the Muslim world from apathy and torpor in which he found it involved. He deplored the fact of Israeli domination over Baitul Muqaddas and Palestinians in spite of so many Arab Muslim states in the Middle East. The Revolution that he accomplished in Iran became an eye-opener to the Muslims of Afhganistan, Lebanon, Palestine, etc. throughout the world to achieve their liberation.

The Imam stressed the paramount necessity of Muslims flocking under the banner of Islamic Tauhid, which is the most potent force against all tyrannical powers, which deprive the weak and distressed people of their human rights and liberty. Islam is the only Din, the code of life, capable of giving a lofty, progressive, just and equitable social order (message delivered to the Hajj pilgrims on 6.9.1982)[3].

The Imam emphasized the solidarity of the Muslim world since he said, it was high time to fight the infidels, the polytheists and the hypocrites, and to save the Muslim Ummah from enemy aggression (message delivered to some Bangladeshi leaders on 1.9.1982)[4].

The Imam delivered a historic message to Mr. Gorbachev, the then President of USSR, wherein he exposed the hollowness of communism as philosophy of life and its inadequecy to meet the problems of human life, in this life as well as in the hereafter (from the letter addressed to the President Gorbachev)[5]. It is very significant that communism has been liquidated from Soviet Russia, Poland,

Hungery and other countries of Eastern Europe within a year after the Imam's letter to Mr. Gorbachev.

In fact, the Imam, instilled life and soul in all the actions and observances of the Muslims, as the Quran inculcates to the Muslims a life of vigour and vitality, virtue and piety, so that Islam may not be reduced to mere soulless ritualism, and thereby to meaningless dogmatism. In other words, Islam must play its dynamic and vigorous role, as it had done in the past. In fact, Allah has declared that he has revealed the Quran as remedy and mercy for the Muslims. The Imam could not conceive that the Quran would only serve the Muslims in their burial and supplication prayer and in prayer for the dead[6].

On the contrary, the Quranic teachings must change the destiny of the Muslims by making them conscious of the efficacy of all the prayers and rituals of Islam, viz. Salat, Saum, Zakat, Hajj etc. and thereby making them receipients of Allah's mercy and succour. The Imam could not conceive of the formal and dogmatic Islam, bereft of its spirit.

In the present time these institutions of Islam are becoming formal, because of the decline of Muslim faith and religious fervour, and secondly because of their contact and leaning with christian and other non-muslim nations. The Imam gave a clarion call to the muslim powers to shake off the tutelage of the non-Muslim nations and revive the true spirit of Islam by making Hajj and other institutions of Islam meaningful and purposeful, so that they might emerge stronger than before[7].

In this connection the Imam particularly emphasized the paramount importance of Hajj. It is on the occasion of Hajj that largest congregation of Muslims gather together and Muslims of various languages, of various countries flock together with one end in view, viz. welfare of the Ummah and the service of the distressed humanity. When world

Muslims visit Makkah and Madina, they see the birth place of the Holy Prophet, the places where he was brought up and came to manhood and was honoured with Prophethood and passed through great ordeals of oppression and ridicule of the unbelievers with his devoted companions. They also behold maqam-i-Ibrahim, Mujdalifa, Safa and Marwa and they recall the fact of building the house of Kaba by Hazrat Ibrahim and Hazrat Ismail, the former's and the latter's as well as Hazrat Hazera's matchless love of Allah in obeying His command for sacrifice of the son by the father and the mother and the son's surrender to the will of Allah and the mother Hazera's exile with her child Ismail to the desert and the consequent miraculous gushing forth of the spring water of Zam Zam, and then the mount Ghar-i-Hera and Ghar-i-Saur with which the Prophet's receiving wahy and Hijrat from Makkah to Madina are associated, and they further visualise the events of the battles of the Prophet and his other activities, and lastly they visit his last resting place. All these scenes and recollections are expected to make the pilgrims serious and sincere about the gravity of the Hajj they perform. Moreover, they become proud of Muslim cultural and spiritual heritage. If this Hajj ceremony becomes merely formal and no importance is attached to its inner significance and real purpose, as it has become at the present time the pilgrims will fail to realise its due importance and Hajj will not, therefore, have any salutary impact upon their character and their future activities. So, the Imam stressed the vital importance and efficacy of Hajj, in case it is duly performed with sincerity, in building the life and character of the Muslim pilgrims. This will of course result in improving the morals and manners of other Muslims, as they come in touch with the good and sincere pilgrims.

The Imam particularly emphasized the importance of Hajj, which gives scope to world Muslims togather together

and deliberate on their problems and arrive at proper understanding about the solution of those problems. So, it is the best forum where world Muslims can demonstrate their unity and amity, understanding and co-operation to the world, and take the necessary step of achieving mutual welfare and advancement in close collaboration, so that they may strengthen themselves and take their rightful place in the comity of nations. But Hajj is not being performed in that spirit; it has become only a religious ceremonial. Even blood-shed has been done in the sacred city of Makkah; blood of many innocent Iranian pilgrims has been shed as they chanted anti-American and anti-Israel slogans. This proves that Muslims are not free to pass their opinion against their enemies even in a Muslim country, which is so holy, and where bloodshed has been forbidden in Islam.

The ceremony of stone-throwing, one of the ceremonies of performance of Hajj, has been so nicely explained as throwing stones not against Satan only but also against the satans, who are the enemies of mankind (News Letter, July, 1991).

A Haji is expected to be born a new spiritually; he regrets for his past sins and henceforth vows to live a pious and dedicated life to the noble ideals of Islam and humanity.

The land of Iran has produced innumerable galaxy of world famous poets, writers, scholars, scientists and Sufi saints, whose rich legacy in the domain of literature, science and mysticism has earned enduring fame for Iran. But Iran has passed through formidable political convulsions and rise and fall of many dynasties and empires through centuries. Except hardly thirty years of democratic rule in Iran during the regime of Khulafa-i-rashedin, Iran has been administered by absolute monarchs. It is for the first time after several centuries, say at least twenty-five hundred years after, that democratic government has been set up in Iran by Imam

Khomeini, and this is his most glorious achievement as an administrator and statesman, and this has made him a world figure; as an architect of a modern, progressive and democratic state his name will go down to posterity as a man of genius, and moreover, who created a well-knit homogenous and strong nation out of heterogenous, divided elements. This outstanding achievement has been due to his sagacity, foresight and organising ability of a high order, and he had, moreover, extra ordinary bravery and love for the ideals of Islam, which made him invincible. Of course, Divine help and mercy were his constant source of strength. Indeed though his task was stupendous, his faith was unflinching and his stand resolute. He and his associates braved all dangers and hazards and underwent enormous sufferings and sacrifices, and therefore, their endeavours were crowned with success.

The Imam envolved order out of chaos, suppressed anarchy and lawlessness and established rule of law and equality and justice among all citizens of the state. He uprooted all vices and corruptions and immoral acts and replaced them by nobility of character and sterling qualities of head and heart. He extended facilities for education for not only men, but also for women. The latter class has been sharing with men the burden or responsibility of running the society and state in all spheres. The women have been saved from object dishonour and humiliation and they have been offered respectable position in society with their veils, sanctiond by Islam.

Imam Khomeini in his message on the occasion of declaring Iran an Islamic Republic on April 3, 1979 reiterated the necessity of unity of ummah (Ittehad), as enjoined in the Holy Quran, and founded a social order in Iran, based on justice, equality, fairplay and Taqwa or fear of Allah in the pattern of the Holy Prophet's society built up

in Madina, following the Holy Quran's direction (Sura Hujurat). He ensured good administration of Iran by the virtuous, the faithful and the righteous persons irrespective of any sect or creed to eliminate the privileged class and the vested interest.

The Imam warned the Muslims against the conspiracy of the Christian and Jewish powers to wreck their unity and friendliness and thereby weaken and subjugate them ultimately and thus destroy their glory and greatness (message delivered to the Imams of the province of Gilan and the town of Rasht).

In order to strengthen and fortify the Iranian Muslims and the Muslims of the world he put an end to all differences of views that arose from different sects and doctrines by declaring that fundamentally Muslims are one fraternity, one brotherhood, and they must sink all minor sectarian and schismatic feuds and conflicts and gather on the one platform of the entire Muslim Ummah to emerge triumphant over all the hostile and dark forces of disintegration. To this effect the Imam announced —

'O Muslims of the world ! O, the followers of the source of Tauhid ! Remember that all the problems of the Muslim countries have arisen from their disunity and dissension. In fact, the secret of victory lies in unity and co-operation.' — (Iran)

The Imam emphasized the point further by saying, "Those who sow the seeds of discord and dissension among Sunnis and Shias, prepare the ground for the conspiracy of the enemies of Islam. Thus they want to pave the path of their victory. Those Muslims who are thus engaged are in fact the agents of America and Russia" (message delivered on 8th Zilhajj, 1400 Hijri).

On another occasion the Imam declared that Muslims are brothers to one another and all Muslims armies must act

together in the interest of Islam (Ist Rabiul Awal, 1402 Hijri).

The Imam called upon the Shiahs to perform their prayer under the leadership of the Sunni Imams and to give up the practice of their praying separately. The Imam himself said his prayer with the Sunnis. He said, "We are all followers of the same Tauhid and the Holy Quran."[8]

The Imam and his co-workers showed their exemplary tolerance, fortitude and sense of muslim fraternity in their merciful and considerate behaviour with the Iraqis, who used scientific weapons to destroy the harmless civil population of some Iranian cities, and who particularly razed to the ground the city Khurram with its 100 schools, 2 colleges, 4 hospitals, 8 thousand edifices etc. (News Letter, May, 1991). The Iraqi aggression and its aftermath on the society and economy of Iran has been considerably damaging. Yet Iran has met this disaster with patience and sobriety and has replenished the loss it has sustained in the war.

In place of modern territorial or linguistic nationalism, which runs counter to Islamic ideals, the Imam stressed the paramount necessity of world Muslim unity and the ideology of 'back to the Quran and Sunnah', which will rejuvinate the Muslims and elevate them to the pinnacle of glory and greatness, as visualised and implemented in the palmy days of pristine Islam, a specimen of which modern Iran under the unique, marvelous leadership of the venerable Imam Khomeini has presented to the world muslims.

Imam Khomeini called upon the Muslims of the world to rise above all sectarian wranglings and schismatic conflicts and hold aloft a beaconlight to guide the erring humanity from religious, moral and social chaos and confusion to the realm of peace, tranquillity and order, which alone can solve the present maladies and problems from which humanity has been suffering from a long time without any hope of

redemption.

On 13th Rajab, 1400 at-Hijra/ 26th May, 1980 when the message of the Imam was delivered in the Majlis before the elected deputies, the deputies exclaimed —

'So long as blood flows in our veins, Khomeini will remain our leader'.

This is a clear testimony to what the venerable Imam has done for his country and Islam, and to the deep love that his countrymen cherish for him. May his noble life and ideals continue to be an abiding source of inspiration for the Muslims of Iran and of the whole world !

The effect of Islamic Revolution of Iran has begun to be manifest in many parts of the Muslim world. In the present world Afghanistan, Caucasia, Iraq, Somalia, Palestine, Sudan, Lebanon and the Balkan territories are passing through an explosive situation. Particularly, because of the game of power-politics of the big anti-islamic states in the above countries, the solution of the problem has been very difficult. In the Middle East, as well as in Bosnia-Herzegovina Muslims are being tortured, and mass killing in the latter region by the Serbians is being connived at by the USA and the UNO and some other powers, though verbal sympathy is being shown by them. In fact, no positive step has been taken so far to check the Serbians and save the helpless and destitute Muslims of Bosnia-Herzegovina. To tell the truth, the Serbians are flouting the UNO or other powers with impunity. Needless to say, their hypocritical attitude has emboldened the wrongdoers to persist in their mischief.

Russia, before their present political impase, established their hold over Afghanistan, but subsequently Afghanistan has been liberated after long and considerable sacrifices. Conflagration in Kashmir, Lebanon, Algeria, Ghaza etc. has been going on unabated.

But indications are strong that Islamic movement has been gathering momentum. The recent victory of Hizbullah in the parliamentary election of Lebanon, the rise of Islamic movement in Algeria, Ghaza, Egypt, Tunisia, Jordan are indicative of hopeful prospects of the rise of Islam in modern times. The Ikhwanul Muslemin, which was banned in Egypt in 1954 by Jamal Abdun Naser, has now been allowed to function in Jordan by King Husain and in 1989 Muslim Brotherhood has achieved grand victory in the election (News Letter, December, 1992).

These are clear indications that the success of Islamic Revolution in Iran under Imam Khomeini's leadership has aroused the world muslim to throw off the shackles of bondage and achieve glory and renown by asserting their rights of freedom and salvation.[10] So, Iran has really been the spearhead of modern, Islamic movement throughout the world.

Footnotes :

1. For details see Amir Saikal, The Rise and Fall of the Shah (Princeton University Press, 1980) and Feredoun Hoveyda, The Fall of the Shah (London, 1979), Tr. from the French into English by Roger Liddell (London, 1980).

2. (.....)

In this extract from the Imam's address to the Hajj pilgrims on 28, Shawwal, 1399 al-Hijra the Iranians and all the shiahs of the world have been advised to desist from such acts and may disrupt Muslim unity.

3. Quoted from Newsletter, February, 1992.

4. Ibid.

5. Ibid., February, 1992.

6. The Imam's message of love and resistance, Published by Cultural Centre of the Islamic Republic of Iran, Dhaka, 1988.

7. Imam Khomeini's message to the Hajj pilgrims 1409 Al-Hijra/1987 A.D., published by the Cultural Centre of the Islamic Republic of Iran (Dhaka, 20th August, 1987).

ক্রুসেডার ও তার মিত্রদের রাজনৈতিক পরিণতিমাত্র। দেশে দেশে পশ্চিমা শক্তিবর্গ তাদের নিজেদের মুখপত্রদের দ্বারা ইসলাম বিদ্বেষ ঘনীভূত ও ত্বরান্বিত করে। একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ইসলামের অসারতা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। আজকের এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে ইসলামের আবেদন হারিয়ে গেছে সেটাই কৌশলে প্রকাশ করা হতে থাকে। তারা এই প্রয়াস চালায় যে ইসলাম এখন অগ্রহণযোগ্য এবং নিষ্ক্রিয় একটি ধর্মমত।

ইমাম খোমেনীর পরিবারের বিপ্লবী ভূমিকাও তাঁর চরিত্রমাহাত্ম্যকে বর্দ্ধিত করেছে। তার পিতা শাহের শাসনের বিরোধিতা করতে গিয়ে শহীদ হন। অতপর তাঁর এক পুত্র নির্বাসিত অবস্থায় শাহের লোকদের হাতে প্রাণ দেয়। সর্বোপরি ইমাম খোমেনী নিজেও ত্যাগ ও নেতৃত্বের সর্বোচ্চ মহিমা প্রদর্শন করতে থাকেন। বিদেশে নির্বাসিত অবস্থায় দেশবাসীকে নানা ভাবে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ ও সাহায্য করতে থাকেন। দেশের জনগণ তার অনুপস্থিতিতেই বোধকরি তাকে আরো গুরুত্বপূর্ণ আরো মহীয়ান এবং অপরিহার্য একজন ত্রাণ কর্তা হিসাবে অনুভব করতে থাকে। ফলে শাহ ক্রমশঃ অবৈধ ও অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসাবে প্রকাশিত হতে থাকে। পাশাপাশি ইমাম খোমেনী ইরানের রাজনৈতিক দিগন্তে বিশাল থেকে বিশালতর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রতিপন্ন হতে থাকেন।

অবশ্য এর অনেক পূর্বেই তিনি 'কাশফ-আল আশরার' (১৯৪১) নামক এক বিপ্লবী গ্রন্থ রচনা করে জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অতঃপর তাঁর বিখ্যাত এবং অভিনব 'বিলায়েতে ফকিহ' নামক এক রাজনৈতিক ধর্মীয় তত্ত্ব প্রদান করে দেশের উলেমাগণকে তাঁর দার্শনিক ভাবনার বলয়ের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন। এতে তিনি একাধারে দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, জননেতা ও অসাধারণ ধর্মতত্ত্ববিদ হিসাবে সমস্ত দেশে সুপরিচিতি অর্জন করেন। কালক্রমে ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে তিনি একজন মহান আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে শ্রমিক, সৈনিক, কৃষক, পেশাজীবি ও সকল স্তরের নারী পুরুষের আশা ভরসার কেন্দ্র ভূমি হিসাবে পরিগণিত হন। এমন এক দীপ্তিময় ভাবমূর্তি তাঁর সৃষ্টি হয় যে জনগণ তার কথায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পরিচালিত হয়। তাঁর আদেশ নির্দেশে অবলীলায় আত্মোৎসর্গ করতে এগিয়ে যায়। তাঁর সান্নিধ্য হয় অতীব আকাঙ্খিত তাঁর বাণী হয়ে দাঁড়ায় পরম প্রিয় বাক্য। তাঁর আদেশকে মানুষ মনে করে ঐশী ও অবশ্য পালনীয়; তাঁর সিদ্ধান্তকে বাস্তব রূপদানের জন্য লক্ষ মানুষ উঠে দাঁড়ায় সম্মোহিতের মত। এভাবে ইমাম খোমেনী একজন যথার্থ ক্যারিজম্যাটিক নেতা হিসাবে ইরানের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে আত্মপ্রকাশ করলেন। পাহলভী বংশ হলো ঘৃণার পাত্র, শাহ নিজে হলো নিষ্প্রভ, ইমাম খোমেনীর নির্দেশিত পথে ইসলামী বিপ্লব হয়ে উঠে অনিবার্য।

উপসংহার

বিংশ শতাব্দীতে একটি অপ্রতিহত ও অত্যাবশ্যক রাজনৈতিক দর্শন হিসাবে মার্ক্সবাদ তথা কম্যুনিজম এর অভ্যুদয় ঘটে। এর প্রয়োগও হয় কয়েকটি দেশে। ইসলামের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তথা খিলাফতের তা যতটা পোশাকী হোক অবলুপ্তীও ঘটে এই শতকেই। মুসলিম শক্তির এই পরাজয় ছিল মধ্যযুগে পরাভূত ইউরোপীয়

কাছে অত্যন্ত আবেগ উচ্ছাসের বিষয়। তাঁর আদর্শ অনুসরণে ধর্মীয় ও সামাজিক অবিচার অনাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা ও শাহাদাত বরণের আকাঙ্খা এবং এভাবে পারলৌকিক মুক্তি ও সাইয়্যেদুশ্‌শোহাদার (ইমাম হোসাইন) এর নৈকট্য লাভের আশা তাদের মধ্যে প্রবল। শাহের ধর্মীয় অবদমন ও সামাজিক–রাজনৈতিক পীড়ন চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করলে জনগণের মধ্যে সেই শহীদী আবেগ তথা আধ্যাত্মচেতনার নবজাগরণ ঘটে। এই পরিস্থিতিতে উলেমাগণ তথা ইমাম খোমেনী ইসলামী বিপ্লব সংঘটনের অনুকূলে জনগণকে যে আহবান জানান তাতে জনগণ আত্মোৎসর্গের প্রেরণায় উদ্বোলিত হয়ে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়।

ইমাম খোমেনীর ক্যারিশমা

রেজা শাহের দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আরোহণের পর (১৯৩৫) থেকে ইরানের অভ্যন্তরে বিশেষভাবে ইসলামী পন্থীদের উপর অকথ্য নির্যাতন, দমন ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময় ইমাম খোমেনী একদিকে সরাসরি জাতীয় রাজনীতিতে দারুনভাবে জড়িয়ে পড়তে থাকেন এবং পাশাপাশি সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের অনুকূলে তাত্ত্বিক কাঠামো দাঁড় করানোর কাজে ব্যাপৃত হন। চলতি শতকের ষাটের দশকের প্রারম্ভেই তিনি ইরানী রাজনীতির দৃশ্যপটে একজন শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় নেতা হিসাবে আবির্ভূত হতে থাকেন।

তিনি শাহের অবৈধ ও অযৌক্তিক স্বৈরশাসনের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচারণ করতে শুরু করেন। বিভিন্ন সময় শাহ যে সমস্ত জাতীয় স্বার্থ বিরোধী এবং ইসলামের পরিপন্থী আইনকানুন প্রচলন করেন তিনি তীব্র ভাষায় তার নিন্দা করেন এবং সে সব বাতিলের জন্য দাবী জানাতে থাকেন। যেমন নগর কাউন্সিল বিল, শ্বেত বিপ্লব, ক্যাপিটুলেশন বিল, গণ ভোট এর তীব্র বিরোধিতা করেন। মাদ্রাসায়ে ফাওজিয়ার ঘটনায় (১৯৬৩) ইমাম খোমেনী অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং জুলুমের জন্য শাহকে তীব্র ভৎর্সনা করেন। এতে দেশবাসীর কাছে ইমামের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সাহসিকতা প্রকাশিত হয়। জনগণ ক্রমাগত তাঁর ভক্ত অনুরক্ত অনুসারী হয়ে উঠতে থাকে। তাঁকে নিবৃত্ত করার জন্য কারাগারে নিক্ষেপ করা হলে–লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিবাদী হয়ে উঠে এবং হাজার হাজার মানুষ রাজপথে তাঁর মুক্তির জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে।

এভাবে একের পর এক পাহলভী বংশের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তিনি জনগণকে সংগঠিত করতে থাকলে শাহ তাঁকে পুনরায় কারাগারে নিক্ষেপ করে এবং অবশেষে নির্বাসন দিয়ে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়। (১৯৬৪) এতে তাঁর জনপ্রিয়তা সাতগুণ বেড়ে যায়। ইরানের ভিতরে এবং দেশের বাইরে অজস্র মানুষ তার প্রদর্শিত পথে কাজ করতে থাকে।

সমগ্র ইরানী জনগণের মুক্তির লক্ষ্যেই নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তাই জনসাধারণের মধ্যে মাজহাবগত সূক্ষ্ম বিভেদ ও দূরত্ব নিরসনের ফতোয়া প্রদান করেন। নিজে একজন শীর্ষস্থানীয় শিয়া ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও ইমাম খোমেনী শিয়া–সুন্নী বিভেদ সৃষ্টিকে সাম্রাজ্যবাদীদের জঘন্য কারসাজী হিসাবে অভিহিত করেন। যারা এই বিভেদকে ধরে রাখে এবং প্রকাশ করে তাদের তিনি 'নাপাক' হিসাবে চিহ্নিত করেন। তিনি ইরানের সকল মুসলমানদের একতাবদ্ধ করে অভিন্ন পতাকাতলে সমবেত করার জন্য ঘোষণা দেন "আমি শিয়াও নই, সুন্নীও নই, আমি একজন মুসলমান।" ইরানী মুসলিম সমাজের প্রেক্ষাপটে উলেমা সম্প্রদায় তথা ইমাম খোমেনীর এ ঘোষণা ছিল একটি বড় বিপ্লবী পদক্ষেপ। জনগণ এই আহবানে মাজহাবী বিভেদের অসারতা অনুধাবন করে শিয়া–সুন্নী, হানাফী, হাম্বলী, আরব, ইরানী, তুর্কি, কুর্দী, সকল গোষ্ঠী ও ফেরকাভেদ পরিহার করে এককাতারে শামিল হয়। শাহের স্বৈরশাসন উচ্ছেদের জন্য একটি অবিভাজ্য শক্তিতে পরিণত হয়। এটা ছিল ইসলামী বিপ্লবের পথে ইমাম খোমেনী এবং ইরানী জনগণের প্রথম বিজয়। এ ধর্মীয় সামাজিক দূরত্ব অপনোদন শুধু ইসলামী বিপ্লব সংগঠন করতেই সহায়ক হয়নি বরং বিপ্লবকে সংহত করার, বিপ্লবোত্তর দেশ পুনর্গঠন ও বহিরাক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতেও পরবর্তীকালে এই উপলব্ধি (Spirit) খুবই সহায়ক হয়েছে।

ইসলামী বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার পশ্চাতে আরেকটি সামাজিক উপাদান হিসাবে জনগণের মধ্যে আধ্যাত্ম বোধের নবজাগরণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ইরানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। ইমাম খোমেনীর আহবানে শিয়া–সুন্নী প্রভৃতির মধ্যে যে সামাজিক দূরত্ব ও মাজহাবী বিভেদ তা ক্ষীয়মান হলেও শিয়াদের যে নিজস্ব আত্মচেতনা তা সতত জাগরুক একটি বিষয়। শিয়াগণ একমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর বংশের নেতৃত্ব স্বীকার করেন। এর কারণে ইমামতের ধারণায় গভীরভাবে আস্থাশীল। ইমামগণের আদর্শই শিয়া মুসলমানের জীবনের অন্যতম নিয়ামক। ইমাম মেহেদীর পুনরার্বিভাব না ঘটা পর্যন্ত অতীতের ইমামগণের নির্দেশিত পথেই শিয়া সম্প্রদায় চলতে থাকবে। এমতাবস্থায় প্রকৃত ইমামের অনুপস্থিতি তথা তার পুনরার্বিভাব না হওয়ার প্রেক্ষিতে নিপীড়িত জনগণ সম্ভবতঃ একজন প্রতিকী ইমাম হিসাবে আয়াতুল্লাহ রহুল্লাহ খোমেনীকে গ্রহণ করেন। ইমাম খোমেনীও অবদমিত জনগণের অবরুদ্ধ আবেগকে সাফল্যের সঙ্গে বিস্ফোরিত করে সমাজ পরিবর্তনে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হন।

চিরাচরিতভাবে শিয়া মুসলমানের নিকট তাদের বারোজন ইমামের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ) তনয় ইমাম হোসাইন (রাঃ) অতীব প্রিয় ব্যক্তিত্ব। এক অসম যুদ্ধের ফলে তিনি মর্মান্তিকভাবে শহীদ হন। তাঁর শাহাদাত লাভের স্মৃতি ইরানী জনগণের (শিয়া)

কতিপয় সুপার পাওয়ারকে নির্লজ্জ তোষণের ফলে দেশব্যাপী ক্রমাগতভাবে যে ক্ষোভের বাষ্প সঞ্চার হয় – উলেমাদের মুখ দিয়েই তার বিস্ফোরণ ঘটে। জাতির এহেন সংকটকালে উলেমাগণই একটি প্রতিরোধী শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হন। জাতিকে নেতৃত্বদানের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁরা এগিয়ে আসেন। জনসাধারণও তাদের শেষ ভরসাস্থল হিসাবে উলেমাগণকেই গ্রহণ করে। অবশ্য এ জন্য উলেমা শ্রেণীকে অনেক বেশী মূল্য দিতে হয়েছে। প্রাথমিকভাবে শাহ নির্বাচিত কতক ধর্মতত্ত্ববিদ আলেমদের তার রোষের শিকার হিসাবে চিহ্নিত করেন। তাদের তিনি নির্যাতন, হত্যা, গুম, অঙ্গচ্ছেদ, বিতাড়ন, নির্বাসন ও কারাদণ্ডের মত কঠোর পন্থায় স্তব্ধ করতে চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে ডঃ আলী শরীয়তী, মোস্তফা খোমেনী, ইমাম খোমেনীর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অতঃপর আলেমগণের নেতৃত্ব অধিকতর জনপ্রিয় ও বেগবান হয়ে উঠলে শাহ একটি গোষ্ঠী হিসাবেই তাঁদের নির্মূল করার কৌশল অবলম্বন করেন। কোমের মাদ্রাসায়–শাহের গুপ্তঘাতক দল ও সেনাবাহিনীর সদস্যগণ কর্তৃক নির্বিচারে গুলীবর্ষণ করে অগণিত শিক্ষার্থী ও গুণগ্রাহীকে নির্মমভাবে হত্যা করা এর একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও জাতি তথা জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণকারী একটি সচেতন গোষ্ঠী হিসাবে উলেমাগণের অভ্যুদয় ও কর্মকাণ্ডকে শাহ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হন। সকল প্রতিবন্ধকতা ভেঙ্গে একটি সময়োচিত রাজনৈতিক শক্তি হিসাবেই তাঁরা আবির্ভূত হন এবং জাতিকে নির্দেশনা প্রদান করেন। উলেমাগণের সুদৃঢ় নৈতিক শক্তি, আত্মত্যাগের প্রত্যয় এবং সুগভীর পাণ্ডিত্য প্রভৃতি নেতৃত্বদানের উপযোগী অসাধারণ গুণাবলী তাঁদেরকে দলিত অবদমিত ইরানী জনগণের পুরোভাগে এনে দাঁড় করিয়েছে। উন্মুক্ত হয়েছে ইসলামী বিপ্লবের পথ।

(ঙ) ধর্মীয়–গোষ্ঠীগত বিরোধের অবসান ও আধ্যাত্মবোধের নবজাগরণ

যুগ যুগ ধরে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কতিপয় মাজহাব ও ফিরকাহ বিদ্যমান রয়েছে। এসব মাজহাব যতটা ধর্মীয় ব্যবধান সূচক তার চেয়ে অনেক বেশী সামাজিক দূরত্ব সৃষ্টি করেছে; ইরানেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বরং মাজহাবী বিভেদ–তথা শিয়া–সুন্নী ভেদ–বোধ কিছু স্পষ্টতর। বিপ্লব–পূর্বকালে শাহ প্রশাসন এ বিভেদ বা বৈচিত্র্যকে সুকৌশলে ব্যবহার করে জনগণকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করিয়েছে। ফলে জনগণ একটি অখণ্ড, ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি, অথচ বিপ্লবের জন্য সংগঠিত জনগণ একটি পূর্বশর্ত। ইমাম খোমেনী এই সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন। তদুপরি তিনি কোন বিশেষ মাজহাব বা ধর্মীয় উপদলের জন্য কাজ করতে প্রয়াসী ছিলেন না। বরং

প্রতিবাদের সাহস দেখিয়েছিল। ফলে জনগণ তাদের আকাঙ্খার প্রতিধ্বনি শুনেছে এইসব আলেম-উলেমাদের নির্ভীক কণ্ঠে। অবদমিত, পরাভূত জনগণ আজ নেতা হিসাবে উলেমাদের মেনে নিয়েছে এবং তাদের দেখানো পথে আত্মোৎসর্গ করতে অগ্রসর হয়েছে। ইসলামী বিপ্লবের পথ প্রশস্ত হয়েছে এভাবে।

রাজনৈতিক নির্ধারক হিসাবে উলেমাগণের আবির্ভাব

ইরান ইসলামের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠতম বিকাশ ও অনুশীলন ক্ষেত্র। ইসলামের অভ্যুদয়ের পর পৃথিবীর আর কোন ভূখণ্ডে ইসলামের ধর্মীয় দর্শন, ঐতিহ্য, আধ্যাত্মিকতা, সুফীবাদ, শিল্প-সংস্কৃতি সম্বন্ধে এত বেশী চর্চা হয়নি। এ দেশে অনেক মহান মুসলিম কবি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ, শাস্ত্রকার ও সুফীর আবির্ভাব ঘটে। এই ঐতিহ্যের ধারায় বিগত দুই তিন শতাব্দী যাবৎ ইরানে একটি বিশাল উলেমা শ্রেণী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বিরাজমান রয়েছে। যখনই জাতি কোন রাজনৈতিক বা অন্যবিধ সংকটে পতিত হয়েছে তখনই উলেমা সম্প্রদায় জাতিকে পরিত্রাণ করার জন্য এগিয়ে এসেছিল। ১৮৯২ সালের তামাক (বর্জন) আন্দোলন, ১৯০৬ সালের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন, ১৯৫২-৫৩ সালের তৈলক্ষেত্র জাতীয়করণ আন্দোলন প্রভৃতিতে দেশের খ্যাতিমান ইসলামী ধর্মতত্ত্ববিদগণ নেতৃত্ব দেন। এদের মধ্যে মির্জা হাসান শিরাজী, আবদু করিম বাখেরী, আয়াতুল্লাহ কাশানী ও আয়াতুল্লাহ বুরুজারদী অন্যতম। এই ধারায় শেষ এবং সর্বাধিক শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন ইমাম খোমেনী। তাই একটি অনানুষ্ঠানিক অথচ অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে ইরানে উলেমা সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ও স্বীকৃতি সমাজে বরাবরই ছিল।

রেজাশাহ এই ধর্মতত্ত্ববিদগণ উলেমাগণকে তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসাবে গণ্য করতেন এবং সর্বদা তাদের প্রতি কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। অবশেষে তাদের দমন ও নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে নেতৃস্থানীয় উলেমাগণকে রাজনৈতিক ও শারীরিকভাবে নির্মূল করতে উদ্যত হন। পরাক্রমশালী রেজাশাহ এরূপ একটি ধারণা প্রচলনে সচেষ্ট হন যে, উলেমাগণ ইরানের আধুনিকীকরণের প্রধান অন্তরায় এবং দেশের স্বার্থেই তাঁদের প্রতিহত করা আবশ্যক। তাঁরা উলেমাগণকে কোণঠাসা করার এ প্রয়াসে সফল হয়নি। প্রচণ্ড রাজনৈতিক অবদমন ও নির্যাতনের প্রেক্ষিতে ইরানে উলেমাগণ একটি আধা-আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক প্রেষক-গোষ্ঠী (Pressure group) থেকে একটি নির্ধারক শক্তি হিসাবে রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হন। শাহ ও তার পরিবার এবং পারিষদবর্গ কর্তৃক দেশের সম্পদ লুণ্ঠন ও কুক্ষিগতকরণ, ইসলামী তথা দেশজ সংস্কৃতি দলন ও ভোগবাদী পাশ্চাত্য ধারার সূত্রপাত, ক্যাপিটুলেশন আইন পাশসহ

মুখে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মোল্লারা ভেসে যাবে। দ্বিতীয়তঃ যুবক-যুবতীগণ কলুষময় জীবনের আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে হারিয়ে যাবে। যুবক-যুবতীগণ সমাজের হৃৎপিন্ডস্বরূপ। সমস্ত অন্যায় অবিচারের মোকাবেলা চিরকাল যুবকগণই করে থাকে, সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম চালিকাশক্তি তারাই। কিন্তু সুযোগ তৈরি করে দিলে তারাই অবৈধ সুখ-সম্ভোগ, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, পঙ্কিলতায় নিমগ্ন হয়ে পড়বে। আত্ম-স্বার্থ বোধ, লোভ তাদের আচ্ছন্ন করে রাখবে। ফলে দেশ, জাতি, সরকার, অর্থনীতি, প্রশাসন, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার প্রভৃতি দেশপ্রেমমূলক চেতনাও পরার্থ পরতা বোধ তাদের কাছে অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। গণজাগরণ, সমাজ বিপ্লব বা সংস্কারধর্মী কাজের প্রতি তারা বিমুখ হয়ে পড়বে। ক্রমশঃ নির্জীব ও সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে সব কিছুকে নিয়তি বলে মেনে নেবে।

তরুণ প্রজন্মের চরিত্র হননের লক্ষ্যে এধরনের ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ব প্রয়োগ করে তাদের সম্ভোগকাতর রাখার একটি দৃষ্টান্ত হলো বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য বাধ্যতামূলক বার্ষিক শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা। প্রতি বছর বসন্তকালীন ছুটির সময় উচ্চ শিক্ষার্থী যুবক-যুবতীদের কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবকাশ যাপনের নামে অবাধ মেলামেশা, উদ্দাম নৃত্যগীত করা, নগ্ন-সমুদ্র-স্নান ও হৈ হুল্লোড় করার আয়োজন থাকত শিক্ষা সফরের অঙ্গ। এভাবে তাদের নৈতিক চরিত্র ধ্বংস ও রাজনৈতিকভাবে ভোঁতা বানানোর সকল ষড়যন্ত্র করা হত।

এসব কার্যকলাপ ছাড়াও রাষ্ট্রীয় অনুমোদন, নির্দেশ বা পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামী সংস্কৃতি বিশেষ করে পরিকল্পিত তৎপরতা অধিকাংশ ইরানীর হৃদয়ে আঘাত করে। শাহ ইসলামী সংস্কৃতিকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য বা অবাঞ্ছিত ঘোষণা করতে দ্বিধা করেননি। দৃষ্টান্ত হিসাবে মুসলিম মহিলাদের হিজাব ব্যবহারের উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। এছাড়া বড় বড় শহরে অজস্র বার, ক্লাব, ক্যাসিনো সরকারের অনুমোদনে গড়ে উঠে। এভাবে ইরান একটি নেশাখোর, মোহগ্রস্ত জাতিতে পরিণত হতে থাকে।

প্রত্যেক জনগোষ্ঠী তার নিজ নিজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সানন্দে লালন করে। সে সব অনুশীলন করতে ভালোবাসে যখন কোন শক্তি তাদের সেই উপলব্ধিতে আঘাত হানে; তাদের স্বকীয়তা রক্ষার আকাঙ্খাকে পদদলিত করে তখন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই শক্তির বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায়। ইরানের ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। ইরানী সমাজের গভীরে ইসলামী ভাবাদর্শের শিকড় এমনভাবে প্রোথিত যে তা নির্মূল করার প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। এ কারণে শাহ প্রশাসনের শত চেষ্টাতেও ইরানী জনগণ পশ্চিমা সংস্কৃতিকে আত্মীকরণ করতে চায়নি, অথবা পারে নাই। এসব সাংস্কৃতিক অবদমন ও চরিত্র হননের বিরুদ্ধে 'মোল্লাগণ' প্রকাশ্য

সহজলভ্য সম্ভোগের বস্তুতে পরিণত করার সব বন্দোবস্তও করা হয়।

বলা যায়, আধুনিকীকরণ কার্যক্রম দ্বারা ইরানের প্রচলিত সামাজিক বিধি–বিধান ও জীবন ধারাকে আমূল রদবদল করে পশ্চিমী দুনিয়ার অনুকরণে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা চালানো হয়। দেশের অর্থনীতিকে কোন জনকল্যাণময় রূপদান বা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের বিকাশ এর উদ্দেশ্য ছিল না। এজন্য শাহের আধুনিকীকরণ কার্যক্রম জনগণের সমর্থন লাভ করেনি। বরং এ কার্যকলাপসমূহ জনগণের কাছে ইরানী জাতিসত্তার অস্তিত্বের প্রতি হুমকি হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। আর নগরায়ন পরিগণিত হয়েছে কথিত আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়াকে ঘনীভূত করার একটা ষড়যন্ত্রমূলক পন্থা হিসাবে। ইরানের জনগণ আধুনিকীকরণের নামে সাংস্কৃতিক বিকৃতি ও ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুতিকে মেনে নিতে রাজী ছিল না। ইমাম খোমেনী সঠিকরূপেই শাহের এ চক্রান্তকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং শ্বেতবিপ্লবসহ আধুনিকীকরণের বিপক্ষে ফতোয়া প্রদান করেন। উলেমা সম্প্রদায়ও তদনুসারে জনমত সংগঠিত করতে তৎপর হন। ফলে শাহের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে।

(ঘ) সংস্কৃতি ও মনস্তত্ব পরিবর্তনের উদ্যোগ

ইরানের গৌরবোজ্জল সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য তথা ইসলামী ঐতিহ্য রেজা শাহের বংশগত শাসনের জন্য বার বার চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে। বিশ্বের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, চিন্তাবিদ, ইসলামী পন্ডিত যেমন, শেখ সাদী, কবি হাফিজ, রুমী, খৈয়াম, ফেরদৌসী, ইমাম খোমেনী প্রমুখ ইরানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা তাদের অপরিমেয় মাহাত্ম্যগুণে ইরানের জনমানুষের চেতনার একটি মৌলরূপ তৈরি করে দিয়েছিলেন। এই সমস্ত মনীষীর ভাবাদর্শে যুগ পরিক্রমায় ইরানের মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মানসলোকের পরিবর্তন একটি স্পষ্ট অর্ন্তকাঠামো নির্মাণ করে। এটাই ইরানী চরিত্র। রেজাশাহ সম্ভবতঃ উপলব্ধি করেছিলেন যে ইরানী জনসাধারণের যে বংশ পরম্পরাগত স্বভাব সত্যানুসন্ধিৎসা, প্রতিবাদপরায়ণতা, ইসলাম প্রিয়তা, তার স্থলে যদি এক নতুন সাংঘাতিক মনস্তত্ব তৈরি করা সম্ভব হয় তবে দেশটিকে নিরঙ্কুশভাবে শাসন করা যাবে, জনগণকে বশীভূত করে রাখা সম্ভব হবে, সিংহাসন হবে সকল আশঙ্কা, উৎপাতমুক্ত।

এইসব প্রতীতি থেকেই শাহ ইরানের ইসলামী সংস্কৃতিকে তার হামলার অন্যতম লক্ষ্য হিসাবে স্থির করেন। আধুনিকায়নের অজুহাতে সব পুরাতন রীতি রেওয়াজকে অচল–অপাংক্তেয় ঘোষণা করে এক নতুন ধারা প্রবর্তনে উদ্যোগী হন। বস্তুতঃ এই সব নতুনত্ব আর কিছুই নয়–লাম্পট্য, নগ্নতা, বেলেল্লাপনা, জুয়া খেলা প্রভৃতির অবাধ লাইসেন্স মাত্র। শাহের বিশ্লেষণে এতে দু'টি লাভ হবে। প্রথমতঃ নতুন পরিস্থিতির

তেহরান মূলতঃ অভিজাত গোষ্ঠী, নতুন ও পুরাতন ধনাঢ্য ব্যক্তি ও এলিট শ্রেণীর বাসস্থলে পরিণত হয়। আর দক্ষিণ তেহরান স্বল্প আয়ের মজদুর শ্রেণী, গ্রাম থেকে উঠে আসা সহায় সম্বলহীন ভাগ্যান্বেষী লোক ও অদক্ষ শ্রমিকদের বস্তি এলাকা শ্যান্টী টাউন হিসাবে গড়ে উঠে। এই ছিল শাহের নগরায়নের অন্তর্নিহিত চেহারা।

এ নগরায়ন প্রক্রিয়া ছিল মূলতঃ পল্লী এলাকায় মানুষদের শহরের জৌলুসপূর্ণ জীবনের দিকে প্রলুব্ধ করে গ্রামগুলিকে অপেক্ষাকৃত জনবিরল করে ফেলা। এতে একদিকে ইসলাম পন্থীদের সমর্থক ও তৎপরতা হ্রাস পাবে, অন্যদিকে বিদেশী পণ্যের নগরকেন্দ্রিক একটি বৃহত্তর ভোক্তা শ্রেণী গড়ে উঠবে যারা কালক্রমে মনমানসিকতায় ইসলাম বিদ্বেষী হয়ে উঠবে।

শাহের আধুনিকীকরণও ছিল মূলতঃ জনপ্রিয় ইসলামী ভাবধারাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা এবং পাশ্চাত্যের আচার আনুষ্ঠানিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ প্রভৃতি প্রবর্তনের এক প্রকাশ্য প্রচেষ্টা। প্রচলিত ইসলামী জীবনাচরণ প্রণালী ও সাংস্কৃতিক ধারার বিপরীতে অবাধ যৌনাচার, নগ্নতা, মদ্যপ্রিয়তা ও নানাবিধ অশ্লীলতার পক্ষে জনগণকে অনুপ্রাণিত করা হতো। ইসলামের আদলে গড়ে উঠা ইরানের দেড় হাজার বছরের পুরাতন পপুলার কালচারকে নির্মূল করে সমাজ জীবনকে স্থূল অর্থে পশ্চিমীকরণ (Westernization) করাই ছিল শাহের আধুনিকায়নের মর্মবাণী। শাহ প্রশাসন বাহ্যিক চাকচিক্য, উশৃঙ্খল ভোগবাদিতা ইত্যাদি দ্বারা জনগনকে মোহাবিষ্ট রেখে দেশ শাসন ও শোষণ করতে চেয়েছে। আধুনিকীকরণ দ্বারা শিল্প কলকারখানা, যাতায়াত ব্যবস্থা, কৃষিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও বাড়তি সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির চেয়ে রেজা শাহ বিদেশী ষ্টাইলের পোশাক পরিচ্ছদ–পরিধান, বিদেশী খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা তৈরি তথা দৈনন্দিন জীবনকে পশ্চিমধর্মী রঙে রাঙিয়ে নেয়ার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করাতেই বেশী আগ্রহী ছিলেন। তার আধুনিকীকরণের অন্যতম অভিব্যক্তি ছিল 'শ্বেত বিপ্লবের' সূচনা করা। 'শ্বেত বিপ্লব' কার্যক্রমের দুটি প্রধান লক্ষ্য ছিলঃ ভূমি সংস্কার ও নারী মুক্তি। শ্বেত বিপ্লবের নামে শাহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা কৃষি আধুনিকীকরণের নামে ভূমি সংস্করণ ও কৃষকদের মধ্যে ভূমি বন্টনের উদ্যোগ নেন। পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয় যে এসবই ছিল নিছক লোক দেখানো এবং প্রতারণা মূলক কর্মকান্ড। এর দ্বারা কৃষক কিংবা কৃষিব্যবস্থা কোনটারই উন্নতি হয়নি। কৃষকরা বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কৃষি অর্থনীতি মার খেয়েছে।

শ্বেত বিপ্লবের আরেকটি দিক 'নারী মুক্তির' নামে শাহ ইরানী নারী সম্প্রদায়কে বেহায়াপনা রপ্ত করতে প্ররোচিত করেন। তাদের ঐতিহ্যগত পর্দা ব্যবস্থাকে পরিহার করে স্কার্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্যের পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহারে বাধ্য করেন। দেশের নারীদের

governing elite) হিসাবে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয় উলেমা সম্প্রদায়, তারা বিদ্যমান সামাজিক রাজনৈতিক অবিচারপূর্ণ পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব গ্রহণ করে জনগণের পুরোভাগে এগিয়ে আসে।

এই সময় দুটি রাজনৈতিক দল তুদেহ পার্টি ও মুজাহেদীন খালক পরিস্থিতকে নিজেদের পক্ষে ঘুরিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালায়। বিরাজমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটকে তারা নিজেদের রাজনৈতিক দর্শন মার্ক্সবাদ-এর ফ্রেমে ভরে নিয়ে মার্ক্সীয় ধারায় রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহকে পরিচালিত করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু দরিদ্র, শোষিত জনগণের মধ্যে তাদের কোন সাংগঠনিক শিকড় না থাকায় এবং জনকল্যাণের চেয়ে তত্ত্বীয় বুলি কপচানোয় প্রবণতার কারণে তারা জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণে ব্যর্থ হয়। অন্যপক্ষে জনসাধারনের মানসলোকে ঐতিহ্যগতভাবে ইসলামী চিন্তা চেতনা ও ভাবাদর্শ দৃঢ়মূল থাকার কারণে শোষিত বঞ্চিত জনগণ উলেমা সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লব সংগঠনের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

(গ) নগরায়ন ও আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া

রেজা শাহ ইরানে নগরায়ন ও আধুনিকীকরণের কতিপয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার এ প্রয়াস ছিল নিজেকে (এবং বংশধরদের) চিরকাল ইরানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাখার এক সূক্ষ্ম কৌশল। নিষ্ঠুর অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনেতিক একঘেঁয়েমী থেকে জনসাধারণের মনোযোগ অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্য এসব ছিল সুপরিকল্পিত চক্রান্ত। নগরায়ন প্রকল্পের আওতায় জনগণকে পল্লী এলাকা ছেড়ে শহরে এসে বসবাস করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নীতির মারপ্যাচে পড়ে অনেক পরিবার শহরগুলোতে স্থানান্তর করতে বাধ্য হয়। শাহের নগরায়ন পলিসির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষকে শহর এলাকাগুলোতে সন্নিবেশ করে তাদের পরিপূর্ণ পুলিশী নিয়ন্ত্রণ বলয়ের মধ্যে নিয়ে আসা। তারা সরকারী দৃষ্টির অন্তরালে সুদূর গ্রাম-গ্রামান্তরে, বাজারে-জনপদে শাহের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়ার অবাধ সুযোগ না পায়। পল্লী এলাকার মানুষ স্বভাবতই সহজ সরল এবং অকৃত্রিম ইসলামী জীবন যাপনে অভ্যস্ত। শাহ প্রশাসন তাদের মূল জীবিকা ও জীবনাদর্শ থেকে সরিয়ে এনে শহুরে পরিবেশে পশ্চিমী ধাঁচের জীবনযাপন প্রণালী রপ্ত করতে অনুপ্রাণিত করে। এতে পল্লী এলাকা থেকে শহরে অপরিকল্পিত স্থানান্তরকরণ শুরু হয় ও শহরের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কৃত্রিম নগরায়নের ফলে দেখা গেল ইরানী সমাজকাঠামো ভেঙ্গে পড়তে থাকে। পরিবার, গ্রামীণ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ দূর্বল হয়ে পড়ছে। একটি শ্রেণী অধিকতর ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। আর দরিদ্র ভোক্তা শ্রেণীটি দুর্গতির শেষ স্তরের নেমে যায়। রাজধানী শহর তেহরান দুটি অদৃশ্য নগরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উত্তর

অথবা পাচার করে। এরা প্রাচুর্যের কারণে চিরন্তনী ইরানী জীবনযাপন প্রণালীকে পরিহার করে পাশ্চাত্যের উপায়-উপকরণ ব্যাপকভাবে ব্যবহারের প্রচলন করে। সেই সাথে তারা পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা, জীবন দর্শনকে আঁকড়ে ধরে ধনৈশ্বর্যে ভরপুর বিলাস সম্ভোগে গা ভাসিয়ে দেয়। এই শ্রেণীটি উত্তরকালে পরিচিত হয় মোতাকাব্বেরীন নামে।

এর বিপরীত শ্রেণীটি হচ্ছে মোস্তাজাফীন বা পতিত, নিঃস্ব জনগোষ্ঠী। এরা কলকারখানায় ও খনির শ্রমিক, ক্ষেতমজুর, ট্যাক্সী ড্রাইভার, মেকানিক, মিস্ত্রী, ক্ষুদে দোকানদার, ব্যবসায়ী, পশুপালক ও প্রান্তিক কৃষক প্রভৃতি। এরা নানা সামাজিক অধিকার বঞ্চিত। খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, পানীয়জল ও গৃহায়ণের সুবিধা প্রভৃতি মৌল মানবিক সুবিধাবিহীন জীবনযাপনে বাধ্য মানুষ। এই শ্রেণীটি আবির্ভূত হয় শাহ পরিবারের অর্ধশতাব্দীব্যাপী পক্ষপাতমূলক সম্পদ ভোগ বন্টনের অন্যায় ব্যবস্থা ও কয়েকটি সামাজ্যবাদী শক্তির প্রতি তোষণ নীতির ফলশ্রুতিতে। অন্যভাবে বলা যায়, শাহ পরিবার ও অনুকম্পাপ্রাপ্ত 'পাওয়ার এলিট' শ্রেণীটি দেশে এক ধরনের 'লুটোক্রেসীর' অবতারণা করে এরা যুগপৎ নিজেরা সম্পদ কুক্ষিগত করে এবং বিদেশী প্রভু মিত্রদেরও লুণ্ঠনে সহযোগিতা করে।

বিশেষভাবে রাজপরিবারের সদস্যগণ যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন প্রভৃতি দেশের ব্যাংকে অগণিত পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত করে। এ অর্থ দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় কল্যাণে বিনিয়োগ করে নতুন নতুন কর্মসংস্থান ও জাতীয় উন্নয়নের ব্যবস্থা করা যেত। ফলে অর্থনৈতিক শোষণ প্রকাশ্য ও সুপরিকল্পিত রূপ পরিগ্রহ করে। সম্ভোগ প্রমত্ত শাসক শ্রেণী জনগণের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কৃষি জমিজমা নিজেদের করতলগত করে নেয় এবং এর সুবাদে বিপুল অর্থ সম্পদ হস্তগত করতে থাকে। পরিণতি হিসাবে কৃষি অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দেশের কৃষক শ্রেণী নিশ্চিত বিলুপ্তির মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। ক্ষুদ্র দরিদ্র কৃষক দরিদ্রতর হতে থাকে। নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হতে থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে শাহের এক জ্ঞাতি ভাইয়ের কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি দেশব্যাপী অজস্র কৃষিক্ষেত্রে সেচের পানি সরবরাহ তথা সেচ যন্ত্রপাতির একচ্ছত্র ব্যবস্থা করে এক সেচ সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। শাহের বেগম জনৈক রাজকুমারী উত্তরের বড় বড় ভূখন্ডের মালিক হয়ে বসেন এবং লুণ্ঠিত অর্থে মহাজাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদাদি নির্মাণ করে পাশ্চাত্য কায়দায় উশৃঙ্খল জীবন যাপনে লিপ্ত হয়ে পড়েন। সম্পদ ভোগ, বন্টনে ব্যাপক বৈষম্য ও অনাচার শাসক শ্রেণীকে চিরকালই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে এর প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে। ইরানের ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি। শোষিত বঞ্চিত জনসাধারণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে গোপনে গোপনে। এই মুহূর্তে ক্ষমতা বহিস্থ এলিট শ্রেণী (Non

বংশের অবৈধ স্বেচ্ছাচারী কর্তৃত্বকে হটিয়ে দিয়ে জনগণের ইচ্ছামাফিক একটি আইন ও যুক্তিসিদ্ধ (Legal-Rational) কর্তৃপক্ষকে রাষ্ট্রশাসনের দায়িত্ব অর্পণ করতে বদ্ধপরিকর হন। ফলে ইসলামী বিপ্লব অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে।

শাহের শাসনাধীনে ইরান একটি চৌকিদারী রাষ্ট্রে পর্যবসিত হয়। বিশাল সাভাক বাহিনী নির্ধারিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর কড়া নজর বজায় রাখতো। স্বাধীনভাবে জনমত গঠন বা ব্যক্তি বিশেষের মুক্ত চিন্তার চর্চার সুযোগ দেয়া হত না। কঠোর সরকারী নজরদারীর প্রেক্ষিতে যে সরকারী সন্ত্রাস পরিচালনা করা হতো তার ফলে অজস্র মানুষ দৈহিক নির্যাতন, গুপ্ত হত্যা, পঙ্গুত্ব, কারাভোগ ও নির্বাসনের শিকার হতো। এসব অন্যায় পন্থায় শাহ ও তার পারিষদবর্গ ক্ষমতার অপব্যবহার তথা আইনের শাসনের অনুপস্থিতি ও কেন্দ্রীভূত প্রশাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণকে নতুনভাবে সংগঠিত হতে অনুপ্রাণিত করে। রাষ্ট্রকে চৌকিদারী সংস্থা নয় একটি কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা উদ্বুদ্ধ হয়।

(খ) অর্থনৈতিক শোষণ ও মেরুকরণ

প্রথমে রেজাখান এবং অতঃপর রেজাশাহ দেশে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন তা অনিবার্যভাবে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। ফলে দ্রুত সামাজিক বিভাজন ও মেরুকরণ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। একদিকে মুষ্টিমেয় কিছু ভাগ্যবান ব্যক্তির হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হতে থাকে; এরা শাহী পরিবারের সদস্য এবং শাহের অনুগৃহীত ব্যক্তিগণ ও পারিষদবর্গ অন্যান্য রাজণ্য ও অনুচর শ্রেণীর ব্যক্তি। অপর দিকে দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সহায়-সম্পদহীন, সম্মানজনক জীবন যাপনের মত উপায়-উপকরণ বিবর্জিত ও গ্লানিকর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। রাষ্ট্রের বিপুল ও বিচিত্র সব প্রাকৃতিক সম্পদ কুক্ষিগত করে শাহ, শাহ পরিবার ও তার অনুগৃহীতবর্গ।

দেশের বড় বড় উর্বর ভূখন্ডসমূহ, খনি এলাকা, কলকারখানা, প্রস্তর ও বনভূমির মালিক হয়ে দাঁড়ায় মুষ্টিমেয় ব্যক্তি। অপরপক্ষে দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ দারুণ দারিদ্র ও বঞ্চনার মধ্যে নিমজ্জিত হতে থাকে। সম্পদ ভোগ ও বন্টনের ক্ষেত্রে এভাবে যে বৈষম্যমূলক অবস্থার উদ্ভব হয় তা সামাজিক মেরুকরণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। সমাজে দুটি শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে, একটি সম্পদশালী-সুবিধাভোগী শ্রেণী, অন্যটি নিম্নমানের বিত্তহীন শ্রেণী।

ইরানে চিরকালীনভাবে বিদ্যমান সরল সুখী মধ্যবিত্ত শ্রেণীটি শাহের অর্থনৈতিক পলিসির কারণে দ্রুত বিলুপ্ত হতে থাকে। একদিকে সুবিধাভোগী শ্রেণীটি বিশাল বাড়িগাড়ি, কলকারখানা, অর্থ বিত্তের মালিক হয়ে দেশে-বিদেশে অর্থসম্পদ পুঞ্জীভূত

সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক কর্মকান্ড সীমিত অথবা স্তব্ধ করার প্রয়াস গ্রহণ করেন শাহ। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মনে শাহের কর্তৃত্বের বৈধতার বিষয়টি প্রকটরূপ ধারণ করতে থাকে।

অবশ্য শাহ একপর্যায়ে তার বংশগত শাসনকে একটা আপাতঃ বৈধতা প্রদানের কৌশলী প্রয়াস গ্রহণ করেন। তিনি পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশের অনুকরণে তার রাজতন্ত্রকে বৈধরূপ দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং 'রাস্তখীজ পার্টি' নামক একটি অনুগত রাজনৈতিক দল গঠনের উদ্যোগ নেন। জাপান, বৃটেন, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুরূপ একটা ব্যাখ্যা গড়ে তুলে শাহ তার রাজ কর্তৃত্বকে একটা জনপ্রিয় ভিত্তি (Popular base) প্রদানের চেষ্টা করেন। কিন্তু জনগণ রাস্তখীজ পার্টির গঠন, কাঠামো ও ক্রিয়াকলাপ থেকে শাহের অভিসন্ধি পূর্বাহ্নেই উপলব্ধি করে তা প্রত্যাখ্যান করে। এভাবে শাহের কর্তৃত্ব ব্যাপক জনসমর্থন (Mass approval) লাভে ব্যর্থ হয় এবং তার শাসন অন্যায় ও অযৌক্তিক হিসাবে ক্রমশঃ প্রতিপন্ন হতে থাকে।

রেজা শাহ তার কর্তৃত্ব তথা স্বৈরশাসনকে অব্যাহত রাখার জন্য যে কঠোর নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ছিল সাভাক নামক বিশেষ গুপ্ত বাহিনী গঠন। এ কথা আধুনিক বিশ্বে সর্বজনস্বীকৃত যে কোন কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে, জনপ্রিয় শাসক কোন প্রাইভেট বাহিনী বা জনসাধারণকে অবদমনের জন্য ঠ্যাঙ্গারে কোন সংস্থা গঠন করতে পারে না। এরূপ কাজ স্পষ্টতঃ জনস্বার্থের পরিপন্থী। শাহের শাসন কতখানি গণবিচ্ছিন্ন ছিল এবং কিভাবে আরোপিত একটা রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন সাভাক গঠনই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অনুরূপভাবে সমাজের গভীরে, জনসাধারণের মধ্যে তার শিকড়হীনতার কারণেই, চূড়ান্ত জনস্বার্থ বিরোধী ক্যাপিটুলেশন আইন পাশ করেছিলেন। স্বদেশবাসীর প্রতি কোন মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধাবোধ না থাকলেই কেবল এমন বুনো-আইন প্রণয়ন করা সম্ভব। এতবড় অবমাননাকর আইন সঙ্গত কারণেই জনগণ বরদাস্ত করতে চায়নি-প্রত্যাখ্যান করেছে। আইনের আশ্রয় নেয়ার যে মৌলিক অধিকার ব্যক্তির রয়েছে এই আইন দিয়ে তা শুধু অস্বীকারই করা হয়নি প্রকারান্তরে দেশের সার্বভৌমত্বকেও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা হয়েছে। বিদেশী প্রভুদের মনোরঞ্জন তথা সমর্থন লাভের আশায় এমন অন্যায় আইন প্রচলন করতে শাহ কুণ্ঠিত হননি।

এমতাবস্থায় ইরানের জনসাধারণ নিজেদের মানবীয় এবং নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, রাষ্ট্র পরিচালনায় ন্যায়সঙ্গত অংশ আদায়ের জন্য, আইন প্রণয়নের ও প্রশাসনে নিজেদের চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটানোর উদ্দেশ্যে সর্বোপরি পাহলভী

বংশগত ধারাবাহিকতার নামে শাহ ক্ষমতা স্বেচ্ছায় অর্জন ও প্রয়োগ করতো অবাধে। রাজকীয় ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে সকল রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও আধিপত্য জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় নির্দ্বিধায়। শাহের রাজনৈতিক অস্তিত্ব এবং তার সৃষ্ট আইনকে কোনভাবেই যুক্তিসিদ্ধ (Rationalize) করা হয়নি। কাজেই তার আইন ও শাসন এবং কর্তৃত্বের না ছিল জনভিত্তি, না ছিল ধর্মীয় উৎস। অর্থাৎ শাহের অস্তিত্ব ও কর্তৃত্বের কোন নৈতিক ও যৌক্তিক (Moral and ethical) বুনিয়াদ ছিল না। ফলে শাহের শাসনের কোন কল্যাণকর রূপকাঠামো বিদ্যামান ছিল না। এরূপ একক ব্যক্তি কেন্দ্রিক শাসন নীতির জন্য শাহের অস্তিত্ব ও কর্তৃত্বের বৈধতার প্রশ্নটি জনগণের চেতনায় ক্রিয়াশীল থেকেছে।

মানুষ প্রকৃতিগতভাবে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যকে অনুভব করতে চায়, ক্ষমতা অর্জন ও প্রয়োগ করতে পছন্দ করে। আধুনিক কালের মানুষের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অংশীদারিত্বের ধারণা ও আকাংখা যথেষ্ট প্রবল। কিন্তু ইরানের জনগণকে শাহ রাজনৈতিক ক্ষমতায় অংশীদার হতে দেননি। শাহ মনে করতো সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ দেশের নাগরিক নয়–তারা রাজ্যের প্রজা মাত্র।

রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া থেকে তাদের সতর্কভাবে দূরে রাখা হয়েছে। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্যকলাপ হতে জনগণকে সুকৌশলে সরিয়ে রাখা হয়েছে। রাষ্ট্রের তথা জনগণের ভাগ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন এখ্তিয়ার জনগণকে দেয়া হয়নি। এর ফলে জনমানসে বঞ্চনাবোধ অধিকারহীনতা ও ক্ষমতাহীনতার (Powerlessness) উপলব্ধি প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠে।

আবার কখনো কখনো দেশবাসীকে রাজনৈতিক ক্ষমতায় ভাগ দেয়ার নামে প্রবঞ্চিত করা হয়েছে। শাহ যে পার্লামেন্ট (মজলিস) করেছিলেন তার সদস্যগণ জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধি ছিল না, তারা ছিলেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বাছাই করা তোষামোদকারী অভিজাত আজ্ঞাবহ প্রকৃতির লোকদের মজলিস। এই নামমাত্র মজলিস জনসাধারণের ম্যান্ডেট নিয়ে তৈরি হতো না। তাই এই সদস্যগণ জনগণের কাছে জবাবদিহি করতেও বাধ্য ছিল না। এটা ছিল রাজভক্ত অনুচরবর্গের পার্লামেন্ট।

অন্যদিকে, দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সৎ মানুষদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ দেয়া হত না। সংগঠিত হওয়ার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মৌল–অধিকার। একচ্ছত্র শাসক শাহ তার ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এ অধিকার হরণ করেন এবং সংগঠন প্রয়াসী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর নির্যাতন চালান। বিশেষভাবে দেশের উলেমা সম্প্রদায় দেশের বিবেকবান মানুষদের মুখপাত্র হিসাবে জাতির যে কোন সংকটকালে এগিয়ে এসেছেন–জাতিকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এই উলেমা

কিংবা একে কেবল মুসলিম বিশ্বের একটি বিষয় হিসাবে দেখাও যথার্থ হবে না। বরং বিংশ শতাব্দীর একটি প্রধান ঘটনা তথা বিশ্ব-রাজনীতির অন্যতম নবদিগন্তের উত্থাপনকারী বিষয় হিসাবে বিবেচনার দাবী রাখে।

যে ইরান কয়েক হাজার বছর ধরে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে নানা ঐতিহাসিক চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে একটি প্রাচীন চিরাচরিত ধারায় বিংশ শতাব্দীতে এসে উপনীত হয়েছে সেই সমাজে এমন ব্যাপক ও চূড়ান্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব হলো কিভাবে। কোন্ সমাজ-অন্তর্গত শক্তি এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল ছিল? আর কোন্ রাজনৈতিক উপাদান এর চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করেছে? এত বড় রাজনৈতিক রূপান্তর, সামাজিক পরিবর্তন দর্শন বিবর্জিত কোন হুজুগের পরিণতি হতে পারে না; কিংবা রাতারাতি ঘটে যাওয়া কোন আকস্মিক ঘটনাও নয়। এর পশ্চাতে অবশ্যই কতিপয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ বিদ্যমান ছিল। এ যুগান্তকারী ইসলামী বিপ্লবের পটভূমি হিসাবে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ সক্রিয় ছিল তা বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

(ক) শাহের একচ্ছত্র নিবর্তনমূলক শাসন (Tyranical rule of the Shah)

পাশ্চাত্যের কতিপয় উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রশক্তির সহায়তায় শাহ পরিবার ইরানের রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। একজন ব্যক্তিকে, একটি পরিবারকে ইরানের বংশগত শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা ও ক্ষমতা দানের পশ্চাতে বিশেষতঃ বৃটেন এবং তার মিত্রবর্গের ব্যাপক বাণিজ্যিক স্বার্থ ও কূটনৈতিক অভিলাষ বিদ্যমান ছিল। শাহ বংশও সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীসমূহের রাজনৈতিক আনুকূল্য ও সামরিক সহযোগিতা লাভ করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেয়েছে। তাই বলা যায় শাহের ক্ষমতার উৎস দেশের জনগণ ছিল না। বরং তা দেশের বাইরে-সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আশ্বাসের মধ্যে নিহিত ছিল।

বিশেষভাবে হৃতক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে দ্বিতীয়বার সিংহাসনে বসার পর থেকে (১৯৫৩) রেজা শাহ হয়ে উঠেন দারুণ স্বেচ্ছাচারীএকনায়ক। তার একচ্ছত্র ক্ষমতার দোর্দন্ড দাপট ক্রমাগতভাবে প্রকাশ ও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি রাষ্ট্রীয় সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন তার নিজ হাতে; অথবা কখনো তার পরিবারের অন্য সদস্যের হাতে। মূলতঃ এক ব্যক্তির ইচ্ছাই হয়ে দাঁড়ায় দেশের সকল আইন ও শাসনের উৎস। এ ধরনের একচ্ছত্র শাসন নিঃসন্দেহে নিবর্তনমূলক অবস্থায় পর্যবসিত হয়। ক্ষমতা অর্জন ও কার্যকরি করার ক্ষেত্রে শাহের শাসনাধীন ইরানে চাপ প্রয়োগ, ভীতি প্রদর্শন, নির্যাতন-অবদমন ইত্যাদি হয়ে উঠে প্রধান পন্থা।

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের সামাজিক–সাংস্কৃতিক পটভূমি

ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বের অপরিহার্যতা

ডক্টর আব্দুর রহমান সিদ্দিকী

পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যদেশসমূহের মধ্যে ইরান অন্যতম। ইরানী জাতি অত্যন্ত গৌরবময় ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ধারক। যুগে যুগে অনেক যুদ্ধ–বিগ্রহ, বিচিত্র রাজনৈতিক উত্থান–পতন ও সামাজিক রূপান্তরের পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে ইরান বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় একটি মহান জাতি হিসাবে স্থান লাভ করেছে।

সাম্প্রতিককালে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সুপ্রাচীন রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার স্থলে একটি ইসলামী রাষ্ট্রসত্তা হিসাবে ইরানের নবঅভ্যুদয় ঘটেছে। এই রাজনৈতিক ও সামাজিক রদবদলকে অভিহিত করা হয়েছে 'ইসলামী বিপ্লব' হিসাবে। আর এ বিশাল রাজনৈতিক আন্দোলন তথা সমাজ পরিবর্তন প্রক্রিয়া তথা ইসলামী বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছেন এমন একজন প্রবীণ ব্যক্তি যিনি একাধারে প্রখর মেধাসম্পন্ন ধর্মতত্ত্ববিদ (ফকিহ), আধ্যাত্মিক নেতা ও দার্শনিক হিসাবে ইরানে সুপরিচিত। বর্তমান শতাব্দীর শেষার্ধের বিশ্ব রাজনীতিতে ইমাম খোমেনী একজন বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তার ইসলামী বিপ্লবও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। সমকালীন রাজনৈতিক দর্শন ও কর্মকান্ডে এতদুভয়ই নবতর মাত্রা সংযোজন করেছে। একদিকে পাহলভী বংশের বিলুপ্তি ও নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে অন্য দিকে ইরানের প্রথা–প্রতিষ্ঠান, মূল্যবোধ ও সার্বিক জীবন ধারায় এসেছে নানা পরিবর্তন। অন্যকথায় ইসলামী বিপ্লব ইরানের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ও সমাজের অভ্যন্তরে কতগুলো মৌলিক রদবদল সূচিত করেছে।

ইরানের চিরায়ত ঐতিহ্যমন্ডিত সমাজ ব্যবস্থায় ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার কি প্রেক্ষিত বিদ্যমান ছিল? কি ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদান ইসলামী বিপ্লবের পশ্চাত্যে বিদ্যমান ছিল? এসব জিজ্ঞাসার জবাব সামাজিক চিন্তাবিদগণের কাছে খুবই অর্থবহ। এই বিপ্লব সমাজ বিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রতত্ত্ববিদগণের কাছে অত্যন্ত কৌতূহলের বিষয় বৈকি। এর পঠন–পাঠনগত ও সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্বও ব্যাপক। কেননা ইরানের ইসলামী বিপ্লব স্রেফ একটি দেশের রাজনৈতিক অভ্যুত্থানই নয়;

লেখক ঃ প্রাবন্ধিক, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সবাইকে একথাটি ভাল করে উপলব্ধি করতে হবে।

দেশ থেকে বিতাড়িত একজন ভাসমান ব্যক্তিকে সারা দুনিয়ার মোড়ল আমেরিকার কঠিনতম ষড়যন্ত্রের মুখে যে খোদা বিস্ময়কর বিজয় দান করেছিলেন, সে খোদাই আজকের প্রতিকূলতায় আমাদের সাহায্য করবেন এ বিশ্বাসই আমাদের মূল শক্তি হতে হবে।

আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য অসাধারণ ঈমানী শক্তিই একমাত্র অবলম্বন। মাত্র ক'দিন আগের এ অভিজ্ঞতা আজও কাজে লাগাতে হবে। মানবীয় হিসাব নিকাশের খাতার দিকে বেশী বেশী নজর দিয়ে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার যোগ্যতা হারাবার আশংকা থাকে। গোটা দুনিয়ার মজলুম মানবতা আজ ইমাম খোমেনীর মত নেতৃত্বের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। বোসনিয়া-হারজেগোভিনা সহ সর্বত্র মজলুমের হাহাকার আল্লাহর যমীনকে ভারী করে তুলেছে। নির্যাতিত মুসলিম নর-নারী-শিশুর আর্ত চিৎকার আকাশে বাতাসে আওয়াজ তুলেছে, হে আমাদের রব জালিম অধ্যুষিত এ জনপদ হতে আমাদেরকে উদ্ধার কর। তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন ওয়ালির ব্যবস্থা কর। পাঠাও আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে কোন সাহায্যকারী।

তোমাদের কি হল যে তোমরা আল্লাহর রাহে সর্বাত্মক সংগ্রামে অবতীর্ণ হচ্ছো না?

মনে হয় কোরআনে পাকের আয়াতে কারীমা একথাই বলছে।

অভাব। ইমাম খোমেনীর (রহঃ) মধ্যে বিশেষ গুণটির অসাধারণ বিকাশ ঘটেছিল বলেই তিনি পেয়েছিলেন আল্লাহর সাহায্য।

আল্লাহর নবী তাঁর ভাষায় ঈমানের শ্রেণী বিন্যাস করেছেন এভাবেঃ তোমাদের মধ্যে যে কেউ অকল্যাণকর তথা অন্যায় সংঘটিত হতে দেখবে সে যেন তা প্রতিহত করে তার শক্তি দিয়ে। যদি তা না পারে তাহলে মুখে প্রতিবাদ করবে। আর যদি মুখে প্রতিবাদ করবার মত (ঈমানী শক্তি) ক্ষমতাও তার না থাকে তাহলে অন্ততঃ অন্তর দিয়ে ঐ আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে অর্থাৎ ঐ কাজ তার মনে পীড়া সৃষ্টি করবে। আর এ অবস্থাটি হচ্ছে দুর্বলতম ঈমানের অবস্থা।

এ হাদীছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অন্যায়ের প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ন্যায় সাহসী ভূমিকা পালন করাকে সর্বোচ্চ শ্রেণীর ঈমান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ করতে না পারলেও মনের মধ্যে একটি অসহনীয় অবস্থা সৃষ্টি হওয়া ন্যূনতম ঈমানের দাবী।

সমাজে জালিম ফাসিক খোদাদ্রোহীদের কতৃত্ব চলবে আর ঈমানদার এসব থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল নামাজ রোজা তাসবীহ তাহলীলে মশগুল হবে তা হতে পারে না। অনৈসলামী সমাজের অসংখ্য অন্যায়কে পাশ কাটিয়ে আনুষ্ঠানিক ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত হয়ে কোন মুসলমান তার ঈমান রক্ষা করতে পারে না। লোকেরা নামাজী রোজাদার বা আবেদ বলে এমন লোকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলেও ইসলামের দৃষ্টিতে তারা ঈমানদার হতে পারে না।

ইমাম খোমেনী (রহঃ) নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চ শ্রেণীর ঈমানদারদের নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

আল কোরআনের উপস্থাপিত মাপকাঠিতে ইমাম খোমেনী (রহঃ) ছিলেন আল্লাহর সে সকল মুষ্টিমেয় বান্দাহদের অন্তর্ভূক্ত যাদের প্রতি আল্লাহ রাজী হয়েছেন এবং যারা আল্লাহর প্রতি রাজী।

আল্লাহ তাঁর ওয়ালিকে জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা নসীব করুন। তার প্রতিষ্ঠিত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান সকল তাগুতি শক্তির মুকাবিলায় বিশেষ করে মুসলমানদের বড় দুশমন মানবতার শত্রু তথাকথিত বৃহৎশক্তি আমেরিকার নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা (?) (New world order) এর অশুভ চক্রান্তের মুকাবিলায় দুনিয়াতে চির শাশ্বত ইসলামী বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সফল নেতৃত্ব দানে এগিয়ে আসুক।

ইমাম খোমেনীর হিকমাত ছিল 'তাওয়াক্কাল' আলাল্লাহ। সেক্যুলার এবং নাস্তিকদের অনুসরণে কূটনীতির আশ্রয় নিলে ইসলামী শক্তির অগ্রগতি তো সম্ভব নয়ই। অর্জিত বিজয় ধরে রাখাও সম্ভব হবে না।

বিরুদ্ধে অস্ত্র সরবরাহ করে ন্যাক্কারজনক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়নি? ফিলিস্তিনী মুসলমানদের তথাকথিত নেতা ভারতে এসে কাশ্মীরের মুসলমানদের জিহাদকে অবৈধ আখ্যায়িত করতে এতটুকু লজ্জাবোধ করলেন না। বললেন বিষয়টি ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।

এই যখন মুসলমানদের 'আমর বিন মারুফ নাহি আনিল মুনকারের' দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত মুসলমানদের একটি বিরাট অংশের আসল চেহারা তখন নবীর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত ওলামা সমাজ তাদের দায়িত্ব পালন করছেন কতটুকু? ইমাম খোমেনী (রহঃ) আমরণ ওলামাদের প্রতি আকুল আবেদন করেছিলেন বারবার' আমর বিন মারুফ নাহি আনিল মুনকার' এর দায়িত্ব পালনের জন্য।

ইমাম খোমেনী বিশ্ববাসীকে একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র উপহার দিয়ে গেছেন। অথচ তিনি নিজে ক্ষমতার দন্ডমুন্ডে হাত দেননি। বিচারকের আসনে বসে বিচার কার্য পরিচালনা করেননি। আজ আর তিনি আমাদের মাঝে বর্তমানও নেই। তবুও সালমান রুশদী পৃথিবীর আলো বাতাসে মুখ দেখাতে সক্ষম হচ্ছে না কেন? সব তাগুতি শক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টা একজন মৃত মানুষের একটি কথার অশরিরী শক্তির মুকাবিলা করতে যেখানে ব্যর্থ–সেই রুহানী শক্তির অধিকারী হলে, সে যোগ্যতা সে জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারলে, তাগুতি শক্তির দিকে সে অগ্নিদৃষ্টি দিয়ে তাকাতে পারলে, ঈমানের সে শক্তি অর্জিত হলে, আমরা কেন পারব না সাম্রাজ্যবাদী ইয়াহুদী–নাসারার চক্র আধিপত্যবাদীদের বিষ দাঁত ভেঙ্গে দিতে?

বাবরী মসজিদের প্রতিটি ইটের কণা পুনরুদ্ধার করে আল্লাহর ঘর পুনঃনির্মাণের এ অবশ্য করণীয় কাজটি আঞ্জাম দিতে? আমরা কি পারি না আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার অধিকার লাভ করতে?

ইমাম খোমেনীর অনুসরণ করে বর্তমান বিশ্বের ইসলামী পুনর্জাগরণকে কামিয়াবির মনজিলে পৌঁছে দেয়া সম্ভব। নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার নামে ইসলামের দুশমনদের সকল ষড়যন্ত্রের মুকাবিলা করতে আজ প্রয়োজন বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের সম্মিলিত এবং ঐক্যবদ্ধ জিহাদ। আর এজন্য প্রয়োজন একটি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। সকল মাজহাবী মতপার্থক্যের উর্ধ্বে উঠে কেবলমাত্র 'লি ইলায়ে কালিমাতিল্লাহ' তথা কালিমার আওয়াজ বুলন্দ করার জন্য আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকারের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক এবং সর্বাত্মক সংগ্রাম ছাড়া ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ এ পৃথিবীতে শান্তি–আর ইনসাফ কায়েম সম্ভব নয়। মজলুম মানবতার এ মুক্তির সংগ্রামে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানকেই অগ্রণী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহর প্রতি ঈমান থাকা সত্ত্বেও তাগুতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার যোগ্যতা সম্পন্ন মুসলমানের আজ বড়

'সর্বোত্তম জিহাদ' বা আফজালুল জিহাদ বলে হাদীসের ছহীহ্ বর্ণনায় আল্লাহর নবী মুহাম্মাদুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জিহাদের কথা বলেছেন তা হচ্ছে।

অর্থাৎ সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে, অত্যাচারী শাসকের মুখোমুখি হক কথা বলা।

এর বাস্তব নমুনা বিশ্ববাসী স্পষ্টতঃই শুনেছে ইমাম খোমেনীর জড়তাবিহীন বজ্রসমতুল্য কণ্ঠের ধ্বনিতে।

শুধু স্বৈরাচারী শাহের বিরুদ্ধেই নয় কালের সর্ববৃহৎ জালিম শক্তি আমেরিকা এবং রাশিয়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ইমাম খোমেনী হকের আওয়াজ বুলন্দ করতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেননি।

গোটা বিশ্বের তাগুতি শক্তির ভিত্ কাঁপিয়ে দিয়ে দিকে দিকে ইসলামী বিপ্লবের সৈনিকদের মনে যে সাহস সঞ্চার করেছিলেন ইমাম খোমেনী (রহঃ) তার ফলশ্রুতিতে আজ বিশ্বজোড়া ইসলামী আন্দোলন সমুখ পানে এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে।

'আমর বিল মারুফ নাহি আনিল মুনকার' এর কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্যই আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফার মর্যাদা দিয়ে পাঠিয়েছেন। অথচ বিশ্বের সোয়াশ কোটি মুসলমান আজ বিশ্বজোড়া তাগুতি শক্তির অকথ্য নির্যাতনের নীরব সাক্ষী। বিশেষ করে ওলামা সমাজ নবীর উত্তরাধিকার নিয়ে নবীর আদর্শের অবমাননাকারী ইসলামের দুশমনের ভয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকাই পালন করে চলেছেন। অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম তো রয়েছেই। তবে তা উল্লেখ করবার মত অবশ্যই নয়। ইরানের ইসলামী বিপ্লবের আগের অবস্থা তো ওলামাদের দীর্ঘ নীরবতার এক করুণ ইতিহাস। নইলে গুটিকতক ইহুদীর হাতে ফিলিস্তিনী মুসলমানদের এ করুণ অবস্থা কি করে সৃষ্টি হল? বোসনিয়া-হার্জেগোভিনায় ইতিহাসের নৃশংসতম মুসলিম নিধনের বিরুদ্ধে কোন আওয়াজ বিশ্বের সোয়াশ' কোটি মুসলিমের মুখে আজ কেউ কি শুনতে পাচ্ছে?

লক্ষ লক্ষ আরাকান মুসলিম হাজার হাজার আপনজনের নির্মম হত্যার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে দেশ থেকে বিতাড়িত হল। কোন মুসলমান দেশ তাদের পক্ষে একটি পদ উচ্চারণ করেছে? কাশ্মীরের মজলুম মুসলমানদের উপর যে পাশবিক অত্যাচারের স্টিম রোলার চালানো হচ্ছে। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে এর কি কোন অর্থপূর্ণ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়?

আলজেরিয়ার মুসলমানদের অগ্রযাত্রা রুখে দাঁড়ানো হল। মসজিদের ইমাম-মুসল্লিদের উপর হত্যাযজ্ঞসহ যে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করা হল। মুসলমানদের সর্ববৃহৎ দুশমন আমেরিকার দোসর হয়ে রাজতন্ত্রবাদী মুসলিম দেশ যারা সারা দুনিয়ার মুসলমানদের পুরোধা হওয়ার দাবীদার সেই তারাই কি আলজেরিয়ার মুসলিম ভাইদের

নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত–ষড়যন্ত্র আসলে দুর্বল।

ইমাম খোমেনী যেন উল্লেখিত খোদায়ী কালামের মূর্ত প্রতীকরূপেই আবির্ভূত হয়েছিলেন মজলুম মানবতার ভাগ্যাকাশে। রাজতন্ত্র নামক স্বৈরশাসনের যাঁতাকলে নিগৃহীত মানুষের জন্য তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত অভিভাবকের সার্থক ভূমিকাই পালন করে গেছেন বলা যায়। ইমাম খোমেনী অকুণ্ঠ চিত্তে জালিমের বিরুদ্ধে মজলুম পুরুষ, নারী ও শিশুর পক্ষে আক্ষরিক অর্থেই জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তাঁর যে আপোষহীন সংগ্রাম খোদাদ্রোহী জালিমের প্রাসাদ ভেঙ্গে খান খান করে দিয়ে কোটি কোটি বনি আদমকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে সে কথা আজ নির্দ্বিধায় বলা যায়।

উল্লেখিত আয়াতে কারীমায় যে ওয়ালির জন্য মজলুম মানবতার আর্তনাদের কথা বলা হয়েছে সে ওয়ালী কোন নির্লিপ্ত স্বেচ্ছা নির্জনব্রত গ্রহণকারী কোন সাধক নন। বরং মজলুমের পক্ষে জালিমের বিরুদ্ধে নির্ভীকচিত্ত, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দানের যোগ্যতাসম্পন্ন, রুহানী শক্তিতে বলিয়ান কোন মহান ব্যক্তিত্বই আয়াতে বর্ণিত ওয়ালির স্বরূপ। ইমাম খোমেনীর বিশ্বকাঁপানো বিদ্রোহের সে আঘাত–যা তিনি তাগুতের বিরুদ্ধে হেনেছিলেন–বিশ্ববাসীকে তেমন ওয়ালির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। যার অনিবার্য পরিণতিতে আল্লাহর সে সাহায্য আবার বিশ্ববাসী নয়নভরে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্যলাভ করেছিল।

আমেরিকা তাদের জিম্মি উদ্ধারের নামে ইরানকে ধ্বংস করার জন্য যে কমান্ডো হামলা রচনা করেছিল সে কমান্ডো বহর আল্লাহর কুদরতে অজানা কারণেই মরুবক্ষে বিধ্বস্ত হল। আজও তার কারণ তারা খুঁজে পায়নি।

কিটি হক নামক সেই নৌবহর যা ইরানের মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য পাঠানো হয়েছিল অকারণে যে কিটি হকের এক বিশাল রণতরীও সমুদ্র বক্ষে সমাধিস্থ হল তার সকল ক্রুদের নিয়ে। এসবই ছিল আল্লাহর পাঠানো সাহায্যের জ্বলন্ত নমুনা। যা গোটা বিশ্ববাসী বিস্ময়ের সাথে প্রত্যক্ষ করেছে। প্রমাণিত হয়েছে শয়তানের চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের জাল আসলেই দুর্বল।

বাংলা উচ্চারণ ঃ আঁ লমান বাশাম কে বোজে জঙ্গে বীনী পোশতে মান,

আঁ মানাম গার দরমিয়ানে খাক ও খুঁ বীণী ছারে।

জিহাদের ময়দানে তুমি আমার পিঠ দেখবে আমি তেমন কেউ নই।

যদি দেখই, তবে আমার রক্ত ধূলায় মিশ্রিতাবস্থায় তুমি দেখতে পার।

শেখ সাদী রহঃ আলাইহের বিখ্যাত গুলিস্তা গ্রন্থের এ দু'টি পংক্তির সার্থকরূপ ইরানের মুসলমানদের ইসলামী বিপ্লবের সেদিনের সে লড়াই এ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

ইসলামী বিপ্লবের সফল নায়ক

আবুল কালাম আযাদ

ইসলামী বিপ্লবের সফল নায়ক, বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণের অন্যতম প্রধান প্রাণপুরুষ, নির্যাতিত-নিপীড়িত পুরুষ-নারী ও শিশুর দরদী নেতা, দ্বীনের দুশমন তাগুতি শক্তির আতংক, নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সার্থক উত্তরাধিকারী কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলের মজবুত ধারক, আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী শতাব্দীর মুয়াজ্জিনরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এসেছিলেন পৃথিবীর ঘটনাবহুল এলাকা সভ্যতার ইতিহাসের উজ্জ্বল সাক্ষী ইরানভূমিতে। বিশ্বব্যাপী মজলুম মানুষের ভাগ্যাকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে ঘটেছিল ইমাম খোমেনীর আগমন। আধুনিক জগতের আধুনিক ফিতনার মুকাবিলায় বর্তমান বিশ্বের সর্ববৃহৎ তাগুতি শক্তি আমেরিকার সর্বগ্রাসী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে বিশ্ববাসীকে একটি আদর্শ ইসলামী বিপ্লব উপহার দেয়ার সকল যোগ্যতার সমাবেশ রাব্বুল আলামীন যে ব্যক্তিত্বের মধ্যে ঘটিয়েছিলেন এবং যার অনুপস্থিতি শুধু মুসলিম উম্মাহকে কাঁদায়নি, ক্রন্দন সৃষ্টি করেছে দুনিয়ার প্রতিটি মজলুম মানুষের হৃদয়ের গভীরে, তিনিই ইমাম খোমেনী।

No east No west Islam is the best.

পূর্ব নয় পশ্চিম নয় ইসলামই সর্বোত্তম। আল্লাহর গোলামীর পরিবর্তে আমেরিকা আর রাশিয়ার গোলামীর প্রতিযোগিতায় প্রাণান্ত সংগ্রামে ব্যস্ত একটি পৃথিবীকে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবার এক অসাধারণ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে এ মহান পুরুষ সার্থকভাবে প্রমাণ করেছেন-এ আধুনিক বিশ্বের সর্বশেষ কলাকৌশল কম্পিউটার প্রযুক্তি, পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার আল্লাহর শক্তির মুকাবিলায় অত্যন্ত অসহায়।

তোমাদের কি হয়েছে তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না, অথচ নির্যাতিত পুরুষ-নারী এবং শিশুরা আর্তনাদ করে বলছেঃ হে আমাদের রব জালিম অধ্যুষিত এ জনপদ থেকে আমাদের উদ্ধার কর আর আমাদের জন্য তোমার পক্ষ হতে কোন অভিভাবক নিযুক্ত কর। পাঠাও তোমার পক্ষ হতে আমাদের জন্য সাহায্য।

যারা ঈমান এনেছে তারা তো সংগ্রাম করে আল্লাহর রাহে আর যারা কুফরি করছে লড়াই করে তাগুতের পথে। তোমরা শয়তানের ওয়ালিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর।

লেখক ঃ বিশিষ্ট আলেম ও ওয়ায়েজ, সেক্রেটারী, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন

(গিলান প্রদেশ ও রাসত শহরের জুময়ার ইমামদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত বাণীর অংশ বিশেষ, নিউজ লেটার, জুন, ১৯৯০)

বিশ্বের মুসলিম ও মজলুম জনগণের মুক্তির দিশারী ইমাম খোমেনী (রঃ) আজ বেঁচে নেই। কিন্তু ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকার ও ধৈর্য ধারণের যে শিক্ষা তিনি দিয়ে গেছেন, সাম্রাজ্যবাদী, আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামের যে ঐতিহ্য তিনি রেখে গেছেন তা যুগ যুগ ধরে ইরান এবং বিশ্বের মুসলিম ও মজলুম জনগোষ্ঠীকে প্রতিবাদী ভূমিকা পালনে শক্তি, সাহস ও প্রেরণা যোগাবে। মানুষের স্মৃতিতে এবং ইতিহাসে তার নাম এবং অবদান দুই–ই অক্ষয় হয়ে থাকবে।

হয়নি। সীমাহীন ত্যাগ এবং শাহাদাতের মাধ্যমে ইরানী জনগণ শেষ পর্যন্ত ইসলামী বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সক্ষম হন এবং ইমাম খোমেনী (রঃ) গোটা বিশ্বের সামনে এক সফল বিপ্লবী নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। এরপর দু'টি ঘটনায় তাঁর জনপ্রিয়তার পরিধি ইরানের গন্ডী অতিক্রম করে গোটা মুসলিম বিশ্বে পরিব্যপ্ত হয়। প্রথম ঘটনাটি হলো, তৎকালীন রুশ প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের নিকট ইমাম খোমেনীর ইসলামী দাওয়াত। দ্বিতীয়টি হলো, ইসলাম বিদ্বেষী গ্রন্থ 'শয়তানী গাঁথা'র লেখক সালমান রুশদীর বিরুদ্ধে তাঁর ঐতিহাসিক ফতোয়া।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভকে ইসলামের দাওয়াত পাঠানোর ঘটনা মনে করিয়ে দেয় রোম সম্রাট ও চীন সম্রাটের কাছে বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ইসলামী দাওয়াত পাঠানোর ঘটনা। রুশদীর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ঘোষণাও তেমনি স্মরণ করিয়ে দেয় কা'ব-বিন-আশরাফ নামক এক ইসলাম বিদ্বেষী কবির বিরুদ্ধে মহানবী (সাঃ)-এর মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ঘটনাকে। বস্তুত, মহানবীর আদর্শে প্রত্যয়ী ইমাম খোমেনী (রঃ) গর্বাচেভকে ইসলামী দাওয়াত পাঠিয়ে এবং রুশদীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার ঘোষণা দিয়ে একদিকে নিজের একটা আত্মবিশ্বাসী ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হন, অন্যদিকে গোটা মুসলিম উম্মাহ্‌র হৃদয়ে একটা স্থায়ী শ্রদ্ধার আসন লাভ করেন।

ইমাম খোমেনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এই যে, তিনি মুসলমানদের ঐক্য সাধনে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন। তিনি আরব-অনারব, শিয়া-সুন্নী ইত্যাদি নামে বিভক্ত মুসলিম উম্মাহ্‌কে ঐক্যবদ্ধ হবার সঠিক পথনির্দেশ দিয়েছেন। ইসলাম ও মানবতার বৃহত্তর স্বার্থে তিনি সবসময় বিতর্কিত বিষয়কে পরিহার করেছেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, 'গোড়া থেকেই মুসলমানদেরকে শিয়া, সুন্নী, হানাফী, হাম্বলী ইত্যাদি দল-উপদলে বিভক্ত করা ঠিক হয়নি।' মুসলিম ঐক্যের উপর তিনি সর্বাধিক জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "ঐক্য হচ্ছে এমন একটি আদর্শ যার দিকে পবিত্র কুরআন মানুষকে নির্দেশনা দিয়েছে এবং মহান ইমামগণও মুসলিমদের ঐক্যের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। মূলতঃ ইসলামের প্রতি আহবান মানেই হচ্ছে ঐক্যের প্রতি আহবান, জনগণকে ইসলামের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান। আপনারা জানেন যে, ইসলামের দুশমনরা এ ধরনের ঐক্যকে বাস্তবায়িত হতে দেয়নি। বিশেষ করে সাম্প্রতিক শতাব্দীগুলোতে তারা কঠোরভাবে চেষ্টা করেছে যাতে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও বিরোধের আগুন প্রোজ্জ্বলিত হয়; কেননা তাদের বিশেষজ্ঞগণ বুঝতে পেরেছে যে, যদি বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ্ সংহত ও ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, তাহলে কোন শক্তিই তাদের মোকাবেলা করতে ও তাদের উপর শাসন চালাতে সক্ষম হবে না।"

নানাবিধ অন্যায়-অবিচার, জুলুম-পীড়ন, শোষণ-বঞ্চনা সহ্য করে নিতে অভ্যস্ত ছিল। এ রকম পরিত্রাতা বা শান্তিকর্তার জন্য প্রতীক্ষারত জনগোষ্ঠীকে সমকালীন দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করার কাজটি যে অত্যন্ত কঠিন ছিলো সেটা যে কেউ স্বীকার করবেন। ইমাম খোমেনী (রঃ) ইসলামের মর্মবাণীর আলোকে ইজতিহাদ তথা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে ইসলামী বিপ্লব সংঘটনের পূর্বে এই 'শাশ্বত প্রতীক্ষা রোগের' চিকিৎসা করেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেন, "আমরা যখন বিশ্বাস করি যে, ইসলামী শাসন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন চিরন্তন, সর্বসময়ে কার্যকর এবং এ-বিধি-বিধানকে কোন অবস্থাতেই অনির্দিষ্টকালের জন্য বেকার ফেলে রাখা যায় না, তখন আমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা। বিবেক-বুদ্ধিও সেই কর্তব্যের কথাই বলে। শিয়া আকিদামতে মুসলমানদের ইমাম বর্তমানে গায়েব বা অদৃশ্য হয়ে আছেন। এখন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের জন্য কোন এক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করার পক্ষে কোন অকাট্য দলিল পাওয়া যায় না। ... তাহলে এখন কী করতে হবে? আমরা কী নিজেরাই ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে আকৃষ্ট হয়ে যাব? অথবা আমরা বলবো, ইসলাম মানুষকে শুধু কিছুকালের জন্য শাসন করতে এসেছিলো, তা শেষ হয়ে গেছে, অতঃপর ইসলামের আর কিছুই করণীয় নেই?" (বিলায়েতে ফকীহ, ইমাম খোমেনী, ইমাম প্রকাশনী, পৃষ্ঠাঃ ৫২, ৫৩)

ইরানী জনগণের সামনে ইমাম খোমেনী (রঃ) আরও বলেন, "আমরা নিশ্চিত জানি ইসলামী সরকারের অনুপস্থিতির অর্থ হচ্ছে মুসলমানদের ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা, তাদের পদে পদে অপমানিত-লাঞ্ছিত হওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়া। তার ফলে আমাদের শুধু অধিকার থেকেই বঞ্চিত হতে হবে না, আমাদের জন্মভূমির স্বাধীনতাও আমরা হারিয়ে ফেলবো। কিন্তু দ্বীন ইসলাম কি আমাদের সেই সুযোগ দিচ্ছে? .... রাষ্ট্র ও সরকার কায়েম করা কী জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনের মধ্যে গণ্য নয়? (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩)।

এ-জাতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করে ইমাম খোমেনী (রঃ) ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের সপক্ষে ইরানে প্রবল জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হন। যারা ন্যায়পরায়ণ এবং আইনের জ্ঞান রাখেন তাদেরকে জনগণের শাসক নিয়োগ করার কথা তিনি জোর দিয়ে বলেন। তিনি দাবী করেন যে, "এ দায়িত্ব সততার সঙ্গে পালন করার মত বহু আলেম ইরানে রয়েছে। সকলে একত্রিত হয়ে দায়িত্ব পালনের সংকল্প গ্রহণ করলে একটি তুলনাহীন বিশ্বজনীন ন্যায়বাদী রাষ্ট্র কায়েম করা খুব সহজেই সম্ভব হবে।" ইমাম খোমেনীর এই প্রত্যয়দীপ্ত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ইরানের আলেম সমাজকে বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করে। তবে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সম্পন্ন করার কাজটি 'খুব সহজে সম্ভব'

মুসলিম ও মজলুম জনতার মুক্তির দিশারী

সৈয়দ তোসারফ আলী

সমকালীন বিশ্বে ইরানের ইসলামী বিপ্লব এক বিস্ময়কর ঘটনা। ইরানে ইসলামের উত্থান এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব-ইউরোপে কমিউনিজমের পতন সমসাময়িক ব্যাপার। এ দুয়ের মধ্যে একটা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক থাকা বিচিত্র নয়। ইরানের জবরদস্ত পাহলবী রাজতন্ত্রকে সমূলে উৎপাটিত করার ব্যাপারে ইরানী জনগণের অমিত সাহস সোভিয়েত ও তার বলয়ভুক্ত পূর্ব-ইউরোপীয় দেশসমূহের জনগণকে কমিউনিস্ট শাসনের লৌহকপাট ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত করেছে।

ইতিহাসে ইসলামের বিপ্লবী ভূমিকার কথা সবাই কমবেশী জানেন এবং স্বীকারও করেন। কিন্তু সেটা অতীতের কাহিনী হিসাবে উল্লেখ করা হয়। সপ্তম শতকের সেই তীক্ষ্ণধার তরবারী যে মরিচা পড়ে বিংশ শতাব্দীতেও ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়নি, সেটা সার্থকভাবে প্রমাণ করেছেন ইরানের ধর্মীয় নেতা ইমাম খোমেনী (রঃ)। বিশ্বের দুই বিশাল পরাশক্তি-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুগপতভাবে লড়াই করে ইসলামী বিপ্লবকে সফল করার ক্ষেত্রে ইমাম খোমেনীর কৃতিত্ব অতুলনীয়। অনেকে ধারণা করতেন যে, ইরানের শক্তিশালী রাজতন্ত্রের পতন ঘটলে সেখানে হয় কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসবে নতুবা উদারপন্থী গণতন্ত্রীরা ক্ষমতায় যাবে। ইরানের ধর্মীয় নেতারা সেখানে একটা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে সক্ষম হবেন, এমন ধারণা অনেকেই করতে পারেননি। এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন ইমাম খোমেনী (রঃ) ও তাঁর অনুসারীরা।

এই দুরূহ কাজটি ইমাম খোমেনী (রঃ) কিভাবে সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করলেন সেটা গভীর অভিনিবেশ সহকারে মূল্যায়নের দাবী রাখে। সবাই এটা জানেন যে, মুসলিম বিশ্বে ইরানের একটা স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। সেখানকার গরিষ্ঠ জনগণ শিয়া আকিদার অনুসারী। আর এই শিয়া আকিদামতে মুসলমানদের ইমাম বর্তমানে গায়েব বা অদৃশ্য হয়ে আছেন। সেই সঙ্গে এও বিশ্বাস করা হয় যে, কোন এক শুভ মুহূর্তে তিনি আবির্ভূত হয়ে বিশ্বে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করবেন এবং সমস্ত অন্যায়-অবিচারের অবসান ঘটাবেন। এমনি এক পরিত্রাতার আশায় বুক বেঁধে তারা

লেখক ঃ কলামিস্ট, সাংবাদিক, সম্পাদক সাপ্তাহিক রোববার

জনসেবকগণ দেশের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করুন। আর সবাই ইসলামের গৌরবময় পতাকাতলে সমবেত হয়ে ইসলাম ও বিশ্বের বঞ্চিত জনগণের দুশমনদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং এক একটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যপানে এগিয়ে যান .... আল্লাহ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সে দিবসের প্রতীক্ষায় রইলাম।''[১০]

তথ্যসূত্র

১। আজিজুল হক বান্না, ''প্রকৃত ইসলামের উপস্থাপক ও জাতিসমূহের উত্থানে ইমাম খোমেনীর (রহঃ) ভূমিকা ''ইমাম খোমেনী (রহঃ) এর চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, ঢাকা, ৬ জুন, ১৯৯৩ ইং।

২। "NAM Declaration", The Daily Star, Dhaka, September 5 and 1992; সেলিম ওমরাও খান, 'দশম নির্জোট সম্মেলন সমাপ্তঃ ন্যায়বিচার ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা চাই', সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ ইং।

৩। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন লেখকের, 'দশম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের দাবী ও ন্যায়বিচার ভিত্তিক নয়া বিশ্বব্যবস্থা, পাক্ষিক পালাবদল, ২য় বর্ষ ১৪শ' সংখ্যা ১৬-৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৩ ইং।

৪। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন আবু আব্দুল্লাহ, 'পরনির্ভর উন্নয়ন ও পরিধি থেকে কেন্দ্রে উদ্ভূত পাচারঃ একটি উদ্ভাবনীমূলক টীকা', বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ৫ম খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা ১৩৯৪।

৫। Doh Joon-Chien, Eastern Intellectuals and Western Solutions : Follower Syndrom in Asia (New Deeli : Vikan Publishing House, Pvt. Ltd. 1980)-Table 4, P-26

৬। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন লেখকের, Social Justice in Bangladesh : An Islamic Perspective (Chittagong : Liberty Forum, 1991)

৭। ইমাম খোমেনীর অসিয়তনামা, আলোর স্মারক, ইমাম খোমেনী (রহঃ)-এর প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ৩ জুন, ১৯৯০ ইংরেজী, পৃঃ ১৫০।

৮। Cultural Centre of the Islamic Republic of Iran, Achievement of the Islamic Revolution in Iran, Dhaka, 1985

৯। -ঐ-, পৃঃ

১০। ইমাম খোমেনীর অসিয়তনামা, ঐ-পৃঃ ১৫২।

দাখিল হও। কিন্তু পাশ্চাত্য তাবেদার মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ ধর্মকে মসজিদের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে আগ্রহী এবং বৃহত্তর সমাজ জীবনে ধর্মের শিক্ষা ও অনুশাসনকে প্রাধান্য দিতে অনিচ্ছুক। এটা মূলতঃ ইসলাম সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতারই বহিঃপ্রকাশ। ইসলাম পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের ন্যায় নিছক বিশ্বাস ও বিশ্বাস নির্ভর আচার-অনুষ্ঠান নয়। ইসলামে রয়েছে রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন ইত্যাদি সমাজ জীবনের যাবতীয় সমস্যাবলী সমাধানের ইঙ্গিত। ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, রসূল (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের পর ইসলামী হুকুমাত কায়েম করে ইরান সে কথাটিই মূলতঃ আবার নতুন করে প্রমাণ করেছে। যারা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের অনুশাসন মানতে নারাজ, তাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা মায়িদার ৪৪, ৪৫ ও ৪৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেনঃ "আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না তাহারাই কাফিরুন' (সত্য প্রত্যাখ্যানকারী) .... তাহারাই 'যা'লিমুন' (সীমালংঘনকারী) এবং তাহারাই 'ফাসিকুন' (সত্য ত্যাগকারী)' (সূরা মায়িদা, ৫ঃ৪৪, ৪৫, ৪৬)। আর কাফির', 'যালিম' ও 'ফাসিক'দের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবে বার বার সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এসকল সাবধানবাণী সত্ত্বেও যারা কুরআনে বর্ণিত ফাসিক-যালিমদের অনুসরণে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধানকে অস্বীকার করে শুধু নামাজ-রোজা-জিকির বা খন্ডিতভাবে অনুসরণ করবে, তাদের পরিণতি সম্পর্কে সূরা বাকারার ৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করছেনঃ তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে" (সূরা বাকারা, ২ঃ৮৫)।

তাই পাশ্চাত্য শোষণ ও তাদের মুষ্টিমেয় দেশীয় এজেন্টদের নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য বিশ্বের নির্যাতিত জনগণের প্রতি সকল প্রকারের জুলুম-নির্যাতনকে উপেক্ষা করে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদী হবার জন্য ইমাম খোমেনী উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। তিনি তাঁর সংগ্রামী জীবনের ক্রান্তিলগ্নে বিশ্বের মজলুম জনগণের জন্য রেখে যাওয়া তাঁর 'অসিয়তনামা'র শেষে লিখেছেন ঃ

"হে বিশ্বের নির্যাতিত জনগণ! হে মুসলিম দেশসমূহ!! হে বিশ্বের মুসলমান !!! উঠে দাঁড়ান, সত্যকে দৃঢ়ভাবে আকঁড়ে ধরুন এবং পরাশক্তি ও তাদের পদলেহী দালালদের প্রচারণামূলক হৈ চৈ-এ ভীতসন্ত্রস্ত হবেন না। অপরাধী শাসকগোষ্ঠী আপনাদের কষ্টার্জিত সম্পদকে আপনাদের ও ইসলামের দুশমনদের হাতে তুলে দেয়ার কারণে তাদেরকে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করুন। আপনারা নিজেরা এবং নিষ্ঠাবান

অপরাপর অংশের মুসলমানগণ যাতে ইরানী বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ নিজ দেশে ইসলামী শাসন কায়েমের মাধ্যমে স্বাধীন ও স্বনির্ভর হয়ে উঠতে না পারে সেজন্য পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ একটি বিশেষ কূটকৌশল গ্রহণ করে। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী পুনর্জাগরণকে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে ইদানীং তারা তাদের শক্তিশালী প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে 'ইসলামী মৌলবাদ' ও 'ইসলামী সন্ত্রাসবাদ' নামে দু'টি কাল্পনিক ধারণায় ব্যাপক প্রচার শুরু করেছে। ১৫ জুন, ১৯৯২ ইংরেজী তারিখে প্রকাশিত Time International এর প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে লিখেছে 'চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে পৃথিবীর তিনটি মহাদেশ জুড়ে যেভাবে ইসলামের বিস্ফোরণ ঘটেছিল, আজ মনে হয় একই গতিতে এর চাইতেও বেশী অংশজুড়ে ইসলামের পুনর্জাগরণ ঘটছে যা পাশ্চাত্য নীতি-নির্ধারকদের জন্য গভীর উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে'' (পৃঃ ২০)। এ ছাড়াও মুসলিম দেশগুলোতে সম্ভাব্য ইসলামী আন্দোলনকারীদের দমন করার জন্য তারা তাদের তাবেদার দেশগুলোকে 'মৌলবাদ' ও 'সন্ত্রাসবাদের' বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু সকল প্রকারের অপপ্রচার, চাপ ও নির্যাতনকে উপেক্ষা করে ইরানী বিপ্লবের সাফল্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আজ আলজেরিয়া, সুদান, মিশর, জর্ডান, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও মরক্কোসহ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ইসলামী পুনর্জাগরণের ঢেউ বইতে শুরু করেছে। মৌলবাদ বিরোধী প্রচারণার জবাবে প্রত্যয়ী মুসলমানদের বক্তব্য হচ্ছে, ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত-এই পাঁচটি মৌল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে ইসলাম মৌলবাদী ধর্ম। যারা ইসলামের মৌল ভিত্তি মানে না, তারা মুসলিম হতে পারে না। আর সন্ত্রাসবাদের কোন সর্বসম্মত সংজ্ঞা নেই। অত্যাচার-জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা কোরআনের নির্দেশ (সূরা নিসাঃ ৪ঃ৭৫)। রসূল (সঃ) ও যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখে, হাতে ও অন্তরের ঘৃণা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিবাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন (মুসলিম, ইবনে মাযা)। তাই প্রাচ্যের ব্যাপারে পাশ্চাত্যের দ্বিমুখী নীতি ও বিশ্বব্যাপী মুসলিম নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হলে যদি জালিমদের দ্বারা সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত হতে হয়, তাতে খাঁটি ইসলামের অনুসারীরা সবাই সন্ত্রাসবাদ। এতে হীনমন্যতার কোন স্থান নেই।

পাশ্চাত্য নেতৃবৃন্দ ও তাদের দেশীয় তাবেদারের সাম্প্রতিক অপর একটি জোর প্রচার হচ্ছে, ধর্ম ও রাজনীতি দু'টি পৃথক বিষয়। ধর্ম সীমাবদ্ধ থাকবে আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে, রাজনীতির অপবিত্র অঙ্গনে পবিত্র ধর্ম অবাঞ্ছিত। কিন্তু পবিত্র কুরআনে ইসলামকে মুসলমানদের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে (সূরা মায়িদা, ৫ঃ৮)। রাসূল (সঃ) ও ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনার মাধ্যমে মুসলমানদের জন্য করণীয় 'অনুপম আদর্শ' (উসূউয়াতুন হাসানা) হয়ে আছেন। আল্লাহ বলেনঃ ''উদখুলু ফিছ ছিলমে কা'ফফা'' অর্থাৎ তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে

শক্তিগুলোর চক্রান্ত হলো স্বদেশী সংস্কৃতি ও স্বীয় মূল্যবোধ থেকে যুবকদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। পাশ্চাত্য বা প্রাচ্যের প্রতি প্রলুব্ধ করা, আর এ ধরনের মতাদর্শে শিক্ষিত ব্যক্তিদের থেকেই সরকারী প্রশাসকদের মনোনীত করা। দেশেই ভাগ্য নির্ধারণের কাজে তাদেরকে ক্ষমতা প্রদান করা, যাতে তাঁরা বিদেশী শক্তিগুলোর হাতের পুতুল হিসাবে কাজ করতে পারে। আর এই শিক্ষিত সমাজ যেন এমনভাবে দেশ পরিচালনা করে যাতে বিদেশীদের শোষণ ও লুণ্ঠনের পথ সুগম থাকে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি প্রবণতা বজায় থাকে। ..... এটা হচ্ছে ঔপনিবেশিক প্রভাবিত দেশগুলোকে পাশ্চাত্যমুখী করে রেখে তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চক্রান্ত।''[৭]

ইমাম খোমেনীর উপরোক্ত সংস্কার কর্মসূচীর ফলে ইসলামী বিপ্লবের পঞ্চম বর্ষেই ইরান খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং শাহের আমলের সকল বিদেশী ঋণ পরিশোধ করে পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে বলে দাবী করেছে।[৮] বিপ্লবোত্তর ইরানের সংস্কার ও পুনর্গঠন কর্মসূচীর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ। পবিত্র কুরআনের এক অষ্টমাংশ বা ৭৫০টি আয়াত জুড়ে মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু আল্লাহকে চেনার এবং পার্থিব কল্যাণ অর্জনের জন্য বার বার বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ 'ওয়ামান য়ুতিয়াল হিক্‌মা ফাক্বাদ উতিয়া খাইরান কাছি'রা' অর্থাৎ যাদের কাছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান আছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রভূত্ব কল্যাণ দান করেছেন (সূরা বাকারা, ১ ২৬৯)। বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর গুরুত্ব আরোপের ফলে মুসলিম বিশ্বের মধ্যে একমাত্র ইরানই আজ নিজস্ব প্রকৌশলীদের সাহায্যে তৈলকূপ থেকে তৈল উত্তোলনে সক্ষমতা অর্জন করেছে এবং তাও অন্যান্য দেশের তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ কম মূল্যে।[৯] এভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনের পর ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামী ইরান স্বাধীন ও স্বনির্ভরতার পথে পরিচালিত হয়ে পৃথিবীর অপরাপর অংশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় পাশ্চাত্য প্রভুত্ব মুক্তির পথিকৃত হয়ে উঠেছে।

পাশ্চাত্য অপপ্রচার ও ইমাম খোমেনীর অসিয়তনামা

বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার ঔপনিবেশিক শোষণ কাঠামো থেকে ইরানের মুক্তি প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ তাদের ব্যাংকে রক্ষিত ইরানের সম্পত্তি আটক, ইরাককে দিয়ে আগ্রাসী হামলা এবং সর্বশেষ, গোপন সামরিক মিশন পরিচালনা করে। কিন্তু সকল ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে ইরান একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে সদর্পে এগিয়ে চলেছে সম্মুখপানে। তাই মুসলিম বিশ্বের

মাধ্যমে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত জাতীয়তাবাদী নেতাদের ক্ষমতাচ্যুত বা হত্যার বিনিময়ে হলেও।

শোষণ মুক্তির উপায় কি?

অতএব, গবেষকদের মতে, বিশ্বের উন্নয়নকামী দেশগুলোর জন্য শোষণমুক্তি, স্বাধীনতা ও স্বনির্ভর উন্নয়নের একমাত্র উপায় হচ্ছে, বিপ্লবের মাধ্যমে বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার এই নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ কাঠামো বা পাশ্চাত্য প্রভুত্বের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীন ও স্বনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। গবেষকগণ যখন এ জাতীয় সুপারিশ প্রণয়ন করেছিলেন, তখন সারা বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে একমাত্র বিকল্প হিসাবে সমাজতান্ত্রিক আবহ প্রবাহিত ছিল। তাই তারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতিই মূলতঃ ইঙ্গিত করেছিলেন। কিন্তু এর এক দশকের মধ্যে গবেষকদের সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে এবং পুরা পুঁজিবাদী বিশ্বকে বিস্মিত করে ইরানের বুকে ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে সংগঠিত হল জগৎ কাঁপানো এক ইসলামী বিপ্লব।

ইসলামী বিপ্লবের সংস্কার কর্মসূচী

ইরানে সফল ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে খোমেনী (রঃ) সেই তিনটি বিশেষ ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করেছেন যেগুলো আজ মুসলিম তথা তৃতীয় বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের হতাশাপূর্ণ জীবন ও যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী। বিষয়গুলো হচ্ছেঃ ১) বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় একচেটিয়া পাশ্চাত্য প্রভুত্ব ও তৃতীয় বিশ্বের ব্যাপারে তাদের দ্বিমুখী নীতি , ২) দেশগুলোতে পাশ্চাত্য প্রভুত্ব নির্ভর এলিটদের শাসন এবং ৩) পাশ্চাত্যমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা। বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ইমাম খোমেনী (রহঃ) ইরানের উপর পাশ্চাত্য প্রভুত্বের বদলে সার্বভৌম আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম/প্রতিষ্ঠা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ ব্যাপক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কার সাধনের মাধ্যমে পাশ্চাত্য গোলামীমুখী শাসক এলিটদের স্থলে একদল খোদাভীরু, দেশমুখী ও ইসলামের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল এলিটদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তৃতীয়তঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সাথে ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় সাধন করেছেন। বিপ্লবের পর ঔপনিবেশবাদ ও নব্য ঔপনিবেশবাদ প্রভাবিত শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের আহবান জানিয়ে ইমাম খোমেনী (রহঃ) কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেনঃ

"পাশ্চাত্য শক্তিগুলোর চক্রান্তসমূহের মধ্যে একটা হলো শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্রগুলোর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়ন্ত্রণভার নিজেদের হাতে তুলে নেয়া ..... সেগুলো আসলে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র তরণীর কর্ণধার তৈরীর জন্য জনগণকে গড়ে তোলার কেন্দ্র বিশেষ ..... কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিদেশী

করতে হবে। এ জাতীয় উন্নয়নের মূল কথা হচ্ছে, মাথাপিছু আয় বা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেলেই উন্নয়ন ঘটেছে বলে ধরে নিতে হবে। উৎপাদন বা প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির সাথে বিতরণমূলক 'ন্যায়বিচার' (আদ্‌ল) ও 'কল্যাণ' (এহসান) নিশ্চিত করার ব্যাপারে ইসলামের সুমহান তাগিদ (সূরা নাহল ১৬ঃ১০) এখানে উপেক্ষিত।

পাশ্চাত্য পন্ডিতদের এই উন্নয়ন দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তৃতীয় বিশ্বের কিছু কিছু দেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য লাভ করলেও বিতরণমূলক ন্যায়বিচারকে উপেক্ষা করার কারণে সে সব দেশে সমুদয় সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে মুষ্টিমেয় পরিবারের হাতে এবং ধনী ও গরীবের ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে আশংকাজনকভাবে।[৫] ফলে দেশসমূহে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সামাজিক অসন্তোষ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা। এভাবে দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় ধনীদের হাতে কুক্ষিগত হবার বিরুদ্ধে ইসলাম হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছে বহু পূর্বে (সূরা হাশরঃ ৭)। এ ছাড়াও দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ধনী ও গরীবের মধ্যকার ব্যবধান দূরীকরণের লক্ষ্যে সম্পদ পুনঃবন্টনেরও বিধান রয়েছে ইসলামে (সূরা জারিয়াতঃ ১৯)।৬

বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় পাশ্চাত্য প্রভুত্ব পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে উন্নয়নশীল দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যসূচী এমনভাবে ঢেলে সাজানো হয়েছে যে যার মাধ্যমে পাশ্চাত্য ধাঁচের উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলে সৃষ্ট ধনিক গোষ্ঠীর সহযোগী হিসাবে এক ধরনের দেশবিমুখ ও পাশ্চাত্য নির্ভরমুখী মুৎসুদ্দি (Comprador Class) শ্রেণী তৈরী করা যায়, যারা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক এলিট হিসাবে নিজ নিজ দেশকে পাশ্চাত্য গোলামী ও শোষণ নির্ভর করে গড়ে তোলার ব্যাপারে সদা সচেষ্ট থাকবে। একজন প্রাচ্য দেশীয় বুদ্ধিজীবী Dr. Doh Joon-Chien তাঁর সাড়া জাগানো "Eastern Intellectuals and Western Solutions : Follower Syndrom in Asia, 1985 গ্রন্থে এ সকল পাশ্চাত্যমুখী দেশীয় এলিটদের সম্পর্কে লিখেছেন যে, তাঁরা বিদেশ সম্পর্কে যত জানেন, নিজ দেশ সম্পর্কে ততটা অবহিত নন। তারা নিজ দেশের সমস্যার ব্যাপারে দেশীয় সমাধান না খুঁজে সব সময় পাশ্চাত্য সমাধানের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। এ অবস্থাকে লেখক বুদ্ধিবৃত্তিক উপনিবেশন (Intellectual Colonization) বলে অভিহিত করেছেন।

এভাবে পাশ্চাত্য দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলে সৃষ্ট নব্য ধনিক গোষ্ঠী ও তাদের সহযোগী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক এলিট শ্রেণী সমষ্টিগতভাবে দেশকে পাশ্চাত্য শোষণ ও গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে ফেলে। এ ছাড়াও বিভিন্ন দেশে সামন্ত রাজা, স্বৈরাচারী শাসক ও সামরিক একনায়কদের দীর্ঘদিন ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয় পাশ্চাত্য স্বার্থের প্রয়োজনে। এমন কি, ষড়যন্ত্রের

জাতি। স্বদেশে এবং বিদেশে মুসলিম নিধনের এমন এক বিপদজনক পরিস্থিতিতে বিশ্বের নির্যাতিত মুসলমানগণ গভীর শ্রদ্ধা ও আশান্বিত হৃদয়ে স্মরণ করছে মুসলিম বিশ্বের নির্যাতিত জনতার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ইমাম খোমেনী (রঃ)কে। দলে দলে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি। আলোচনায় মিলিত হচ্ছে তাঁর সংগ্রামী জীবন ও কর্ম থেকে মুক্তির পথ নির্দেশিকা লাভের আশায়। ইমাম খোমেনীর বিপ্লবী দর্শন ও বিপ্লবোত্তর ইরানের সাফল্য সম্পর্কে অনুধাবন করতে হলে 'বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থা' সম্পর্কে কিছুটা ধারণা প্রদান প্রয়োজন।

বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার ঔপনিবেশিক স্বরূপ

ষাটের দশকের শেষের দিকে পরিচালিত এক ব্যাপক গবেষণাকর্মে পল ব্যারণ (১৯৮৬), আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাংক (১৯৬৭), সমীর আমীন (১৯৭৭) ও আগিরি এমানুয়েল (১৯৭২) প্রমুখ গবেষকগণ দেখিয়েছেন যে 'বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থা' হচ্ছে একটি ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা।৪ এতে পাশ্চাত্য শিল্পোন্নত দেশগুলোর সাথে প্রাচ্যের বা উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো একটি নয়া ঔপনিবেশিক শোষণমূলক সম্পর্ক কাঠামোতে আবদ্ধ। এই প্রক্রিয়ার প্রধান তিনটি পারস্পরিক সহায়ক উপাদান হচ্ছে ঃ ১) বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার উপর পাশ্চাত্য শিল্পোন্নত দেশসমূহের একচেটিয়া প্রভুত্ব; ২) দরিদ্র দেশসমূহের পশ্চিমা প্রভুত্ব নির্ভর শাসক এলিট (Ruling elite) শ্রেণী। এবং ৩) পাশ্চাত্যমুখী এলিট তৈরীর প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ।

গবেষকগণ বিষয়টিকে বুঝাবার জন্য কেন্দ্র প্রান্ত (Centre-Periphery) বা Metropolitan-Satellite) সম্পর্ক নামক একটি তাত্ত্বিক কাঠামো উপস্থাপন করেছেন। উত্তরের শিল্পোন্নত দেশগুলো হচ্ছে Metropolitan কেন্দ্র। তারা উন্নয়নশীল দেশসমূহে আন্তর্জাতিক পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে, বিশ্ব বাণিজ্যে 'অসম বিনিময়' এবং বিভিন্ন শর্তাবলী আরোপের মাধ্যমে সেসব দেশকে Satellite এ পরিণত করে অব্যাহতভাবে তাদের সম্পদ শোষণ করে উন্নতি লাভ করছে। অপরদিকে, এ জাতীয় শোষণ প্রক্রিয়ায় আটকা পড়ে ক্রমাগতভাবে নিঃস্ব ও দরিদ্র হচ্ছে প্রান্তে অবস্থিত উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো।

অপরদিকে, এই শোষণমুক্ত নব্য ঔপনিবেশিক বিশ্ব ব্যবস্থার সহযোগী দর্শন হিসাবে পাশ্চাত্য পন্ডিত ও তাদের অনুকরণকারী দেশীয় বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে 'আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন (Modernization and Development) দর্শন যার মূলকথা হচ্ছে, উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো যদি উন্নতি লাভ করতে চায়, তাহলে তাদেরকে নিজ দেশে পুঁজি গঠন বা প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ নয়, বরং পাশ্চাত্য পুঁজি ও প্রযুক্তি নির্ভর এক ধরনের উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ

বর্তমান বিশ্বের ১০০ কোটি মুসলমানদের সামনে হাজার হাজার মুসলিম বালিকা ও রমনীকে জোরপূর্বক 'ধর্ষণ ক্যাম্পে' আবদ্ধ করে তাদের উপর গর্ভবতী না হওয়া পর্যন্ত অথবা আমৃত্যু অমুসলিমদের দ্বারা গণধর্ষণের চালান হচ্ছে; মুসলমানদের সবচাইতে পবিত্রস্থান মসজিদসমূহকে 'বুলডোজার' দিয়ে গুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ অসহায় নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে, শুধু মুসলমান হবার অপরাধে। কিন্তু মুসলিম উম্মা এসকল নিরপরাধ নির্যাতিত মুসলমানদের রক্ষার জন্য কার্যকর কিছুই করতে পারছে না। মুসলমানদের পরিচয় যে কুরআনের অনুসারী হিসাবে, সেই কুরআনে প্রভু আল্লাহ ভৎর্সনা করে বলছেনঃ 'কি হয়েছে তোমাদের, তোমরা জেহাদ করবে না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য? যারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের প্রতিপালক। এ জনপদ যার অধিবাসী জালিম, হতে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও, তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের সহায় কর'' (সূরা নিসা, ৪ঃ ৭৫)।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও নির্যাতিতদের পক্ষ হয়ে জালিমদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়ে মুসলমানরা জেহাদ করছে না কেন? মুসলমানদের জেহাদী শক্তি কি নিঃশেষ হয়ে গেল? এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে, বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার ঔপনিবেশিক কাঠামোতে আবদ্ধ মুসলিম জাতিসমূহের নেতৃবৃন্দের পাশ্চাত্য প্রভুত্ব নির্ভরশীলতা।

বিশ্বব্যাপী মুসলিম উচ্ছেদের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র

ইসলামের সুমহান আদর্শ হচ্ছে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান (Peaceful co-existance)। ইসলামের নবী হযরত (সঃ) 'মদীনা সনদের' (Charter of Medina) মাধ্যমে সপ্তম শতাব্দীতে মদীনায় বসবাসকারী ইহুদী, খ্রীষ্টান, পৌত্তলিক ও মুসলমানদের নিয়ে বহুজাতি ভিত্তিক 'উম্মা' গঠনের মাধ্যমে সবার জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সমান নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে বিশ্ববাসীর জন্য সাংবিধানিক সরকার ও ন্যায়বিচার ভিত্তিক শাসনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন। মুসলমানরা দাবী করে যে তারা 'মিল্লাতে ইব্রাহীম' অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর বংশধর হিসাবে ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলিম ভাই ভাই। কিন্তু 'বিশ্ব চার্চ কাউন্সিলের' এক গোপন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, স্পেন থেকে মুসলিম বিতাড়নের ৫০০ বৎসর উদযাপন উপলক্ষে নব্বইয়ের দশকের শুরুতে ইউরোপে মুসলিম নিধন শুরু হয়েছে খ্রীষ্টানদের হাতে এবং একই সাথে, বিশ্বব্যাপী ইসলামী উত্থাপনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে সুদূর বার্মায় মুসলিম নিধন শুরু হয়েছে বৌদ্ধদের হাতে এবং ভারতে মুসলিম নিধন জোরদার হয়েছে হিন্দুদের হাতে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় মুসলিমরা হচ্ছে সবচাইতে লাঞ্ছিত

ব্যবস্থায় পিরামিডের শীর্ষে অবস্থানকারী পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ কর্তৃক প্রবর্তিত 'গণতন্ত্র', 'স্বাধীনতা' ও 'মানবাধিকারের' ধারণা সার্বজনীন নয়। গণভোটের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ও জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত স্বাধীন প্রজাতন্ত্র 'বসনিয়া–হার্জেগোভিনায় 'বর্ণ নিধন' (Ethnic cleansing) অভিযানের নামে আগ্রাসী সার্বীয়ান বাহিনী কর্তৃক নির্বিচারে বেসামরিক মুসলিম নারী–পুরুষ ও শিশুদের হত্যা প্রতিরোধের ব্যাপারে শক্তিপ্রয়োগে এরা অনাগ্রহী। উপরন্তু, জাতিসংঘের মাধ্যমে 'অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা' আরোপের মাধ্যমে আইনগতভাবে সংগঠিত বসনীয় সরকারকে আত্মরক্ষা বা নিজ দেশের সার্বভৌমত্ব ও জনগণকে রক্ষার অধিকার থেকেও বঞ্চিত করে রেখেছে। তারা জাতিসংঘের প্রস্তাব কার্যকর করার নামে ইরাক ও সোমালিয়ার উপর সামরিক হামলা পরিচালনা করেছে, অথচ কাশ্মীরে গণভোট অনুষ্ঠান বা দখলীকৃত আরব এলাকাসমূহ মুক্ত করার ব্যাপারে জাতিসংঘের প্রস্তাবাবলী অমান্য করার কারণে ভারত ও ইসরাইলের বিরুদ্ধে কিছুই করছে না। তারা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে জয়লাভের পর বার্মার লীগ ডেমোক্রেসির নেত্রী অংসান সুকী'কে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করেছে, কিন্তু আলজেরিয়ায় অনুরূপ নির্বাচনে বিজয়ী Islamic Salvation Front কে ক্ষমতা না দিয়ে বরং এর নেতা ডক্টর মাদানী'কে কারাবন্দী করে গণতন্ত্রকে নিরাপদ করা হয়েছে বলে সন্তোষ প্রকাশ করছে। তারা বিশ্ব ব্যবস্থায় সমানাধিকারের কথা বললেও ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে জাতিসংঘের সিদ্ধান্তসমূহকে নিজেদের স্বার্থেই ব্যবহার করছে। সুতরাং তাদের সংজ্ঞায়িত গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পক্ষপাতদুষ্ট এবং তা শুধু তাদেরই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য স্বার্থ সংরক্ষণ করছে। আর সুযোগ করে দিচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের উপর তাদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ও শোষণকে দীর্ঘায়িত করার। অতএব, এসকল দ্বিমুখী নীতির কারণে বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় উত্তরের শিল্পোন্নত দেশগুলোর একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

খ) বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় মুসলিম নির্যাতন ও ওআইসি'র অকার্যকারিতা ঃ

বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার অপর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বিশ্বজুড়ে অমুসলিমদের হাতে মুসলিম নির্যাতন। এর প্রতিকারে জাতিসংঘ এবং মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ বিশেষতঃ ৫২টি মুসলিম রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত OIC (Organization of Islamic Conference) এর ভূমিকা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য হচ্ছে, অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে আরব সাগরের বুকে শ্রীলংকাগামী জাহাজে কতিপয় মুসলিম রমণী সিন্ধু এলাকায় জলদস্যুদের হাতে নির্যাতিত হবার প্রতিকার হিসাবে মুসলিম বাহিনী সিন্দুর অযোগ্য শাসককে অপসারিত করে ভারতীয় উপমহাদেশে ৬০০ বৎসরব্যাপী মুসলিম শাসনের শুভ সূচনা করেছিল। কিন্তু আজ

বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার ঔপনিবেশিক স্বরূপ ও ইমাম খোমেনী'র (রহঃ) চিন্তাধারা

অধ্যাপক আবদুন নূর

বিশ্বব্যাপী শান্তি ও মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে 'বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায়' নেতৃত্ব প্রদানকারী পাশ্চাত্য শিল্পোন্নত দেশসমূহ বিশেষতঃ জাতিসংঘের দ্বিমুখী নীতি এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অমুসলিমদের হাতে মুসলিম নির্যাতনরোধে মুসলিম বিশ্ব বিশেষতঃ ওআইসি'র অকার্যকারিতা আজ তৃতীয় বিশ্বের প্রায় চারশত কোটি নির্যাতিত মানুষের মর্মপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে, বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদের সংকট ও সমাজতন্ত্রের আকস্মিক পতন জাতিসমূহকে অনেকটা দিক নির্দেশনাবিহীন করে তুলেছে। এমনি এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে "Neither east nor West, Islam is the best" শ্লোগানের মাধ্যমে সম্প্রতি উদযাপিত হল শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান, নিপীড়িত মানুষের মুক্তির দিশারী, ইরান তথা মুসলিম বিশ্বের বিপ্লবী নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লা খোমেনী'র (রহঃ) মৃত্যুবার্ষিকী। আলোচ্য প্রবন্ধে বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার ঔপনিবেশিক স্বরূপ বিশ্লেষণপূর্বক এর থেকে জাতিসমূহের মুক্তির লক্ষ্যে ইমাম খোমেনীর বিপ্লবী দর্শন তুলে ধরার প্রচেষ্টা থাকবে।

বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থাপকদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ

বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থাপকদের বিরুদ্ধে নব্বইয়ের দশকে আনুষ্ঠানিক ক্ষোভ ও প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (১-৬) ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জার্কাতায় অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের (সংক্ষেপে NAM বা Non-Aligned Movement) দশম শীর্ষ সম্মেলনে।[২] সম্মেলন শেষে প্রকাশিত ইশতেহারে বর্তমান বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'ন্যায়বিচার' নিশ্চিত করার মাধ্যমে এক নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা (New World Order) গড়ে তোলার ব্যাপারে উদাত্ত আহবান জানানো হয়েছে।৩

ক) পাশ্চাত্য নেতৃবৃন্দের দ্বিমুখীনীতি ঃ

তৃতীয় বিশ্বের জনগণ গভীর বিস্ময় ও বেদনার সাথে লক্ষ্য করছে যে বর্তমান বিশ্ব

লেখক ঃ প্রাবন্ধিক, প্রফেসর, লোক প্রশাসন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বাছাই, সরকার গঠন, ক্ষমতার হাতবদল ইত্যাদি প্রক্রিয়ার অনুশীলনও হয়েছে একাধিকবার এবং তদমাধ্যমে ইরানের ইসলামী সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রাণশক্তি ও গতিশীলতা সম্পর্কে আঁচ করা যায়। প্রতি চার বছর অন্তর সেখানে সর্বক্ষেত্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্ন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এটাই প্রমাণ হয়েছে যে, নেতা বাছাই এর প্রক্রিয়া জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে এবং জনগণ বিদ্যমান প্রক্রিয়ায় খুশী।

এভাবে আমরা যদি সারা দুনিয়ার চলমান ঘটনা প্রবাহ এবং সাম্প্রতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে অকুণ্ঠচিত্তে এ সত্যই স্বতঃ উচ্চারিত হবে যে, ইমাম খোমেনীই নতুন যুগে ইসলামের প্রথম সার্থক রূপকার।

ইমাম খোমেনী সেই সার্থক মহানায়ক যিনি ইসলামী চেতনার সুপ্ত আগ্নেয়গিরিতে নতুন করে বিস্ফোরণের ডংকা বাজিয়েছেন। বিসুভিয়াসের লাভামুখ আবিষ্কার করেছেন। আবদ্ধতার সংকট মোচন করেছেন তিনি। এখন এটা আর ধারণাজাত বিষয় নয় যে, ইসলামকে ভিত্তি করেও অধুনা বিশ্বে সরকার পদ্ধতি ও রাজনৈতিক কাঠামো দাঁড়াতে পারে। বরং দুনিয়ার বিভিন্ন জনপদে ইসলাম আজ একমাত্র আলোড়ন। ইসলামই হচ্ছে গণ আকাংখার কেন্দ্রবিন্দু। ইসলামই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের চোখে আগামী উত্থানের প্রথম শক্তি। আর তাই তারা দুনিয়ার কোথাও ইসলামের দুর্বলতম অস্তিত্বকেও সহ্য করতে চাচ্ছে না। সর্বব্যাপী আগ্রাসন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

সমসাময়িক অপরাপর ইসলামী নেতৃত্বের সাথে ইমাম খোমেনীর মৌলিক পার্থক্য থেকেই অনুধাবন করতে হবে সমকালীন বিশ্বে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠায় ইমামের সাফল্যের নিয়ামকসমূহকে। ইমাম আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফূরণ ঘটিয়েছেন গণনেতৃত্বের সাথে। গণমানুষকে সম্পৃক্ত করেছেন আন্দোলনে। ইসলামের মৌলিক নীতির প্রশ্নে সর্বদা থেকেছেন পাহাড়সম অবিচল। আধুনিক মনন ও যুগের চাহিদাকে অধ্যয়ন করেছেন গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। এসব গুণাবলীই তাকে বেপরোয়া সাহস যুগিয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁকে করেছে অবিচলিত।সমকালীন মুসলিম বিশ্বে মিশর, পাকিস্তান, আলজেরিয়া, তুরস্ক, সৌদী আরব, মালয়েশিয়া প্রভৃতি বহু দেশে ইসলামী আন্দোলন সক্রিয় রয়েছে। আন্দোলনের শক্তি বিজয়ের কাছাকাছি পৌছেও নানান সীমাবদ্ধতায় ব্যর্থতা বরণ করে নিয়েছে। ইসলামী সরকার রূপায়নের জিয়নকাঠিটি খুঁজে পায়নি। কিন্তু ইমাম খোমেনী মহান আল্লাহর অপার করুণায় ইরানে ইসলামী সরকার কায়েমের গৌরব নিয়ে মহাকালের বুকে এক অক্ষয়কীর্তির স্মারক হিসেবে বেঁচে আছেন। এভাবে তিনি নিজেই কেবলমাত্র নিজের তুলনা হয়ে ইতিহাসে স্বীয় আসন করে নিয়েছেন।

হয়। পরবর্তীতে তদনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা সংশোধন করা হয়। অর্থনীতি আর পরিকল্পনা সম্পর্কে সীমিত ধারণা রেখেও মূলনীতি নির্ধারণে যে প্রজ্ঞার স্বাক্ষর তিনি রাখেন তা বিস্ময়কর।

দ্বিতীয় ঘটনাটি আরও চমকপ্রদ। ইসলামী ইরানে মুদ্রা ছাপানো হল। ইমামকে দেখানো হলে। ইমাম দেখতে পেলেন যে তাতে বাঘের জলছাপ রয়েছে। তিনি এটাকে সরিয়ে ফেলতে নির্দেশ দিলেন কেননা এটা ছিল পারস্য জাতীয়তাবোধের অহংতাড়িত ঐতিহ্যের স্মারক।

ইমামের সূক্ষ্মদৃষ্টির আরও পরিচয় মেলে এভাবে যে, বিপ্লবের উন্মাদনার অবকাশে বিস্তার লাভ করা ব্যক্তিকেন্দ্রিক বাড়াবাড়িগুলোকে নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাসময়ে ইমাম সকল মসজিদ থেকে তাঁর ছবি সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। ইমামের মৃত্যুর পর বিশেষজ্ঞ পরিষদ–মজলিসে খুবরেগান ইমাম আলী খামেনেয়ীকে রাহ্‌বার নির্বাচিত করে। অতএব দেখা যায় যে, ইমাম খোমেনীর রেখে যাওয়া ফরমূলায় নেতৃত্ব নির্বাচনের কোন সংকট হয়নি। আরও লক্ষণীয় যে, ইমাম মৃত্যুর আগে তাঁর জাতির কাছে এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র কাছে অসিয়তনামা রেখে গেছেন যার মাধ্যমে তিনি পথের দিশা সম্পর্কে শেষ হুঁশিয়ারীও দিয়েছেন। অন্যতম লক্ষণীয় যে স্বীয়পুত্র যাতে নেতৃত্বে এসে নেতৃত্ব বিকাশের শাশ্বত প্রক্রিয়ার পরিবর্তে বংশানুক্রমিক কোন ধারা কায়েম না করে ফেলেন সে দিকেও হুঁশিয়ার ছিলেন ইমাম খোমেনী। আর তাই স্বীয় পুত্রকে তিনি সেভাবেই নির্দিষ্ট দূরত্বে রেখে গেছেন।

ইমাম খোমেনীর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভংগীও ছিল বিশাল এবং ক্ষুরধার। তিনি পতনোন্মুখ রাশিয়ায় গর্বাচেভকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে সময়োপযোগী একটি দৃষ্টান্তমূলক কাজ করে গেছেন। সালমান রুশদীর জন্যে তাঁর ঐতিহাসিক ফতোয়া মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্যে একটি যাদুকরী রক্ষাকবচ। হজ্জের ইবাদতকে মুসলিম উম্মাহর সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনর্জাগরণের অবলম্বন হিসাবে খুঁজে নেয়ার যে পথ ইমাম খোমেনী দেখিয়ে গেছেন তা–ই আগামী দিনে আন্তর্জাতিক ইসলামী উত্থানের প্রধান অবলম্বন হতে চলেছে।

আল কুদস দিবস পালনের ডাক দেবার মাধ্যমে ইমাম খোমেনী মজলুম মুসলিম উম্মাহকে নতুন করে ঐশী শক্তিতে মাথা তুলে দাঁড়াবার মন্ত্র দিয়ে গেছেন।

ইনতিফাদা তথা গণজাগরণের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে নির্যাতিত আরব মুসলিমকে জেহাদের প্রকৃত পথের সন্ধান দিয়েছেন ইমাম খোমেনী।

ইমাম খোমেনী ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করে তাকে বিপদমুক্ত করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, নির্দিষ্ট সময়ান্তে যথাযথ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুনভাবে নেতা

দেবার জন্যে নেয়া হয় নানান উদ্ভাবনী কার্যক্রম। বর্ণিত এসব উদ্যোগের মধ্য দিয়ে দেশ, জনগণ, উম্মাহ ও যুগের প্রতি একটি ইসলামী সরকারের যথার্থ দায়িত্বশীলতার প্রকৃত ছবি অনুধাবন করা যায়।

কেবল ইসলামী সরকারের কাঠামো দাঁড়করণের কাজেই সীমাবদ্ধ থাকেননি ইমাম খোমেনী। বিপ্লবের অব্যবহিত পরই মদীনার শিশু ইসলামী রাষ্ট্রের মত ইরানের ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ ও বাইরের চক্রান্ত কয়েকগুণ ব্যপ্তি নিয়ে অগ্রসর হয়। বিপ্লবের নেতৃবৃন্দকে গুপ্তহত্যা, অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা, নাশকতামূলক কাজ, কুর্দি বিদ্রোহ, বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবরোধ, ইরাকী আগ্রাসন ইত্যাদি একের পর এক চ্যালেঞ্জ ইসলামী ইরানকে কাবু করে ফেলতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু মহান নেতা ইমাম খোমেনীর ধীর স্থির ও অবিচল ভূমিকায় ইরান একের পর এক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে থাকে। এক শক্তিশালী বোমা হামলায় হারিয়ে যায় বিপ্লবের প্রথম সারির ৭২ জন নেতা। সে বোমার ক্ষত না সারতেই অপর এক বোমায় নিহত হন প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী একই সাথে।

খোমেনীর প্রাণনাশে অগ্রসর হন সাদেক কুতুবজাদেহ্। এ ধরনের সকল আলামত আপোষহীন চিত্তে মোকাবেলা করা হয়। মার্কিনী ষড়যন্ত্রে চাপিয়ে দেয়া ইরাকী আগ্রাসন মোকাবিলায় ইরানী নেতৃত্ব যে চরম ত্যাগ ও কোরবানীর নজরানা পেশ করেন তার বিনিময়ে ইরানের সরকার একটি মহাক্রান্তিকাল সাফল্যের সাথে পার করতে সক্ষম হয়।

সম্পদ পুনর্বন্টনেও ইরানের ধর্মীয় নেতৃত্বের সরকার ইনসাফপূর্ণ পন্থায় অগ্রসর হন। ক্ষমতায় গিয়েই তারা বঞ্চিত গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুত, পানি, গ্যাস ইত্যাদি সরবরাহের উদ্যোগ নেন। চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করেন। বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য এবং গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট ও বাসভবন নির্মাণের কার্যক্রম হাতে নেন। কৃষি উন্নয়ন, শিল্পায়ন, সামরিক সংহতি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও স্বীয় মেধা, যোগ্যতা ও সম্পদের দিকে মনোনিবেশ করে এগুতে চেষ্টা করেন ইমাম খোমেনী। আর তেল উৎপাদনে এবং ভোগবাদিতায় আনা হয় চরম সংযম। নিষিদ্ধ হয় সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, চোরাকারবার ইত্যাদি। এতে করে ইরানের সামগ্রিক অর্থনীতিতে একটি ব্যতিক্রমধর্মী উন্নয়নের ছোঁয়া অনুভূত হয়। ইরানী নেতৃত্বের এই বাস্তবানুগ কর্মকাণ্ড সর্বমহলের প্রশংসাধন্য হয়। ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বের বিচক্ষণতা পরিমাপে দুটো ছোট নজীর তুলে ধরতে চাই। বিপ্লবোত্তর সরকারের ব্যবস্থাপনায় ইরানের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা রাত দিন খেটে বিশ সালা মহা উন্নয়ন পরিকল্পনা বানালেন। শিল্পখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয় তাতে। ইমাম খোমেনী পরিকল্পনা শুনে তা পরিবর্তন করে কৃষিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে বললেন এবং জানালেন ইরানকে যেন খাদ্য কিনার কথা ভাবতে না

সরকারকে। এভাবে ইসলামী সরকার এক বিশাল দায়-দায়িত্বের বোঝা বহনকারী ইনসাফ কায়েমের প্রতিশ্রুতিশীল সরকার হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে।

শাহের আমলের প্রণীত আইনসমূহ সহ ইরানে পূর্ব থেকে প্রচলিত সকল আইনকে ইসলামের নিরিখে সংস্কারের একটি বিশাল কর্মকান্ড হাতে নেয়া হয় বিপ্লব উত্তরকালে। প্রচলিত রোমান, ইংরেজ এবং পারস্য আইনসমূহ ইসলামের আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচাই-বাছাই ও সংশোধন করার ব্যবস্থা করা হয়। ইসলামের দণ্ডবিধি চালু করা হয়। শরীয়তের মাপকাঠি মোতাবেক বিচারকদের মান ও সমগ্র বিচার কাঠামোকে পুনর্বিন্যাস করা হয়। সুপ্রীম জুডিসিয়ারী কাউন্সিল গঠন করে এর নেতৃত্বে স্বাধীন বিচার বিভাগ দাঁড় করানো হয়। ব্যক্তি ও সমাজের অধিকার সংরক্ষণ করা, আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা, অপরাধ প্রবণতাকে প্রতিরোধ করা প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত করা হয়। ইরানে ইসলামী সরকার বিনির্মাণে ইমাম খোমেনী (রঃ) সংবিধান প্রণয়নের পর যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজটিতে হাত দেন তা হল নির্বাচন। মাত্র একবছরের মধ্যে মজলিসের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং আইনানুগ সরকার গঠন। হাজারো প্রতিবিপ্লবী প্রতিরোধ সত্ত্বেও এসব পর্যায় সাফল্যের সাথে অতিক্রান্ত হয়।

এরপর প্রাক-বিপ্লব যুগে ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাঘব বোয়ালদের বিচার করে সকল জুলুম ও অপরাধের শাস্তি বিধান করা হয়। বিপ্লবোত্তর সমাজে শান্তি ও স্থিতি আনার জন্যে এটা ছিল এক ঐতিহাসিক কাজ। সমাজে কে কত বড় জ্ঞানী ও ক্ষমতাশালী তার কারণে বিচারের দণ্ড কোন পক্ষপাত করেনি। বরং খোলাখুলি বিচারে ফায়ছালা হয়েছে অতীত সকল জালেমের ভাগ্য।

বিপ্লবোত্তর সারাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থাকে যথাযথভাবে ঢেলে সাজানোর আগ পর্যন্ত শাহের আমলের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। তারপর নতুনভাবে প্রণীত সিস্টেম ও পাঠক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষা কার্যক্রম ঢেলে সাজানো হয়। শিক্ষা পুনর্গঠনের এই বৈপ্লবিক কাজ ছিল ব্যাপক দূরদর্শিতাসম্পন্ন একটি মহৎ উদ্যোগ। পর্যায়ক্রমে ইসলামী সরকারের নিরাপত্তা বিধানে, বিপ্লবের কর্মসূচীর ত্বরিৎ বাস্তবায়নে সাহায্যকারী শক্তি হিসাবে গঠন করা হয় ইসলামী বিপ্লবী রক্ষী বাহিনী। পল্লী এলাকা উন্নয়ন ও দেশগঠনমূলক কাজের জন্য হাতে নেয়া হয় জেহাদ-ই সাজেন্দেগী। শাহের আমলের অত্যাচারী জালেমদের পরিত্যক্ত বিশাল সম্পদসমূহ সংরক্ষণ করে দরিদ্র জনগণের সেবায় নিয়োগের জন্য গঠিত হয় বুনিয়াদ-ই মুস্তাজআফিন। যুদ্ধাহত ও পঙ্গুদের জন্য গঠন করা হয় শহীদ ফাউন্ডেশন বা বুনিয়াদই শহীদ। দেশে-বিদেশে ইসলাম ও ইসলামী বিপ্লবের সত্যিকার ধারণা তুলে ধরার জন্য গঠন করা হয় সম্পূর্ণ নতুন বিভাগ। বিপ্লবের চেতনাকে সারা উম্মাহর মধ্যে ছড়িয়ে

সমগ্র জাতির পথ প্রদর্শক। একটি সুবিশাল প্রক্রিয়ায় নিখাদ হয়ে বেরিয়ে আসবে এই নেতৃত্ব। বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং আইন বিভাগ সবার অভিভাবক হবেন এই রাহবার। এ ছাড়া রাহবারের থাকবে কয়েকটি শক্তিশালী হাত। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ৭২ জন ধর্ম ও আইন বিশেষজ্ঞ রাহবার বাছাই এর কাজ করবে। রাহবারকে পরামর্শ দেবে। অভিভাবক পরিষদ আইন বিভাগের প্রণীত আইন কতটা ইসলাম সম্মত তা পরীক্ষা করে। শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা দান করে আর রাষ্ট্রের সকল নির্বাচন তদারক করে। প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে সরকারের যে সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী পরিষদ সেটারও অভিভাবক রাহবার। তাছাড়া রাহবার নিজে সরাসরি নিয়োগ দেন প্রধান বিচারপতির, সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানদের, জাতীয় সম্প্রচার সংস্থার পরিচালকের। এভাবে রাহবারকে ঘিরে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সরকার পদ্ধতি প্রণয়ন করে গেছেন ইমাম খোমেনী (রহঃ), পার্লামেন্টের ডেপুটিরা এবং প্রেসিডেন্ট জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। একজন প্রেসিডেন্ট দুই মেয়াদের বেশী নির্বাচিত হতে পারেন না। ২৭০ সদস্যের পার্লামেন্টে সরকারী দল বা বিরোধী দল বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। সকল ডেপুটির মর্যাদা ও অধিকার সমান।

পাশ্চাত্যের সংসদীয় পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে, রাজনৈতিক দল প্রক্রিয়ার মধ্যে না যেয়ে জনগণের সমর্থন ও রায়ের ভিত্তিতে একটি সরকার পদ্ধতি পরিচালনার যে বিরল দৃষ্টান্ত ইমাম খোমেনী দেখিয়ে গেছেন তা গভীরভাবে গবেষণা করে দেখার দাবী রাখে। মর্যাদা, অধিকার, আনুগত্য, শৃঙ্খলা এই চারের এক অভূতপূর্ব সমন্বয়ের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে গোটা সিস্টেম এবং এই সিস্টেমের আওতায় পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠানগুলো। ইমাম খোমেনী সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ইসলামী চরিত্র, জ্ঞান, তাকওয়া ইত্যাদির ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। পাশাপাশি এই নেতৃত্বের পেছনে জনতার পছন্দ অপছন্দের রায়টিকেও দেয়া হয়েছে সমগুরুত্ব।

ইমামের বিনির্মিত ইসলামী সরকার সংবিধান সহ সকল আইন এবং বিধানের মাধ্যমে মানুষের মৌলিক অধিকারকে সুসংরক্ষিত করেছেন। সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতি, গোত্র, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে সকল ইরানবাসী আইনের চোখে সমান অধিকার ভোগ করবে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল মানবীয় অধিকার আইন দ্বারা সংরক্ষিত। ইসলামের বৈধ সীমার মধ্যে সবার কাজের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, পেশা গ্রহণের স্বাধীনতা, সংগঠন ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। শিশু, বৃদ্ধ, পঙ্গু, মহিলা সহ সকলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার দায়িত্ব সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক ইরানী নাগরিকের শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ইত্যাদির জিম্মাদারী দেয়া হয়েছে ইরান

আদর্শিক শূন্যতা সমাজকে দেউলিয়া করে রেখেছে। সুবিধাবাদ একটি স্থায়ী স্ট্যান্ডার্ড হিসাবে গ্রহণীয় হয়েছে। আর তাই উপনিবেশ উত্তরকালে মুসলমানদের প্রচুর জাতীয় রাষ্ট্র স্বাধীন হয়েছে ঠিকই কিন্তু এগুলো আকৃতির দিক থেকে বেশীর ভাগই হচ্ছে শতধাবিচ্ছিন্ন এবং অনৈক্যের উপজাত। আর প্রকৃতির দিক থেকে এগুলো নিরেট ধর্মনিরপেক্ষ এবং সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার। ইসলামের দূরতম বৈশিষ্ট্যও এদের মধ্যে নেই। এমনি এক সরকার ছিল রেজা শাহ পাহলভীর সরকার। সে ছিল আমেরিকার বশংবদ, ইসরাইলের বন্ধু। স্বীয় তেলসম্পদ পুরোটাই সে ইজারা দিয়েছিলো মার্কিনীদের হাতে। গোটা দেশকে অভুক্ত রেখে তেহরানে কিছু সম্পদ জড়ো করে তথাকথিত উন্নয়নের বক্তৃতা করতো সে। শোষণ ও অত্যাচারের স্টীম রোলার চালাতো তবে ইসলামের নীতি আদর্শ সমুদয় উপেক্ষা করে গোটা জাতিকে বানিয়েছিল নগ্নতা ও অশ্লীলতার সেবাদাস। কিন্তু ১৯৭৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারীতে ফ্রান্স থেকে ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তনের পর খোমেনী দৃপ্তচিত্তে ঘোষণা দেন ঃ "আমি সরকার নিয়োগ করবো, আমি এ সরকারের মুখে মুষ্ঠাঘাত করবো, জনগণের সমর্থন নিয়ে এবং জনগণ আমাকে যেভাবে গ্রহণ করেছে সেই শক্তির বলে আমি একটি সরকারকে নিয়োগ প্রদান করবো।" নিঃসন্দেহে এটা ছিল যুগান্তকারী ঘোষণা।

ইমাম তাঁর এ ঘোষণাকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত করেন। জালেমশাহীকে উৎখাতের পর তিনি একটি ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ গঠন করেন এবং মেহেদী বাজারগান –এর নেতৃত্বে একটি অস্থায়ী মন্ত্রিসভা নিয়োগ দেন। মাত্র ৪০/৪৫ দিনের ব্যবধানে আয়োজিত হয় ঐতিহাসিক গণভোট। এই গণভোটের মধ্য দিয়ে দেশের শতকরা ৯৮·২ ভাগ মানুষ ইরানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র করার পক্ষে রায় দেন। রাজতন্ত্র হতে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের পথে ইরানের এই উত্তরণ ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কারণ এই উত্তরণের রূপকার নিজে নিজে ঘোষণা দিয়ে ইরানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র বানাননি বরং জনতার সুস্পষ্ট রায়ে সেখানে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। এই শিশু ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালনার জন্যে দ্বিতীয় আবশ্যক কাজ ছিল একটি সংবিধান প্রণয়ন করা। আধুনিক বিশ্বে, যুগের চাহিদাকে সামাল দিয়ে ইসলামের মূলনীতির আলোকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ভারসাম্যপূর্ণ বিভাজন সম্বলিত একটি শাসন প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করা ছিল নিঃসন্দেহে সর্বাধিক দুরূহ কাজ। পাশ্চাত্যের ধ্যান–ধারণা ও প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত থেকে একটি গ্রহণযোগ্য সরকার পদ্ধতি প্রণয়নে ইরানের ধর্মীয় নেতৃত্বের সেদিনের বিচক্ষণতা ও বুৎপত্তি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার।

সমগ্র দেশবাসীর একটি আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব থাকবে যে নেতৃত্বকে ঘিরে জাতির ঐক্য, সংহতি ও বিকাশের প্রক্রিয়া এগিয়ে যাবে। এই নেতৃত্বের সাথে জনগণের আনুগত্যের সম্পর্কের ভিত্তি হবে ধর্ম এবং বিশ্বাস। রাহবার বা ওলীয়ে ফকীহ হবেন

উৎখাত করে শোষণমুক্ত সমাজ কায়েমে জনগণের সংগঠিত আওয়াজ ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বকে অপরূপ ব্যঞ্জনা দান করে। ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসাবে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে ইরানের হাজার হাজার গণমানুষ এবং ধর্মীয় নেতৃত্ব দ্বিধাহীনভাবে শাহাদাতের পেয়ালা আকণ্ঠ পান করে।

চতুর্থ যে বিরাট সংস্কার ইমাম খোমেনী আনয়ন করেন তা হল জনগণের বিশ্বাস ও আকীদা থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার লতাগুল্মকে উপড়ে ফেলা। রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিকতা, বিচার-ফায়ছালা সব কিছুতে তিনি ইসলামের নীতি ও আদর্শের প্রায়োগিক চর্চা নিশ্চিত করেন। ধর্মকে রাজনীতি থেকে বিযুক্ত রেখে ইউরোপীয় ধাঁচে সরকার পরিচালনার বিভ্রান্তিকর প্রয়াস থেকে দূরে আসার আবশ্যকতা তিনি অনুশীলন করে দেখান। জুমআ'র নামাজে লোকেরা শিয়া-সুন্নীর ঐক্যের জন্য এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক বলে শ্লোগান দেয়াকে ইবাদতের অংশ মনে করতে শিখেছে।

ইমাম খোমেনী ইরানকে শাহের আমলের ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত করেন। ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা, সেই সরকারের সুস্থিতি প্রদান, প্রতিবিপ্লবী শক্তির মোকাবিলা, নেতৃত্ব বাছাই ইত্যাকার সকল গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে তিনি বিস্ময়কর হিকমতের প্রয়োগ দেখিয়ে কথিত মোল্লাদের সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ধারণা সম্পূর্ণ বদলিয়ে দেন। মোল্লাদের দুনিয়াবী যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পর্কে খুবই নেতিবাচক একটা মূল্যায়ন ছিল সর্বত্র। কিন্তু ইমাম খোমেনীর দৃঢ়তা, বলিষ্ঠতা এবং প্রজ্ঞার কাছে সাম্রাজ্যবাদ ধরাশায়ী হবার পর আলেম সমাজের পারদর্শিতা ও ধর্মীয় নেতৃত্বের কার্যকারিতা সম্পর্কে সংশয় ও হালকা মানসিকতা এখন বিদূরিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনায় জনগণকে সংঘটিত করে শাহকে উৎখাত করার মধ্য দিয়ে ইমাম খোমেনীর সাফল্যের প্রথম অধ্যায় রচিত হয়। শাহ বিরোধী সংগ্রাম ইরানে জাতীয়তাবাদী শক্তি এবং বামপন্থীরাও অনেক আগে থেকেই করে আসছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার বিশ্বাস ও মেকানিজমের কারণে সে সব কার্যক্রম কোনটিই স্থিতিশীল সাফল্য বা বিজয় অর্জনে ব্যর্থ হয়। অথচ খোমেনী পাশ্চাত্যবাসীর কাছে দুর্বোধ্য এক প্রক্রিয়ায় ইসলামের সুমহান শিক্ষার ভিত্তিতে একটি ব্যতিক্রমী সফলতা অর্জন করেন।

বস্তুতঃ পাশ্চাত্যের ধাঁচে গড়ে তোলা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক মননে যারাই মুসলিম সমাজে অগ্রগতি আনতে চেয়েছেন তারা সমাজে চিন্তা ও বিশ্বাসের জগতে একটি স্থায়ী নৈরাজ্য আমদানী করেছেন। বস্তুগত কিছু চোখ ধাঁধানো উন্নতি হয়তো এসেছে কিন্তু সমাজে প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণ আসেনি। বৈষম্যহীন স্থিতিশীল কোন সমাজ গড়া যায়নি। ভোগবাদী অস্থিরতা সমাজকে গ্রাস করেছে।

বস্তুতঃ ইমামের নেতৃত্বে অসামান্য সাফল্যের সাথে একটি স্বপ্নময় বিপ্লব সাধিত হয়েছে। এই বিপ্লব দুনিয়াকে দেখিয়েছে যে, ইসলাম ধর্ম নিঃশেষ হয়ে যায়নি। বরং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মানবতার এবং শোষিত, বঞ্চিত মানুষের মুক্তির প্রধান অস্ত্র ও ধর্মই হচ্ছে ইসলাম ধর্ম।

শাহের গড়ে তোলা আমলাতন্ত্র, আধুনিক স্বৈরাচারী সেনাবাহিনী, অত্যাচারী পুলিশ বিভাগ এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদদ কোনটিই সবল কোন প্রতিষ্ঠান বলে প্রমাণিত হয়নি। নিজ দেশের নির্যাতিত ধর্মপ্রাণ মানুষকে উজাড় করা ভালবাসায় কাছে টেনেছেন খোমেনী। তারপর তাদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন শার্দুলের মত। খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেছে শয়তানের তখ্‌ত তাউস।

কেবল সাফল্যের বিচারে নয়, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও খোমেনীর বিপ্লব বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই মহান ক্যারিশমা জীবনের প্রথম ত্রিশটি বছর নিজে জ্ঞান সাধনায় কাটিয়েছেন। ব্যাপক অধ্যয়ন ও জ্ঞান তপস্যার পর জীবনের আরও ত্রিশটি বছর (১৯৬৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত) কাটিয়ে দিয়েছেন শিক্ষকতায়। এই সময় তিনি এবং সমসাময়িক ধর্মগুরুরা গড়ে তুলেছেন হাজার হাজার খাঁটি আলেম যাঁরা ছিলেন জ্ঞানে, চরিত্রে এবং প্রতিশ্রুতিতে এক একজন এক একটি মহান সম্ভাবনা। এভাবে বিপ্লব পরিচালনার উপযুক্ত দক্ষতাসম্পন্ন নেতা ও কর্মী তৈরী করা হয়েছে মোটামুটি নিরুপদ্রবে এবং পরিকল্পিতভাবে। রাজনৈতিক দল গড়েননি কিন্তু সমাজ বিপ্লবের হাজারো কর্মী গড়তে ভুল করেননি। বাস্তবিকই একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে আবশ্যকীয় উপকরণ হিসাবে গণনেতৃত্বের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার কাজটি ছিল খুবই তাৎপর্যবহ।

ডঃ মোসাদ্দেকের নেতৃত্বে শাহের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী উত্থানের যে সাময়িক সাফল্য দেখা গিয়েছিল সেটার পিছনে ইরানের আলেম সমাজের সমর্থন থাকলেও তাঁরা তখন সেভাবে কাতারবন্দী হননি।

আয়াতুল্লাহ খোমেনী হচ্ছেন প্রথম সফল ব্যক্তিত্ব যিনি রাজনৈতিক বাস্তবতাবোধ ও দৃঢ়তা নিয়ে যথামেজাজে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বিচক্ষণ, দূরদর্শিতা ও ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তা নিয়ে তিনি স্বীয় জনগণ ও জাতিকে জেহাদে অবতীর্ণ করেন। মুসলিম উম্মাহকে তিনি সঠিকভাবে প্রধান ও প্রথম শত্রু চিহ্নিত করার কাজটি ধরিয়ে দেন। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে স্বীয় জনগণের ঘৃণা ও ক্ষোভকে তিনি সার্থকভাবে জাগিয়ে তোলেন।

তৃতীয় যে কাজটি তিনি অপূর্ব দক্ষতায় ভরিয়ে দেন সেটা হল ইরানের জনগণের মধ্যে একটি ন্যায়ানুগ, ধর্মীয় চেতনাপুষ্ট সরকারের আকাঙ্খা। অত্যাচারী শাহকে

ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ মুসলিম জনপদগুলোতে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা-চেতনার ধারক-বাহক এক শ্রেণীর অভিজাততন্ত্র সৃষ্টির পাশাপাশি সেখানে সামাজিক শৃঙ্খলা ও নৈতিক শক্তির ওপর চড়াও হয়। সম্পদ লুট করে চরম দারিদ্র্যের মুখোমুখি করে দেয় সেগুলোকে। শিক্ষা-দীক্ষায় ঐতিহ্যসূত্র বিচ্ছিন্ন করে দেয়। মন ও মগজে ইউরোপের গোলাম বানানোর পরিকল্পিত অভিযান চলে। ধর্মকে রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থাপনা থেকে পৃথক করে ফেলার ইউরোপীয় চর্চাকে এশিয়া ও আফ্রিকাতেও চাপিয়ে দেয়া হয়। ইত্যবসরে দুনিয়া পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের দুই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সেক্যুলার মুসলিম সরকারগুলোও কোন না কোন শিবিরভুক্ত হয়ে পড়ে।

ঔপনিবেশিক আমল ও ঔপনিবেশিক উত্তর যুগে গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্যে একক কোন নেতৃত্বের অধীনে সর্বব্যাপী কোন মুক্তি-সংগ্রামের বাস্তবতা ছিল না বা নেই। এ সময়ে যেটা ছিল আবশ্যক এবং অপরিহার্য তা হল পাশ্চাত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে ইসলামের নিজস্ব ইতিহাস, গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ও আদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে যুগোপযোগী আন্দোলনের ধারা গড়ে তোলা। আল্লাহর সাহায্যের ওপর ভরসা করে জনগণের শক্তিকে পুঁজি করে স্ব স্ব পরিমণ্ডলে ইসলামী নিজাম কায়েম করা এবং মুসলিম জাতিসমূহের মধ্যে ঈমানী ভ্রাতৃত্বের বাস্তব সম্পর্ক গড়ে তোলা। কিন্তু ইতিহাস বিনির্মাণে মুসলিম জাতিসমূহের নেতৃত্ব খুব দ্রুত এগিয়ে আসতে পারেনি বলেই ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। সাম্রাজ্যবাদী মন ও মননে এবং শিক্ষা-দীক্ষায় গড়ে ওঠা পরাজিত মানসিকতার মুসলিম নেতৃত্বের অধীনে যখন তাঁবেদার সেক্যুলার মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ স্বাধীন হচ্ছিল তখন উনবিংশ শতকে সারা দুনিয়ায় মুসলমানদের মন ও মননে ইসলামী রাজনৈতিক পুনর্জাগরণ আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে।

পাশাপাশি ইরানে উনবিংশ ও বিংশ শতকের গোড়ার দিকে সাম্রাজ্যবাদ ও রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনে মুজতাহিদ সিরাজী, সাইয়েদ মুহাম্মদ বিহবাহানী, সাইয়েদ তাবাতাবাঈ, আয়াতুল্লাহ কাশানী, আয়াতুল্লাহ বুরুজারদী প্রমুখ খ্যাতনামা আলেম একটি বিরাট ঐতিহ্য গড়ে তোলেন। এই সুবিশাল ঐতিহ্যের মহান উত্তর পুরুষ আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ আল-মুসাভী আল খোমেনী (রঃ) যাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে উপনিবেশ উত্তরকালে দুনিয়ায় অন্ততঃ একটি মুসলিম জনপদে পুনশ্চ ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কয়েক শতাব্দীর শেকড় গেড়ে বসা সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক রাজতন্ত্রের খুঁটিকে অত্যন্ত নিপুণ হস্তে দৃপ্তচিত্তে উপড়ে দিয়েছেন ইমাম খোমেনী (রহঃ)। ইসলামের প্রতি বৈরী একটি মহাশক্তিধর ক্ষমতাসীন চক্রকে হটিয়ে ইসলামকে একটি বিজয়ী আদর্শ হিসাবে রূপায়ন করে দেখিয়েছেন ইমাম খোমেনী।

হয়। একসময় আরব বিশ্বের রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব এতোটা প্রকট হয়ে পড়ে যে, তারা ইংরেজদের প্ররোচনায় উসমানিয়া রাষ্ট্রের বন্ধনমুক্ত হয়ে স্বাধীনতা গ্রহণ করে। বস্তুতঃ এটা ছিল পাশ্চাত্যের প্রতি গোলামীর জন্য তাদের পুরস্কার।

উপনিবেশবাদের কবলে পড়ে স্বীয় ধর্ম এবং মূল্যবোধ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে মুসলিম জনপদগুলো ইউরোপীয় ভাষা, সংস্কৃতি, দর্শন, বিজ্ঞান এবং তথাকথিত বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে বরণ করে নেয়। ধর্মবিবর্জিত সেক্যুলার ভাবধারাকে আধুনিকতা এবং প্রগতিশীলতা বলে গ্রহণ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণের ছত্রছায়ায় স্বাধীনতা অর্জন করে। ঔপনিবেশিক পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে বশংবদ এলিট শ্রেণী। যাদের কাছে ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস, মুসলিম উম্মাহ, ইসলামী নেতৃত্ব, ইসলামী সরকার ইত্যাদি জ্ঞান হয় খুবই সীমাবদ্ধ।

অবশ্যই উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ঔপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসন থেকে বিপর্যস্ত উম্মাহকে বাঁচানোর জন্যে সকল মুসলিম ভূখণ্ডেই প্রকৃত ধারার প্রতিরোধ গর্জে উঠেছে বরাবরই। আর সেই জেহাদগুলো সংগঠিত হয়েছে একমাত্র আলেম এবং ধর্মপ্রাণ গণনেতৃত্বের পক্ষ থেকে। এগুলোর প্রায় সবই ছিল আঞ্চলিক। দুশমনের সুসজ্জিত বিপুল সেনাবাহিনী ও রসদপত্রের মোকাবিলায় এগুলো ছিল চরমভাবে অসহায়। সামগ্রিক কোন ফলপ্রসূ ভূমিকা গড়ে তুলতে এরা ছিল ব্যর্থ। তথাপি ঈমানী চেতনায় প্রজ্বলিত তাদের প্রতিরোধ শিখা সর্বত্রই নিবু নিবু করে জ্বলতে জ্বলতে শাহাদাত বরণ করেছে এবং ইসলামের বিশ্বজনীন চেতনাকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে অন্ততঃ বাঁচিয়ে রেখে গেছে। উপনিবেশ যুগে সাইয়েদ জালালউদ্দিন আফগানী; শেখ মুহাম্মদ আবদুহ আবদুর রহমান আল কাওয়াকেবী, স্যার সাইয়েদ আহমদ প্রমুখদের আন্দোলনসমূহ আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সত্যাশ্রয়িতার দিক থেকে উঁচুমানের ছিল। কিন্তু অপপ্রচার এবং সর্বাত্মক বিরোধিতা সর্বোপরি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জনতার মধ্য হতে জেগে ওঠা এসব আন্দোলনের শক্তিকে রুখে দেয়া সম্ভব হয়।

পক্ষান্তরে, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এই ধারণাই ক্রমে ক্রমে বদ্ধমূল হয়েছে যে, পাশ্চাত্যের ধরনে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রক্রিয়া গড়ে তোলা না হলে সৃষ্ট রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণ হবে না। আর এসবের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে নেতৃত্বের সর্বপর্যায়ে ইসলামের বিস্তৃতি চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করে। কোরআনের দোহাই পেড়ে জনগণকে সংগঠিত করে তারপর সেই জনগণকে প্রতারণার বেড়াজালে আবদ্ধ করে। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে তুরস্কে কামাল পাশা, পাকিস্তানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মিশরে জামাল আবদুন নাসের প্রমুখ। ইসলামী আদর্শবাদের সাথে মুসলিম জাতীয়তার পার্থক্য নিরূপণের যোগ্যতাও ছিল না এসব নেতৃত্বের।

সমকালীন বিশ্বে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা এবং ইমাম খোমেনী (রহঃ)

ডঃ আবু বকর সিদ্দীক

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)–এর জিন্দেগীর একটি সুমহান অবদান হচ্ছে খোদার মনোনীত দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামেরই মূলনীতির ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করা এবং তা পরিচালনা করার মাধ্যমে বিজয়ী আদর্শ এবং সমাজ প্রক্রিয়া হিসেবে ইসলামের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা। এবং তা করেছিলেন স্বয়ং রসুল (সাঃ)। তিনি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন। তাঁরই নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল একটি ইসলামী সরকার। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ পর্যন্ত গোটা উম্মাহর জন্যে এককেন্দ্রিক নেতৃত্বসম্পন্ন কল্যাণময় ইসলামী সরকার টিকে ছিল। কিন্তু কারবালার বিয়োগাত্মক ঘটনার পর থেকে রাষ্ট্রযন্ত্র ধীরে ধীরে রাজতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্রের কবলে আক্রান্ত হয়। খেলাফতের ছদ্মবেশে রাজতন্ত্র যখন মুসলিম উম্মাহর প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রতিষ্ঠানরূপে আত্মপ্রকাশ করে তখন স্বাভাবিকভাবেই উম্মাহর মধ্যে আসে বিভক্তি। সূচিত হয় বিপর্যয় এবং পতন।

সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তির দিক থেকে ইসলামের একটি সর্বব্যাপী ভিত্ বিস্তৃত থাকায় পর্যায়ক্রমে বহুধা বিভক্ত মুসলিম উম্মাহর চূড়ান্ত পতন আসতে প্রায় ১২০০ বছর লেগে যায়। শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চা এবং দুনিয়ার দিকে দিকে ইসলামের প্রচার প্রসারে ব্যস্ত আলেম এবং ধর্মীয় নেতৃত্বের পক্ষে রাজনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচী গ্রহণ করা যেন হয়ে ওঠেনি। আর যাও দুই একটি আন্দোলন সংগঠিত হতে চেষ্টা করেছে সেগুলোকে সর্বাত্মক পন্থায় ধ্বংসাত্মকভাবে মোকাবিলা করেছে বংশানুক্রমিক রাজারা। ফলে মনীষীরা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে খেদমত করেই সময় অতিক্রম করেছেন। এই ফাঁকে দুর্নীতি ও বিস্তৃতি ইসলামী রাষ্ট্রের মর্মমূলে ঢুকে পড়ে একটু একটু করে এর নৈতিক মনোবলকে ঘুণে ধরা পোকার মত খেয়ে শেষটায় একে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে ছেড়েছে। নবম, দশম ও একাদশ শতাব্দীতে যে মুসলিম মনোবলের কাছে ইউরোপ সর্বাংশে আত্মসমর্পণ করেছে সেই মুসলমানরা নিজেদের অন্তসারশূন্যতার কারণে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের উপনিবেশে পরিণত

লেখক ঃ একজন প্রফেসর, আরবী বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

8. Paigham-i-Imam, 21 July, 1980, cited in Islamic Revolution in Iran (in Bengali) by Maulana Muhammad Samiruddin, Din-e-Huq publication, Dhaka, 1988), p. 39

9. Cited from the Islamic Consultative Assembly on the Islamic Republic of Iran, Bengali Tr. (Dhaka, January, 1986), p. 14

10. General Al-Bashir, who in 1989 came to power in Sudan, referred to the Islamic Revolution in Iran to be a great source of inspiration for the Muslim revolutionaries — News Letter, December, 1992, p. 46

ইমাম খোমেনী (রহঃ) ও বিশ্বের নির্যাতিত জনগণ

আবদুল মুকীত চৌধুরী

অনন্য বিপ্লব

ডক্টর হামিদ আলগার ইরানের ইসলামী বিপ্লব মূল্যায়নে বলেছিলেন, 'এ বিপ্লব বর্তমান শতাব্দীর অন্যান্য বিপ্লব থেকে স্বতন্ত্র; কেননা ইতিহাসের গভীরে এর শেকড় প্রোথিত। ইরানীদের অপরিহার্য ও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির সাথে সাথে আকস্মিক কোন পরিবর্তন এটা নয়; বরং এ ছিল সুদীর্ঘকালের রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের একটি অব্যাহত প্রয়াসের ফলশ্রুতি।' এ বিপ্লবের যারা নিবিষ্ট বিশ্লেষক, আশা করা যায় সবাই এটাকে যথার্থ মূল্যায়ন হিসাবেই নেবেন। এ বিপ্লবের দু'টি বিশ্লেষণযোগ্য প্রধান দিক হচ্ছে–(১) এ বিপ্লব অনন্য (২) ইতিহাসের গভীরে এর শিকড়। অনন্য এই অর্থে যে, এটা পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক অবয়বের কোন বিপ্লব নয় বা কোন নাস্তিকতাবাদী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবও নয়। পুঁজিবাদী শোষণ অব্যাহত রাখার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এখানে অনুপস্থিত। শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী মানুষের মুক্তির বুলি বচনে দলীয় স্বৈরশাসন কায়েমের ব্যবস্থাও এ বিপ্লবে নেই।

পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের যাবতীয় অভিশাপ ও ব্যর্থতামুক্ত এ বিপ্লব স্বাতন্ত্র্যে মহীয়ান, অনন্য। স্বাভাবিক যে প্রশ্নটি এসে দাঁড়ায়, এর ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যটা কি? ডঃ হামিদ আলগার তাঁর সুচিন্তিত বিশ্লেষণে ইতিহাসের গভীরে যে শিকড়ের কথা বলেছেন, সে শিকড় কোথায়? আমাদের কৌতূহলী দৃষ্টিতে সাধারণভাবে আদম (আঃ) থেকে শুরু করে বিশেষ করে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লব এবং পুঁজিবাদী ধারার ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়ায় রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও তার সাম্প্রতিক পতন পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ের ইতিহাসের বিচার–বিশ্লেষণের মধ্যেই সেই শিকড়ের মূল নিহিত রয়েছে। ইতিহাস চেতনার নির্যাস চর্চিত এ বিপ্লবের শিরা–উপশিরায় সেজন্য রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, কূটনৈতিক প্রজ্ঞা, চরিত্রগত সৌন্দর্য, ঐক্য ও সংহতির ইস্পাত কাঠিন্য, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও কৌশলের নিপুণ প্রয়োগধর্মিতা, কৌশলগত অবস্থান ও আধ্যাত্মিক শক্তি একে সাফল্যের শিরোপায় ভূষিত করেছে। আহলে বায়েতের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের শাহাদতের পবিত্র ধারা ও পরবর্তী

লেখক ঃ প্রাবন্ধিক, গবেষণা কর্মকর্তা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

শাহাদত কাহিনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ইরানী জাতির অন্তরে অনির্বাণ বিপ্লব শিখা হয়ে জ্বলে উঠেছিল এবং তার সামনে কায়েমী স্বার্থ, মনুষ্য প্রভুত্ব ব্যবস্থা, সামন্তবাদী মানসিকতা, রাজকীয় বিলাস ব্যসন ও শোষণ প্রক্রিয়ার একটি রাষ্ট্র কাঠামো ভেঙে পড়েছিল।

অনন্য এ বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে যিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ জীবন ধর্ম ইসলাম এবং পুরো ইতিহাস চেতনাকে তাঁর মনন ও অবয়বে সার্থকভাবে ধারণ করতে পেরেছিলেন। বিপুল পান্ডিত্য, প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক-কূটনৈতিক বিচক্ষণতায়, বিস্ময়কর বিপ্লব কৌশলে, সর্বোপরি শিখরস্পর্শী চরিত্র বিভায় তিনি জাতির মধ্যে সেই সংগ্রাম ও ত্যাগের মহিমা ও কৌশলগত দিক নির্দেশনা সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন।

ইতিহাসের গভীরে প্রোথিত চেতনার দুটো উপাদান রয়েছেঃ (১) দ্বীন-ই-ইসলামের পূর্ণাঙ্গ অনুসৃতি। বিশেষ করে ইসলামের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকাকে বৈপ্লবিক ও যথাযথভাবে উপস্থাপন ও মানব চিন্তাপ্রসূত শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থা উপড়ে ফেলার ব্যবস্থাপনা। ইমামের সামনে ছিল রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গণমুক্তির দৃশ্যপট, মানুষের কল্যাণে আল্লাহর বিধানের সাফল্য ও বাস্তবতার নজীর। (২) ইরানের ইসলামী বিপ্লবের বিশ্লেষণের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প বিপ্লব, পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভ্রান্তি-বিচ্যুতিজাত গণ-শোষণ প্রক্রিয়া এবং অন্যদিকে ভিন্ন ধারায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণ অবদমন, বাক স্বাধীনতা হরণ ও শোষণ নির্যাতনের প্রেক্ষিতে মানব কল্যাণের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের ব্যর্থতা ও সমাজতান্ত্রিক অবক্ষয়ের প্রস্তুতি লগ্নে ইরানের ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হয়।

ইতিহাসের মূল থেকে মহান ইমাম আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী তাঁর জাতির জন্য প্রাণরস সংগ্রহ করে আনেন। তিনি গভীর প্রত্যয়ে জানালেন যে, সামগ্রিক ইসলামী বিপ্লব এক অনিবার্য প্রয়োজন। ইরানী জনগণের জন্য তো বটেই, পৃথিবীর সকল নিপীড়িত-বঞ্চিত দেশ-জাতি ও মানবগোষ্ঠীর জন্যও তা অপরিহার্য। সমাজতান্ত্রিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে এটা ছিল আরো বেশী তাৎপর্যপূর্ণ।

এ বিপ্লব শক্তির উৎস হিসাবে গ্রহণ করলো ইসলামের রুহানী জীবন দর্শনকে। কৌশল হিসাবে সুন্নত অনুসরণের অবিচ্ছিন্ন ধারা নিঃস্ব মজলুম মানুষকে এ সংগ্রামের মিছিলে সামনে নিয়ে আসলো। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শ্রমিক কৃষক মেহনতী ও নির্যাতিত নিপীড়িত শোষিত মানুষরাই ইরানের মত সারা পৃথিবীতে মানবজাতির বিরাট অংশ জুড়ে আছে। শোষিত-বঞ্চিত মজলুম জনগণ যখন মহৎ লক্ষ্যে কোন অবস্থানে সংহত হয় এবং তার ঈমানের দীপ্তিতে, আমলের মাহাত্ম্যে

উজ্জ্বল চরিত্রগুলো মন্ডিত হয়, তখন তাদের সাফল্য ছিনিয়ে নেয়ার শক্তি পার্থিব কোন শক্তিধরের থাকে না। প্রবল জনবিপ্লবের উদ্দাম ঝড়ো হাওয়ায় সেখান থেকে পুঁজিবাদের প্রতিভূরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে এ বিপ্লবকে সমকালীন বিশ্বের আধিপত্যবাদী শক্তিগুলোর আওতায় পদদলিত জাতি, গোষ্ঠী ও মানব সম্প্রদায়সমূহের জন্য উজ্জ্বলতম উদাহরণ হিসাবে বিবেচনা করা যায়। মানব জাতির ইতিহাসের এমন এক পর্যায়ে আমরা এসে পৌঁছেছি যখন মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির পরীক্ষা-নিরীক্ষা অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। মানুষের দায়-দাবী ও জাগতিক প্রলোভন-প্রবঞ্চনা সম্পর্কে বিশ্বের মানুষ এখন সাবধানে পদক্ষেপ নিচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের যে কোন দেশে তো বটেই, অমুসলিম জগতের কোন দেশেও গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখন ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে, এই ব্যতিক্রমী বিপ্লবের সাফল্যকে প্রেরণা ও শক্তির উৎস এবং সংগ্রামের স্ট্র্যাটেজীগত অবস্থানকে শ্রেষ্ঠ আলোকবর্তিকা গণ্য করা যেতে পারে।

কুরআন মজীদে বলা হয়েছে "কি হয়েছে তোমাদের, তোমরা জেহাদ করবে না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্যে? যারা ফরিয়াদ করছে, হে আমাদের প্রতিপালক এ জনপদের জালিম অধিবাসীদের হতে আমাদের অন্যত্র নিয়ে যাও, তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের সহায় কর।" (সূরা ৪: নিসা, ৭৫)। উপরোক্ত আয়াত হচ্ছে জালেম তাগুতী শক্তির কবলে পতিত জনপদসমূহের গণমানুষের আর্তনাদে করণীয় সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ্ চান, তাঁর বান্দারা জালেমদের জনপদ থেকে নির্যাতিত মানুষকে রক্ষায় এগিয়ে আসবে, তাদেরকে মুক্ত করবে। ইমাম আয়াতুল্লাহ রুহুল্লা খোমেনী তাঁর সারা জীবনের সাধনায় এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন স্বদেশে; আর এই উদাত্ত আহবান তাঁর জাতির মাধ্যমে পৌঁছে দিয়েছেন পৃথিবীর বঞ্চিত বনি আদমদের দুয়ারে। কর্ম জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর সমস্ত ভাষণ বিবৃতি, বাণী, ওসিয়তনামা ও পত্রাদিতে এবং তাঁর স্ফুলিঙ্গ বিস্তারী ইসলামী ভাষ্যে এ পয়গাম তিনি পেশ করেছেন। মনে হয়, তাঁর জীবনের বহির্জাগতিক এমন কোন বক্তব্য ছিল না, যেখানে সর্বহারা মজলুমের কথা তিনি বলেননি। তিনি তাঁর সকল কর্মকান্ডে এই অসহায় মানবগোষ্ঠীর মুক্তিকে বলিষ্ঠভাবে সমর্থন করেছেন। শুধু সমর্থন নয় তিনি সর্বোচ্চ ঈমানের উজ্জ্বলতম উদাহরণ হিসাবে শক্তিমদমত্ত সাম্রাজ্যবাদকে তাঁর দেশ থেকে উপড়ে ফেলেছেন। বিপ্লবের প্রক্রিয়াও সারা পৃথিবীকে হাতে কলমে শিখিয়ে দিয়েছেন। তিনি একটি মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ ও পটভূমি নির্মাণ করেছেন, যেখানে অবলীলায় এ কাজটি করার ঈমানী বলিষ্ঠতা নির্যাতিত মানব সম্প্রদায়ের মেরুদন্ডে সঞ্চারিত হতে পারে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত একটি ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যবর্তী ব্যবস্থার

পুনঃসূচনার এভাবেই আত্মপ্রকাশ ঘটলো। ঘোষণা ছিলঃ পুঁজিবাদ নয়, পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র নয়, নাস্তিকতাবাদী সমাজতন্ত্র নয়, শিয়া বা সুন্নী নয়, সাদা বা কালো নয়, আরব বা আদম নয়, মানুষের মধ্যে কৃত্রিম কোন ভেদাভেদের প্রাচীর সত্য নয়, সামগ্রিক কল্যাণের একমাত্র ব্যবস্থা ইসলাম। একমাত্র দিক দর্শন হবে কুরআন মজীদ ও রসূল জীবনের আদর্শ 'উসূওয়াতুন হাসানা।

বিপ্লবের প্রেক্ষাপট ঃ ইরানের নির্যাতিত জনগণ

ইসলামে 'ধর্ম' ও 'রাজনীতি'কে ভেতরের বাইরের কায়েমী স্বার্থান্বেষী শোষক মহলে কর্তৃক বিভাজনকে মহান ইমাম প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, "সাম্রাজ্যবাদীরা প্রায় তিন শতাব্দী পূর্বে এই কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছিল। তারা এ কাজ চয়ন করেছিল শূন্য থেকে।' ..... 'আমরাও এখন ঠিক সেই শূন্য থেকেই শুরু করবো।' 'ইসলামে ধর্ম রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন বা ভিন্ন–আমাদের যুবকদের মনে বদ্ধমূল এই ভুল ধারণাকে তোমরা ধূলিসাৎ করে দাও, মিথ্যা বানিয়ে দাও। ওরাতো চায় ওদের জুলুম শোষণ ও লুটপাটের একচ্ছত্র রাজত্বের বিরুদ্ধে তোমরা যেন প্রতিবাদী হয়ে না ওঠো। তা হলেই তো ওরা খালি ময়দান পেয়ে যায়, যা ইচ্ছা তাই করতে পারে এবং কোনরূপ বাধা প্রতিবন্ধকতা সত্বাই দু'হাতে দু'পায়ে তোমাদের সব ধনসম্পদ নিঃশেষে লুটেপুটে নিতে পারে।'

রেজা শাহর রাজতন্ত্র ইরানী অর্থনীতিকে পরনির্ভরশীল, পঙ্গু ও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছিল। শোষণ ও অত্যাচারের ফলে জমে উঠেছিল অবৈধ সম্পদের পাহাড়। ইরানের তেল সম্পদের লভ্যাংশ ছিল পুঁজিবাদী তেল কোম্পানীর হাতে। ইরানের তামাক ব্যবসা ছিল পরকুক্ষিগত।

১৮৯২ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত ইরানী জনগণ সাম্রাজ্যবাদ ও রাজতন্ত্র বিরোধী সংগ্রামে নিয়োজিত ছিল। ১৯২২–এ কোম নগরে ইসলামী ধর্মতত্ত্ব কেন্দ্রকে মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইমাম রেজা (রহঃ) আশা করেছিলেন, 'পরবর্তীকালে কোমে জ্ঞানের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটাবে এবং যেখান থেকে তা ইরান ও ইসলামী বিশ্বের গঠন ছড়িয়ে পড়বে।'

ইরান থেকে বহিষ্কারের আগেই এই কোমে ইমাম খোমেনী তাঁর অনুসারীদের এক সুমহান বিপ্লবের লক্ষ্যে গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর আদর্শের অনুগত এ শিক্ষক–ছাত্ররাই ইরানসহ সারাবিশ্বে নির্যাতিত শোষিত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে বিপ্লব ও বিপ্লব অনুসারী কর্মকান্ডের নৈতিক প্রেক্ষাপট রচনায় কাজ করছেন। 'ধর্ম হচ্ছে বিপ্লবের প্রকৃত স্রষ্টা' এ বিশ্বাসে ইমাম খোমেনী অটল ছিলেন। এ বিশ্বাসে তাঁর অনুসারীদের তিনি অত্যন্ত সচেতন করে তুলেছিলেন। এজন্য শহর থেকে বিপ্লব বা 'শাহ

ও জনতার বিপ্লব'– এ জাতীয় ধুয়ায় তাঁরা বিভ্রান্ত হননি। নির্যাতিত জনগণের যে কোন বিপ্লবী তৎপরতাকে ব্যাহত করা ও অসম্ভব করে তোলার লক্ষ্যে ধোঁকাবাজী প্রচেষ্টা ইসলামের নেতৃত্বে জন–প্রতিকূলতার মুখ থুবড়ে মড়লো। তিনি জনগণকে আহবান জানালেন, 'আপনারা শাসকগোষ্ঠীর বেঈমানী কার্যকলাপ রুখে দাঁড়ান এবং চরম পরীক্ষার ভয়েও ভীত হবেন না। সরকার যদি শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলেও নতি স্বীকার করবেন না।'

১৯৬৩ এর ২২ মার্চ মাদ্রাসা ফয়জিয়ায় ঘটলো শাহের অনুচরদের অকথ্য নির্যাতনের ঘটনা। পরবর্তীতে তেহরান ও কোমের গণহত্যা প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিলের ধারায় গণসংহতি সৃষ্টি করে গেলো। তুরস্কে ও ইরাকে ইমামের নির্বাসন বিলাপের রক্তাক্ত পথকে গণঅভ্যুত্থানের লক্ষ্যে সংহত করে চললো।

ইরানের রাজতন্ত্রের ২৫০০তম বার্ষিকী উপলক্ষে ইরাক থেকে প্রেরিত এক বাণীতে ইমাম বলেন, 'মজলুম জনগণের দুঃখ–দুর্দশা দেখার জন্য বাঁচার চাইতে আমার মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়। বঞ্চিত জনগণ উপোস করছে, অথচ শাহী শান–শওকত ও উৎসবের জন্য শুধুমাত্র তেহরানে ৮০ কোটি রিয়াল বরাদ্দ করা হয়েছে। মৃতদের জন্য তোমরা উৎসব কর; কিন্তু জীবিতদের অবজ্ঞা কর। শাসক গোষ্ঠী জনগণের তহবিল লুটপাট করছে এবং জাতীয় সম্পদের উৎস বিদেশীদের ভোগ ব্যবহার করার সুযোগ দিচ্ছে।' শাহের নবগঠিত 'রাস্তখীজ' পার্টি সম্পর্কে খোমেনী বলেন 'এ দলে কারো যোগ দেয়া উচিত নয়। এতে যোগদানকারী ব্যক্তি জালিমের সাহায্যকারী এবং মজলুমের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলে বিবেচিত হবে।'

১৯৭৮ সালের মুহররম মাসে প্রচন্ড বিক্ষোভে ইরান ফেটে পড়ে। ইমাম তাঁর বাণীতে তরবারীর উপরে বিজয়ের মাস ঘোষণা করেন। লাখ লাখ মানুষের মিছিল সংঘটিত হয়। 'শাহ ইয়াদ' মীনারে মিছিল সমাপ্ত হয়। ৫০ থেকে ৬০ লাখ মানুষের মিছিল ইসলামী বিপ্লবের বিজয় আসন্ন করে তোলে। উপনিবেশবাদের অবসান দাবী করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৭৯ সালের ১৯ জানুয়ারী তেহরানের মিছিল থেকে ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ গঠন ও গণভোটের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য প্রস্তাব ঘোষিত হলো। ১৯৭৯ এর ১লা ফেব্রুয়ারী ফ্রান্সের নির্বাসন জীবনের ইতি ঘটিয়ে নির্যাতিত মানুষের বিপ্লবী নেতা খোমেনী (রহঃ) স্বদেশে ফিরে এলেন। ১৫ বছর পর স্বদেশে মেহরাবাদ বিমান বন্দরে ষাট লাখ লোক তাঁকে স্বাগত জানায়। বেহেশতে জাহরায় ভাষণে তিনি পুরো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের আহবান জানালেন। তেঙেপড়া কৃষক তথা সার্বিক জাতীয় অর্থনীতি ও তেল সম্পদের পুঁজিবাদী করায়ত্তকরণের প্রেক্ষিতে ইমাম–সরকার নিরপেক্ষ ঘোষণা দিলেন। ১০ ফেব্রুয়ারী সামরিক আইন প্রত্যাখ্যানের আহবান ও বহুসংখ্যক শাহাদাতের মধ্যদিয়ে বখতিয়ারে প্রস্থান। শাহের পতন। ১১ই

ফেব্রুয়ারী ইরানে ইসলামী বিপ্লবের সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ ঘটলো। ৩০শে মার্চের গণভোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৯৮-২% জনগণের ম্যান্ডেটে ১লা এপ্রিল ইরানে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা বহুশতাব্দীর পর একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলো। সংবিধান প্রণয়ন, ইমাম ও মজলিসের নির্বাচন ও উদ্বোধন সম্পন্ন হলো। এ উপলক্ষে ইমাম তাঁর বাণীতে বলেন, 'আমরা দেখতে চাই আপনারা এই বঞ্চিত জাতির জন্য কি করেন, যে জাতি তার সংগ্রামের দ্বারা আমাদেরকে সমস্ত শিকল থেকে মুক্ত করেছে।' তিনি আরো বলেন, 'আমরা আশা করি, দেশের যারা বঞ্চিত ও দরিদ্র শ্রেণী', যারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, তাদের অবস্থার অনুসন্ধান করে এই বঞ্চিত দরিদ্র শ্রেণীর উন্নতি বিধানকল্পে আন্তরিক ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করবেন এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দেবেন।'

বিপ্লবের ফসল : অভ্যন্তরীণ

বিপ্লবের পর ইমাম খোমেনী জনগণের সম্পদ আত্মসাৎকারীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করে জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত করেন। প্রতিষ্ঠা করা হয় মুস্তাজ আফীন ফাউন্ডেশন। অসৎ ও দুর্নীতিবাজ পুঁজিবাদীদের সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মুস্তাজআফীন ফাউন্ডেশনের অর্থ দেশের অবহেলিত নির্যাতিত লোকজনের কল্যাণে ব্যয় করা হয়।

এই প্রতীকী কাজটির পাশাপাশি আর্থ-সামাজিকভাবে পশ্চাদপদ জনগণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া হয়। ইমামের নির্দেশে শ্রমিকদের কর্মসময় কমানো ও বেতন বৃদ্ধি করা হয়। ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ পর্যন্ত জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট হয় যে, সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে প্রচুর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ভোগ-বিলাস কেন্দ্রিক অর্থনীতি শোষিত মানুষের মৌলিক প্রয়োজন যোগান দেয়া ও উন্নয়নের জন্য সম্পদ সংগ্রহের অর্থনীতিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এর নীতি হচ্ছে প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ, সম্পদ সঞ্চয়ের প্রবণতা রোধ ও মুনাফা অর্জনের মোহমুক্তি। অর্থনীতি সুদ ও জুয়ার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছে। শোষণের ছিদ্রগুলো বন্ধ করা হয়েছে। সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত হয়েছে। অপচয় রোধ করা হয়েছে। বিলাস দ্রব্যের উৎপাদন ও আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। অন্যতম প্রধান তেল রফতানীকারী দেশ ইরানের অশোধিত তেলের রফতানী কঠোরভাবে দেশের মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যেই সীমিত রাখা হয়েছে।

শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতি ও শিক্ষার ইসলামীকরণে বৈপ্লবিক কর্মকান্ড সম্পন্ন হয়েছে। কৃষিপ্রধান দেশ ইরানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকটা কৃষি উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। এ ছাড়া খনিজ সম্পদ, মৎস চাষ, পশুপালন, হস্তশিল্প ও শিল্পকারখানা উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখা হয়েছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি চর্চা ও

বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ চলছে। এভাবে বঞ্চিত জনগণের বুকে আশার সঞ্চার করা হয়েছে।

বিপ্লব ঃ নির্যাতিত মানুষের জন্য ইমামের আহবান ও আন্তর্জাতিক ভূমিকা

আয়াতুল্লাহ খোমেনী ঘোষণা করেন, 'পৃথিবীর যেখানেই জালিমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সেখানেই আমরা আছি।' তিনি জানান, 'আমরা বিশ্ব ইহুদীবাদ ও কম্যুনিজমের পচা বিষমূল সমূহকে জ্বালিয়ে দিতে চাই। আমরা আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহ ও করুণায় ইহুদীবাদ, পুঁজিবাদ ও কম্যুনিজমের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থাকে নাস্তানাবুদ করে দেবো এবং রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)–এর ইসলামকে বিশ্ব সমাজে ছড়িয়ে দেবো। আজকের ধনী মুসলিমরা তা একদিন দেখতে পাবে।' জাতিসংঘের ভেটো–ক্ষমতা বাতিলের আহবান জানান তিনি এবং মুসলিম বিশ্বের ধনী দেশগুলোর সম্পদ গরীব দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিনিয়োগের আহবান জানান।

পোপের চিঠির জবাবে খোমেনী বলেনঃ 'আমি দুনিয়ার সকল নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের জন্য দোয়া করি যেন শীঘ্রই জালিমের হাত থেকে মুক্তিলাভ করে।'"

১৯৮২ সালে ২ জুলাই আয়াতুল্লাহ্ সাদুকীর শাহাদতে শোকবাণীতে ইমাম বলেনঃ 'যে বিপ্লব খোদার জন্য, তাঁর দীনের খাতিরে করা হয়, যে বিপ্লব নির্বাচিত মানুষের মুক্তির জন্য এবং যে বিপ্লব বিশ্বগ্রাসী শক্তি ও উদ্ধত দাম্ভিকের হাত বিচ্ছিন্ন করার জন্য করা হয়, সে বিপ্লবের জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করা এবং জিহাদে কুরবাণী দেয়া অপরিহার্য।'

১৯৮৮ সালে সেপ্টেম্বরে আল্লামা আরিফ হোসেন হুসাইনীর শাহাদতে বলেন, 'দুর্দশাগ্রস্ত মানুষেরা যারা বঞ্চিত ও নগ্ন সকলের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে প্রতিকূলতার মোকাবেলা করার জন্য জিহাদে জান কুরবান করার শপথ নিয়েছে, তাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে একটা মাত্র চ্যালেঞ্জের শুরু। উপনিবেশবাদী প্রতিবন্ধকতা গুঁড়িয়ে দিতে, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের বিষক্রিয়াকে উৎপাটিত করতে মুহাম্মদ (সঃ)–এর খাঁটি ইসলামে পৌছতে এখনো দীর্ঘপথ অতিক্রম করার প্রয়োজন রয়েছে।'

পবিত্র হজ্জ উপলক্ষে বাণীতে তিনি আহবান জানানঃ 'মুসলমানদের জন্য প্রকৃত আনন্দ ও খুশীর দিন হবে সেদিন যেদিন সমগ্র দুনিয়ার মুসলমান ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ আলেমদের আহবানে সারা দুনিয়ায় জেগে উঠবে এবং বিশ্বব্যাপী অত্যাচারী ও শোষকদের নিপীড়নমূলক শাসন থেকে নিজেদের মুক্ত করার লক্ষ্যে এক দুর্বার অভিযান শুরু করবে।'

তিনি বলেন, 'জনগণের কল্যাণের জন্য সবচাইতে বড় কাজ হচ্ছে বিশ্বের অত্যাচারিত ও বহিশত্রুর আক্রমণের শিকার দেশগুলো থেকে শোষকের হাত কেটে দেয়া। আজ হোক কাল হোক শিকলবদ্ধ জাতিসমূহ তা প্রত্যক্ষ করবে।'

'আমাদের ইসলামী বিপ্লব বিশ্ব লুটেরাদের জন্য যে কূলকিনারাহীন বরজখ (কবরদেশ) তৈরী করেছে, তাতে বিশ্বের মুসলমানগণ ও সমগ্র বিশ্বের বঞ্চিত সর্বহারাগণ আজাদীর গৌরব অনুভব করুক।'

১৯৭৯, ৯ মাহে রমজানে প্রথম কুদস দিবসে ইমাম বলেন, 'আমি আল্লাহ্‌র কাছে ফিলিস্তিন, দক্ষিণ লেবানন এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে অত্যাচারী, শোষকের হাত থেকে মুসলমানদের মুক্তি কামনা করছি।'

১৯৮০-এর মে দিবসের বাণীতে ইমাম বলেন, 'শ্রমিক দিবস বৃহৎ শক্তিগুলোর আধিপত্যকে কবর দেয়ার দিন। বিশ্বের মজলুম জনতাকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে।'

আয়াতুল্লাহ খোমেনীর অসিয়তনামাতে মজলুম মানুষের কথা বলা হয়েছেঃ

'দুই পরাশক্তি অধঃস্তন মজলুম জাতিসমূহকে সবদিক থেকে পদানত রাখতে চায়।' পরবর্তী নেতার প্রতি এতে রয়েছে উপদেশঃ 'তাঁরা যেন ইসলাম, ইসলামী প্রজাতন্ত্র এবং বঞ্চিত ও নির্যাতিত জনগণের খেদমতে নিজেদেরকে ওয়াকফ করে দেন।'

পুঁজিবাদ সম্পর্কে ইমাম বলেনঃ 'ইসলাম অত্যাচারপূর্ণ অগাধ ও বল্গাহীনভাবে সম্পদ পুঞ্জীভূতকারী এবং মজলুম নিপীড়িত জনতাকে বঞ্চনার কবলে নিয়োগকারী পুঁজিবাদের সমর্থক নয়, বরং একে সামাজিক সুবিচারের পরিপন্থী বলে গণ্য করা হয়েছে।

'আর এটা ইসলামসম্মত নয় যে, কেউ গৃহহীন থাকবে, আর কেউ অনেক ধনরত্নের মালিক হবে।' তিনি আহবান জানালেনঃ 'হে বিশ্বের নির্যাতিত জনগণ, হে মুসলিম দেশসমূহ, হে বিশ্বের মুসলমান। উঠে দাঁড়ান।'

আফগানিস্তানে সোভিয়েত রাশিয়ার আগ্রাসন সম্পর্কে ইমামের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াঃ 'তোমরা মারাত্মক ভুল করলে এ কাজে তোমরা কোন সাফল্যই অর্জন করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে একদিন এ ভুলের কথা বুঝতে পারবে।'

ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির মূলসূত্র হলো, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের কারো আধিপত্য বা খবরদারী নাকচ করে দেয়, আধিপত্য চাপিয়ে দেয়াকে একইভাবে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করেছে। ইমামের ইরান এ নীতিতে বলিষ্ঠ বিশ্বাসী এবং এ দিক নির্দেশনাকে তারা আজো যথাযথ মর্যাদায় অনুসরণ করে যাচ্ছে। বঞ্চিত জাতিসমূহকে সাহায্য করা ও পরাশক্তিবর্গের বিরুদ্ধে তাদের স্বাধীনতার এবং সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রামে সহযোগিতা করা।

ইমাম তাঁর কূটনৈতিক প্রজ্ঞাবলে সেন্টো সামরিক জোট থেকে ইরানের সদস্যপদ

প্রত্যাহার করে নেন। ১৯৫৯ সালের আমেরিকার সাথে সামরিক চুক্তিও বাতিল করা হয়। আনোয়ার সাদাতের 'ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির নিন্দা করছে; পুঁজিবাদী সরকারসমূহের সাথে সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন, ফিলিস্তিনি মুক্তি আন্দোলনকে স্বীকৃতি, ইরানী দূতাবাসে ফিলিস্তিনী দূতাবাসের অনুমতি দান করেছে।

ইসলামী পররাষ্ট্রনীতির বলে ইরান তার ঘোষিত নীতি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা আজো রেখে চলেছে।

আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, আলজেরিয়া, লেবানন, ফিলিস্তিন, ভারত, আরাকান, ফিলিপাইন ও বোসনিয়া-হার্জেগোভিনাসহ নির্যাতনের এলাকা ও নির্যাতিত জনগণের নিরাপত্তার প্রশ্নে ইরান আন্তর্জাতিক মঞ্চে জাতিসংঘ, ও আই সি, জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন এবং দ্বিপাক্ষিক বা পাক্ষিক পর্যায়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা ও নৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাহায্য-সহযোগিতা ও কূটনৈতিক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

বিগত কয়েক বছরে ইমামের অনির্বাণ আদর্শ নিপীড়িত জাতিসমূহের উদ্ধারের লক্ষ্য থেকে ইরান নড়েনি; পিছনেও সরে আসেনি; আগামী বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য এ অনন্য বিপ্লবের স্থপতিরা মুক্তিকামী মানুষের কাছে একরাশ স্বপ্ন ও বাস্তবতার নদীর স্থাপন করতে পেরেছেন। পুঁজিবাদ ইতিহাসের ধারাবাহিকতার অনেক আগেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তার উপর স্থাপিত সাম্রাজ্যবাদের বিপর্যয় কালের অগ্রগতির ব্যাপার। আর সমাজতান্ত্রিক সম্প্রসারণবাদের প্রচন্ড বিপর্যয়ের পর বিকল্প যে নেতৃত্বের জন্য পৃথিবীর বঞ্চিত মানুষ অপেক্ষমান তার একটি ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, যেখান থেকে শত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মধ্যে মানুষের মুক্তির অভিযান সক্রিয় থাকবে বলে বিশ্বাস করার ভিত্তি সুদৃঢ়।

মূল্যায়ন ঃ মজলুম মানবতা

সমকালের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নির্যাতিত গণমানুষের মুক্তির দিক-নির্দেশক ইমাম আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী (রহঃ)-এর ইন্তেকালের খবর সারাবিশ্বে বেদনা-মথিত প্রতিক্রিয়ার স্বতঃস্ফূর্ত ও অব্যাহত প্রবাহ সৃষ্টি করে। আশ্চর্যের ব্যাপার, যে মনীষী তাঁর সমগ্র জীবন বাতিল প্রতিক্রিয়াশীল শাসক-শোষক ও গণধিকৃত সরকার ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জ্বালাময় বক্তব্য পেশ করেছেন, তাদের অস্তিত্বের ভিত্তিমূল ধরে নাড়া দিয়েছেন, তাদের কায়েমী স্বার্থবাদী মুখোশ উন্মোচন করেছেন অবলীলায় এবং যে কর্মকান্ডের জন্য তিনি আমরণ অপপ্রচার ও অপমূল্যায়নের শিকার হয়েছেন, বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন; হত্যা চক্রান্তের লক্ষ্য হয়েছেন, সেই ব্যক্তিত্বের বিদায়ে যখন ইরানের কৃতজ্ঞচিত্ত মানুষের কাফেলা কোটি কোটি আর্তনাদের মর্সিয়ায় রূপ নিলো; তখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁর মূল্যায়নও বিস্ময়কর ইতিহাসে পরিণত হলো। দেখা গেলো, শ্রদ্ধা সমর্পণের সেই প্রতিযোগিতায় তাঁর চিরকালের শত্রুভাবাপন্নদের মঞ্চ থেকে তাঁর অমর রুহের প্রতি

পুষ্পবর্ষণ করা হলো।

জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সকল প্রতিষ্ঠান, দেশ, জাতি, সরকার, ব্যক্তিত্ব, পত্র পত্রিকায় উচ্ছসিতভাবে নির্যাতিত মানুষের জন্য তাঁর অনন্য বিপ্লবী নেতৃত্বের ভূমিকা মূল্যায়ন করা হলো। প্রশংসার সর্বোচ্চ ভাষা ব্যবহার করা হলো। এসবের প্রতি ক্ষণিক দৃষ্টিপাত করলেই নির্যাতিত মানুষের জন্য যথার্থ নেতার জীবনব্যাপী সংগ্রামের একটি ধারণা লাভ করা যায়। কোন নেতার প্রতি এ মূল্যায়নের নজরানা নিঃসন্দেহে তিনি এবং তাঁর সংগ্রামী জাতির জন্য গৌরবের শিরোভূষণ। লক্ষ্য করার ব্যাপার, তাঁকে জীবনকালে যারা শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন, তাঁরা তো বটেই; যারা তাঁর ভূমিকাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন না করার অপরাধ থেকে রেহাই পাবার মানসে হোক বা নিছক সরব দৃষ্টিলাভে হোক; তাঁরা এগিয়ে এসেছেন তাঁর বিদায়কালে উচ্ছসিত ভাষায় সম্মানের ফুলডালি নিয়ে। এ অর্জন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বির উপর ইমামের শ্রেষ্ঠ বিজয়ের আরেকটি দিক। এ ঘটনা বলে দিচ্ছে, মহাকালের গতিধারায় তাঁর অমর ব্যক্তিত্ব মানবজাতির হৃদয়ের মর্মমূলে পবিত্র অবস্থান নিয়েছে। নিছক আবেগ উৎসরণে নয়; ইতিহাসের নবতর গতিনির্ধারণ ও সংস্কারের প্রবলতম শক্তিমত্তায়।

শেষকথা

ইমাম খোমেনী (রেহঃ) সম্পর্কে আলোচনায় যে বিষয়টি আমার কাছে বর্তমান বিশ্বে একক উদাহরণ হিসাবে নাড়া দেয়, স্পন্দিত ও উদ্বুদ্ধ করে এবং অবাক বিস্ময়ে এই মহান নেতার শীর্ষচারী ব্যক্তিত্বের দিকে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য করে; তা মজলুম মানুষের প্রতি তাঁর দরদ ও ভালবাসা; সুন্নতে নববীর অনুসরণ ও প্রয়োগে বিপ্লবের পটভূমি রচনা ও বিপ্লব সম্পন্নকরণ ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এ সংগ্রামী ধারা অব্যাহত রাখার প্রক্রিয়া সৃষ্টি। মানবজাতির জন্য এটি তাঁর মহান উপহার। অনাগতকালের ইতিহাসের গতিধারা নির্ধারণে এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

Imam Khomeine (R) : His contribution in revival of true Islam

Masood Nizamy

Hazrat Imam Ayatullah Sayyid Ruhullah Al-Mussavi Al-Khomeini (R) was a towering personality of the current Century. He is regarded as the most successful leader and founder of a powerful Islamic nation in the modern world. He created a remarkable evidence by overthrowing the 2500-year Pahlavi regime monarchy.

Imam Khomeini (R) was distinct from contemporary traditional Ulema. He was a teacher, a philosopher, a guide, a very good organiser, a brave leader and above all a great personality in all respects. This personality is the pride not only for Iran but also for the whole Islamic Ummah. He struggled for salvation of the oppressed humanity irrespective of cast, creed and colour instead of being polluted by regionalism or narrow chauvinism.

After completing his brilliant student life Imam Khomeinie (R) started his career as a professar of philosophy at the age of 27 years. As a teacher and philosopher he cautiously observed the happenings of his motherland, Iran since 1941. In the year 1962 the shah regime abrogated an Islamic provision of the constitution that made it mandetory for parliament members to swear as people's representative keeping hands on the holy book. Imam Khomeinie (R) protested this action of the regime vehemently and as such the Shah and his government took the Imam as their bitter enemey. The Imam was arrested by the regime on June 5, 1963 resulting in strong demonstrations and protests all over the country. At least 15 thousand people became shahid

---

Writer : Journalist, Special Correspondent, Daily Inqilab

(martyr) in Tehran at that time. It resembled 'fire in the honey' and hundreds and thousands of people came out in the streets to demand immediate release of their beloved leader Imam Ayatullah Ruhullah Khomeinie (R).

The Imam was again arrested on 4 November, 1964 because of this bold step against the anti-people activities of the autocrat Shah. He was banished in Turkey. Later he was forced to leve Turkey far Iraq from where he was compelled to accept self-exile in France. He was in Paris, the capital of France from where he successfully gave leadership to his countrymen in the struggle against oppression and repression of the Shah. The most valuable harvest of his long struggle is the Islamic revolution in Iran on 11 February, 1979.

Imam Khomenie (R) returned from Paris to his own country on the 1st day of February, 1979. About six million people were present at the Mehrabad airport to greet the greet leader. At that time at the Mehrabad airport to great the great Leader.

The Imam returned to his country without any permission of the Shah or his last Prime minister Shapur Bakhtiar. There was deep-rooted conspiracy to kill the Imam at the airport just after his return. Imam's followers in the Air Force got this information earlier and they communicated the message to the Imam. But the Imam did not change his decision and he returned to his homeland accompanied by his 50 advisors and 150 journalists.

Soon after the glorious come-back of the Imam the shah and his allies fled the country leaving all and everything. The Imam at first went to the 'Beheste Jahra'- a graveyard of shahids who laid down their lives for the salvation of the oppressed poeople of the country. Imam delivered a very touchy speech in front of tens of thousands of People inspirty them to continue struggle till the cherished goal is achieved. He said, 'I have nothing to give due thanks to this proud nation who sacrificed their kith and kin for satisfaction of the almighty and omnipotent Allah.

When revolution takes place in a country the total structure of administration, defence, etc, become shattered and fragile. At such an opportunity the super-powers generally try to pose their noses into the internal affairs of that country. They come forward with ulterior motive 'to help' the people of that country. Soviet union offered such 'help and co-operation' to the Islamic Repuplic of Iran twice and the Imam boldly rejected the motivated offer. So the super-power and its agents were hostile and they hatched multiple conspiracies agent Imam Khomeni (R) and the Islamic Republic. Country-revolutionary activities like espionage and sabotage started in the country by pro-American liberals and pro-Soviet communists. They killed 72 pious leading personalities who were very close associates of the Imam. They killed a renowned Islamie thinker Ayatullal Motahari, a leading religious leader Ayatullah Talekani and Chief Justice Ayatullah Beheshti. Another bomb explosion claimed the lives of President Mohammad Ali Rajai and Prime Minister Dr. Javed Bahonar. Attempts were also made to kill Hazrat Imam Khomeni (R) and the present leader Ayatullah Ali Khamenei. Besides these, the imperialist USA imposed economic sanctions against Iran and confiscated all Iranian properties deposited in American Banks.

Imam Khomeini (R) faced the situation very cautiously and strongly. He managed to unveil the enemies of revolution to the nation and the world. As such they were identified and people rejected and hated them. The Imam remained firm like the hill on his principle despite murderous instinct of the imperialist looters and their collaborators. He was never ready to bow-down to anybody except the almighty Allah. He withdrew membership of Iranfrom the CENTO military pact just to cecede relation with imperialism. He unilaterally cancelled the insolent pact with USA which was signed by the shah in 1951. He strongly criticised the camp david pact signed between Egypt and Israil defying the sentiment of the muslim world. Iran became the member of the non-aligned movement and severed relation with the pro-American

sattelite rulers and goverments at the instructions of the great leader Ayatullah Khomeni (R). At the same time the Ayatullah directed to take action against the soviet and american diplomats engaged in espionage and conspiracy against the newly established Islamic government.

Imam Khomeini (R) launched many courageous steps. The pronouncement of death sentence to the Murtad writer Salman Rushdie is one of them. Wrote a book named 'Satanic Verses' in which he criticised Islam, Prophet Muhammad (SM), other prophets and many devoted sahabis and scholars of the Islamic era. It was an unpardonable offence. Rushdie got inspiration and courage to commit the offence as he is backed and patronised by christian, Jewish and imperialist cliques who are always communal and hostile to Islam.

The Imam gave the decision of death sentence to Salman Rushdie and others who are linked with publication of the controversial book. In a statement the Imam urged all the muslims of the world to schoulder the responsibilities of implementing the death sentence. The death sentence was declard in February, 1989 and since that time Rushdie is still hiding in the western countries for life. so-called humanists and liberal democrats try to criticise this bold action though the Murtad writer Rushdie has so far been bitterly condemned by all the sensible humanist intellectuals of the world for his most heinous and ugly deeds. Some christian politicians and religious leaders have also criticised Rushdie's notorious act. Cardinal Joseph Glemp accused Salman Rushdie and said, "This book (Satanic Verses) has been written in such a manner that religious sanctity has been dishonoured."

Communists in Iran had always dreamt of assuming Power after the fall of the shah. But things were quite different. So the agrieved communists were engaged in several conspiracies to overthrow the Islamic government. Ultimately all their ill-attempts went in vain.

American Embassy in Tehran, at that crucial moment,

was identified as the main spyiny-centre against the revolution. Iranian students surrounded the embassy and arrested some spys. In retaliation USA imposed economic sanctions against Iran.

On 25th April, 1980 America launched direct attack on Iran with a large number of soldiers, planes and heavy weapons. It was quite a miracle that the American agression failed totally and they had to flee after heavy casualities due to divine punishment. This incident reminds the modern world of how the mighty forces of Abraha was crushed when they came from yemen to attack the holy al-Qaba Sharif.

After the failure of series of attacks and conspiracies the imperialist cliques hatched a new design and accordingly they instigated and used Saddam Hossain of Iraq to launch military agression on the neibouring brotherly country Iran. Iraq did not hesitate to launch attack on Iran and the western imperialit allies alongwith other reactionary forces extended support ot Saddam Hossain of Iraq. They helped Iraq with money and weapons. At that crucial juncture the international organizations played almost a silent role. This unhappy war continued for long eight years. But the heinous conspiracies and attampts to destroy Iran failed again and again.

Imam Ayatullah Khomeini (R) believed that imperialism is the real and main enemy of mankind and civilisation. Since Communism is an ideology it is not as harmful and dangerous as the imperialism is. Time will come soon when the followers of communism will realise the worthlessness and hollowness of their doctrine and then they will not hesitate to give up the false and wrong ideas. On the other hand, the imperialists eat-up even the soul of the people though they pretend to show themselves as the champions of human rights and democracy. It has been observed that the only imperialist super power in the present unipolar world, USA, has established regional and global terrorism in many parts of the world. they attacked Libya and Iraq and conspired to

overthrow prime minister, Miah Nawaz sharif's government in Pakistan. They have built-up multiple designs to halt Islamic revival all over the world. They have made UNO captive in their hands. They are now playing a very fishy game about the fate of the Bosniam muslims.

Leader of the Islamic revolution Imam Ayatullah Khomeini (R) sent a historic message to the then Soviet president Mikhael Gorbachev on 4 January, 1989 requesting him to realise the actual problem of their futile 'fight' against Allah and return to the true path. Imam's message was very clear and there was no ambiguity in his approach to Gorbachev to embrace Islam. Such a direct approach to the head of state of a super-power is obviously a manifestation of great personality and boldness.

Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini (R), the great leader and pioneer of Islamic renaissance in the modern world, is no more today. But his creation, the Islamic Republic of Iran is still in existence as the symbol of supremacy and greatness of Islam. The Islamic revolution in Iran is a eyeopener to the Muslims world over history of the contemporary. The opressed muslims, may the repressed humanity, will continue to receive inspiration from the struggling life of this towering revolutionary for ever.

প্রকৃত ইসলামের উপস্থাপন ও জাতিসমূহের উত্থানে ইমাম খোমেনী (রঃ)—এর ভূমিকা

আজিজুল হক বান্না

বস্তুত ইসলাম এক ও অবিভাজ্য, শাশ্বত, চিরন্তন। সুতরাং ইসলাম নিজেই স্ব-ব্যাখ্যাত Self Explanatory। ইসলাম যেহেতু পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর সমাহার, সে কারণে ইসলামের বহুমাত্রিক কোন ব্যাখ্যা নেই। তা সত্ত্বেও ব্যবহারিক তারতম্য, ঔপনিবেশিক শিক্ষা, ফরমায়েশী আলেমদের ব্যাখ্যা এবং রাজতান্ত্রিক ধারা-ভাষ্য ইসলামের ভিন্ন ব্যাখ্যা দিচ্ছে।

সাধারণভাবে মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকলের কাছেই ইসলামের একটি পরিচয় বিধৃত রয়েছে। আর তা হচ্ছে, ইসলামের আটপৌরে, প্রচলিত পরিচয়। ইসলাম বিজয়ী রাষ্ট্রশক্তির অবস্থান থেকে স্থানচ্যুত হবার পর থেকে সত্যিকার ইসলামের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ মানবজাতি পায়নি বলেই 'প্রকৃত' ইসলামের উপস্থাপনে ইমাম খোমেনীর ভূমিকাটি একটি বিশেষ মাত্রায় ও গুরুত্বে বিশ্লেষিত, আলোচিত হবার দাবী রাখে। উপরন্তু "জাতিসমূহের উত্থানে ইমামের ভূমিকা"র প্রসঙ্গটি ইমামের প্রভাবের ব্যাপ্তিকে নির্দেশ করে। শুধু তাই নয়, ইরান ও ইসলামী বিশ্ব ছাড়াও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানবজাতির অপরাপর বৃহত্তর অংশের উত্থানে ইমামের বিশ্ব কাঁপানো ভূমিকাটিও একই পরিসরে আলোচনার দাবী রাখে। "প্রকৃত ইসলামের উত্থান" প্রসঙ্গে যখন আমরা কথা বলি, তখন ইসলামের সত্যিকার ভাবধারা বা Spirit-কেই প্রাধান্য দিতে হয়। ইসলামের কালেমাই মূলতঃ একটি স্ব-ব্যাখ্যাত 'বিপ্লব'। দুনিয়ার শক্তিসমূহের সব ধরনের প্রভুত্ব-মালিকানা-আধিপত্য-আনুগত্যের মালিকানাকে কর্মে-চেতনায় অস্বীকার করে একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার যে ঘোষণা তার চেয়ে ব্যাপক বিপ্লব আর কিছু হতে পারে না। তাই ইমাম খোমেনী ইসলামী বিপ্লব সাধন করে নতুন কোন পরিভাষার সাথে ইসলামের অভিনব সংযোগ ঘটাননি। ইসলাম নিজেই বিপ্লবের ঘোষণা। ঠিক একইভাবে ইমাম খোমেনী ইসলামের সাথে রাজনীতিরও কোন খেয়ালী মিশ্রণ ঘটাননি। রাজনীতির সাথে 'সার্বভৌমত্ব' শব্দটি সম্পৃক্ত। আর ইসলামের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হচ্ছে, সার্বভৌমত্বের মালিকও হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। আর মানুষের জন্য বিধান দানের অধিকারও

লেখকঃ সাংবাদিক, কলামিষ্ট, সহকারী সম্পাদক দৈনিক মিল্লাত

একমাত্র আল্লাহর। সুতরাং অতি প্রাসঙ্গিক ও অনিবার্যভাবেই ইসলাম ও রাজনীতি এক ও অভিন্ন হতে বাধ্য। ইসলাম যেমন বিপ্লবকে ধারণ করে, তেমনি রাজনীতিকেও আত্মস্থ করে। এ অর্থেই ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইমাম খোমেনী সেই পূর্ণাঙ্গ ইসলামেরই নবরূপায়ণকারী।

শুরুতেই বলে নেয়া ভালো যে, ইমাম আয়াতুল্লাহ রূহুল্লাহ খোমেনী কোন নতুন মতবাদ ভিত্তিক বিপ্লবের রূপকার নন। কেননা, কোরানিক বাধ্যবাধকতার কারণে ইসলামে কোন সংযোজন বা বিয়োজনের অবকাশ নেই। সঠিক অর্থে তিনি ইসলামী বিপ্লবেরই পুনরুজ্জীবন দানকারী একটি প্রতিষ্ঠান। বিপ্লবের নীতি, গতিপ্রকৃতি ও পদ্ধতি নির্ধারণে, বিপ্লব সংরক্ষণে এবং জনগণের বিজয়কে একটি সুনির্দিষ্ট বিপ্লবী রাষ্ট্রসত্তায় সংহত করার ক্ষেত্রে তিনি বিস্ময়কর সাফল্য আনয়নকারী এক মহান ব্যক্তিত্ব। সংগ্রামে-সংকটে-যুদ্ধে-শান্তিতে-প্রশাসনে-লালনে-অভিভাবকত্বে ইমামের নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব সমানভাবেই উজ্জ্বল, অনুসরণীয়। বিপ্লবের নির্মাতা, স্থপতি, রূপকার হয়েও তিনি নির্বাহী ক্ষমতার দায়িত্ব নেননি। অথচ ক্ষমতা গ্রহণ না করেও তিনিই ছিলেন ক্ষমতার নিয়ামক, কেন্দ্রবিন্দু। একাধারে তিনি আধ্যাত্মিক নেতা, জাতীয় অভিভাবক, দার্শনিক-রাষ্ট্রনায়ক, বিপ্লবের কর্ণধার এবং সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক। জাতির অবিসম্বাদিত ইমাম-নেতা-অভিভাবক হয়েও তিনি একদলীয় স্বৈরশাসন, একনায়কতন্ত্র কিংবা ফ্যাসীবাদ প্রতিষ্ঠা করেননি। নিপুণ কৃতিত্বে, অদ্ভুত সাফল্যে তিনি সাংবিধানিক-নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় বিপ্লবকে সংহত করেছেন। ইরানী বিপ্লবের সফল বাস্তবায়নই মূলতঃ বিশ্বের মুক্তি সংগ্রামে প্রাণশক্তির যোগান দিচ্ছে। জীবদ্দশায়, কিংবা মৃত্যুর পরও তাই ইমাম সমভাবে সশ্রদ্ধ, অনুসরণীয় আদর্শ। খোদা নাখাস্তা, ইরানের ইসলামী বিপ্লব যদি কোন কারণে রুদ্ধগতি-স্থবির বা ব্যর্থ হয়, তবে তার দায় ইমামের উপর বর্তাবে না। ইমাম বিপ্লবের যে সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দান করেছেন, যেভাবে বিপ্লবকে জনগণের গ্রহণযোগ্যতায় উত্তীর্ণ করেছেন, তাকে সম মমতায়-আন্তরিকতায় ও প্রজ্ঞায় ধারণ ও লালন করার দায়িত্ব পালনে ইরানের নেতৃত্ব ব্যর্থ হলেই বিপ্লব স্থানচ্যুত হতে পারে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়েছিল নবীজির নেতৃত্বে এবং যে খেলাফতি রাষ্ট্রব্যবস্থা লালিত হয়েছে নবীজি (সাঃ)-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের সযত্ন প্রয়াসে, সেখানে কিন্তু অর্থনৈতিক সুষম বন্টন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, কয়েক বছরের মধ্যে জাকাত গ্রহীতাদের আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। নারীদের লাঞ্ছিতা হতে হয়নি, শিশু হত্যার নিষ্ঠুরতা আর চলেনি। সামাজিক ও মানবিক নিরাপত্তা ছিল সুরক্ষিত। সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অবক্ষয় প্রতিরুদ্ধ হয়েছিল। মানবিক ভ্রাতৃত্ব বিকশিত হয়েছিল অত্যুচ্চ ধারায়। সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত হয়েছিল। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা শুধু

জনগণের আধ্যাত্মিক মুক্তি দিয়েই টিকে থাকতে পারে না। জনগণের আর্থ-সামাজিক-মানবিক দাবীকেও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অপরিহার্য দায়িত্ব হিসাবে স্বীকার করে নিতে হবে। জনগণ শুধু বিপ্লব নির্মাণের উপাদান হবেন, ত্যাগের খোরাক জোগাবেন, জনগণকে তাদের ঈমানের বিনিময়ে, আল্লাহর দোহাই দিয়ে অনুগত রেখে তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো অপূর্ণ রাখলে বিপ্লব টিকবে না। ইসলামের প্রতি জনগণের কমিটমেন্টকে কায়েমী স্বার্থের যুপকাষ্ঠে বলি দেওয়া চলতে পারে না। ইমামের বিপ্লবী সাধনা থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই। এখানেই প্রকৃত ইসলামের উপস্থাপক হিসাবে ইমাম সফল। সুখের বিষয়, সাধারণ জনগণের সাথে ইমামত-অভিভাবকের সম্পর্ক-গণযোগাযোগ সুদৃঢ় ও শাণিত রাখার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেছেন তাকওয়া-পরহেজগারী-খোদাভীতিতে যারা সর্বোত্তম বিপ্লবের প্রতি ত্যাগের পরাকাষ্ঠায় অগ্রসর, তাদের নিয়ন্ত্রণে ইমাম বিপ্লবকে নিয়ে এসেছেন এবং জাতীয় নীতি-নির্ধারণে তাদের গুরুত্বকে নিশ্চিত ও সুরক্ষিত করেছেন।

বর্তমান মুসলিম রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইসলামের অবস্থান

ইসলাম যে জনপদে আবির্ভূত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে যে সব জনপদের জনগণ ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম জনপদ হিসেবে পৈতৃক ভূ-খণ্ডকে পুনঃনির্মাণ করেছেন, সে সব স্থানে মুসলমানরা নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে, সাংবিধানিকভাবে ইসলাম একেবারেই নির্বাসিত। শুধু তাই নয়, এসব দেশের শাসক, নীতি-নির্ধারক, আধুনিক বিদগ্ধজন ইসলাম ও রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করে পশ্চিমা সেক্যুলারিজমের চর্চায় ও অনুসরণে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছেন। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির পরও এসব দেশের সংবিধান, আইন-প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ধারা পশ্চিমা 'সুপার পাওয়ার' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কেবলমাত্র মুসলিম পারিবারিক আইন ছাড়া রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এসব মুসলিম দেশে ঔপনিবেশিক যুগের শাসন ব্যবস্থাই চলছে। সামরিক একনায়কতন্ত্র কিংবা রাজতন্ত্রই অধিকাংশ মুসলিম দেশেরই রাষ্ট্র কাঠামোর ভূষণ। অথচ এসব শাসক-কেউ কেউ নিজেদের 'ইসলামী' বলেও পরিচয় দিতে চাইছেন। এখানেও 'প্রকৃত' ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তির সূত্রপাত হয়। মূলতঃ ইসলাম এক ও অবিভাজ্য, যুগোত্তীর্ণ-শাশ্বত এবং ইসলামের প্রকৃত ভাষ্যের জন্য আমাদের নতুন করে কোন বিতর্কেরও প্রয়োজন নেই। ইসলাম কি, এটা জানার জন্য 'উন্মুক্ত মহাগ্রন্থ' আল কোরআনের কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে। আর ইসলামের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-আধ্যাত্মিক রূপায়ণ কি, সেটা জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে স্বয়ং মহানবী (সাঃ)-এর রিসালাতের কার্যক্রমে। তিনিও ইসলামী বিপ্লবী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রকৃত ইসলাম যাচাই করার এ-ই একমাত্র কষ্টিপাথর।

ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে সংগঠিত বিপ্লবকে শুরুতে 'শিয়া বিপ্লব' এবং অনেকে 'ফ্যানাটিক' বলে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস পায়। বিশেষ করে ইহুদী নিয়ন্ত্রিত ও পশ্চিমা অর্থে পরিচালিত আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে এই প্রচারণা জোরে শোরে, বর্ণাঢ্য প্রয়াসে চলেছে এবং এখনও চলছে। পশ্চিমাদের বেশ কিছু মুসলিম নামধারী এজেন্টও একই ধরনের প্রচারণার পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছে। এই প্রচারণার লক্ষ্য হচ্ছে, বিপ্লব ও ইসলাম যে সমার্থক, এ 'গুরুতর বিপজ্জনক' সত্য সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানদের অন্ধকারে রাখা। গণবিরোধী মুসলিম শাসকমহল চান, 'শিয়া' অপবাদ দিয়ে ইসলামী বিপ্লবকে নির্বাসিত ও সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ রাখতে। কিন্তু যাবতীয় বৈরী প্রচারণা অগ্রাহ্য করে ইরানের বিপ্লবের প্রকৃতি ও স্থায়িত্বই প্রমাণ করেছে যে, ইরানের বিপ্লব প্রকৃত ইসলামেরই নয়া রূপায়ণ। ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে যত বৈরিতা মোকাবিলা করতে হয়েছে এবং হচ্ছে, তার কোন নজীর নেই ইতিহাসে। ইরানের ইসলামী বিপ্লব নির্মাণ ও রক্ষার জন্য যে বিপুল ত্যাগের নজরানা তাদের দিতে হয়েছে তা-ও অতুলনীয়। চিহ্নিত ইসলাম বিরোধী শক্তি ইরানের ইসলামী বিপ্লবের সাথে যে বৈরী, নিষ্ঠুর, হিংস্র, অমানবিক আচরণ করেছে, তাতেও এ বিপ্লবের ইসলামী চরিত্র সমুজ্জ্বল, সপ্রমাণিত। একইভাবে ইরানী ইসলামী বিপ্লবের ভাবধারা যাতে অন্যত্র সংক্রমিত না হয়, ইরান যাতে তার বিপ্লব 'রফতানী' করতে না পারে, সে জন্য পশ্চিমা শক্তি ও তার এজেন্টরা রীতিমতো ব্যারিকেড তৈরী করেছে।

সুন্নী এবং শিয়া, দুটো মাজহাবই ইসলামে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। ইসলাম দুটো স্কুল অব থট্‌সই স্বীকার করে। ইমাম খোমেনী এ ব্যাপারে বলেছেন ঃ শিয়া-সুন্নীদের মাঝে কোন বিরোধ থাকলে তা সকল মুসলমানের জন্যই ক্ষতিকর। যারা শিয়া ও সুন্নীদের মাঝে বিরোধের সৃষ্টি করতে চায়, তারা শিয়াও নয়, সুন্নীও নয়।

ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে 'শিয়া বিপ্লব' হিসেবে বর্ণনা করে প্রতিপক্ষ ঐ বিপ্লবকে ইরানের ভিতরেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু ইরানের বিপ্লবকে নস্যাৎ করার নিরন্তর পশ্চিমী চক্রান্ত ইরানের বিপ্লব সম্পর্কে একদিকে যেমন বিশ্ববাসীর ঔৎসুক্য জাগ্রত করেছে, অন্যদিকে মুসলমানদেরকে ইরানী বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে বাধ্য করেছে। প্রকৃত ইসলাম কোন্‌টি এবং বিকৃত ইসলাম কোন্‌টি, ইরানের বিপ্লবই তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। মূলতঃ ইমামের নেতৃত্বে ইরানের বিপ্লবই প্রকৃত ইসলামের কার্যকর উপস্থাপন।

ইসলাম মানবতার মুক্তির কথা বলে। মুসলিম উম্মাহর জন্যই কেবল ইসলামের ভূমিকা সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামের একটি বিশ্বজনীন ভূমিকা রয়েছে। সেখানেই অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠী ইসলামের মাঝে উত্থানের তাকিদ পায়। মানবতাকে বুলন্দ করার শক্তি পায়। ইসলামকে যারা সরাসরি জীবনধর্ম হিসেবে অনুসরণ করেন না, তাদের জন্যেও

ইসলামের বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। কেননা, আল্লাহ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষেরই রব, রিযিকদাতা। আল্লাহর তরফ থেকে যারা খেলাফতি দায়িত্ব বা রাষ্ট্রক্ষমতা পান, তাঁদেরকেও এই রবুবিয়াতের দায়িত্ব পালন করতে হয়। ইমাম খোমেনী বিশ্বের নির্যাতিত জাতিসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে বিশ্বজনীন ইসলামের প্রকৃত রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। এখানেই ইসলামের বিশ্বজনীন স্বতন্ত্র-মানবীয় রূপ বিধৃত। ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হবার পর বিকৃত-অসম্পূর্ণ ইসলাম এবং প্রকৃত বিপ্লবী ইসলামের মধ্যে একটি পার্থক্যরেখা সূচিত হয়। যা শত অপ-প্রচেষ্টায়ও মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি।

ইরান বিপ্লবের প্রকৃতি

ইরানে বিপ্লব সংঘটিত হবার সময়ে কম্যুনিস্ট সোভিয়েতের নেতৃত্বে ছিলেন মিঃ ব্রেজনেভ। তিনি নিজে তাঁর কমরেডদের কংগ্রেসে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন যে, ইসলাম যে এই আধুনিক যুগেও বিপ্লব সাধন করতে পারে, ইরানের ইসলামী বিপ্লবই তার সাক্ষাৎ প্রমাণ। কিন্তু পুঁজিবাদী পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট মিঃ কার্টার ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে সব সময়ই বৈরিতা ও নেতিবাচক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছেন। পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও সেক্যুলার পশ্চিমা সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করার কারণে মার্কিন নেতৃত্বের জন্য এটাই স্বাভাবিক। মিঃ কার্টারের বুদ্ধিবৃত্তির তীব্র সমালোচনা করে ইমাম খোমেনী তাই বলেছিলেন যে, ইসলামী বিপ্লবকে অনুধাবন করার মতো বুদ্ধি কার্টারের মগজে নেই। ঐ সময় ইহুদী নিয়ন্ত্রিত 'টাইম' সাময়িকী প্রচ্ছদে মার্কিন নির্বাচনের প্রতীক তালা এবং ইমাম খোমেনীর হাতে নিবদ্ধ তার চাবি দেখিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, মার্কিন নির্বাচনও ইমাম খোমেনীর অঙ্গুলী সংকেতের উপর নির্ভরশীল। মিঃ কার্টারের নেতৃত্বে ইরানের বিরুদ্ধে পরিচালিত গোপন-সামরিক মিশন, যা 'তাবাস অভিযান' নামে খ্যাত, অলৌকিক-অনির্ণীত ঐশী আজাবের ঝাঁকুনিতে বরবাদ হয়ে গেলে কার্টারের পায়ের নিচের মাটি দ্রুত সরতে থাকে। এর আগে অপর কোন বিশ্ব নেতা, কোন বিপ্লবী দরবেশ মার্কিন রাজনীতিকে শিকড়শুদ্ধ নাড়া দিতে পারেননি। ইরান ফোবিয়াই মূলতঃ মার্কিন ভোটারদেরকে মিঃ রিগ্যানের মতো রাগী-প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতার দৃশ্যপটে টেনে আনতে বাধ্য করে। রিগ্যান সাহেব ইরাকের মাধ্যমে ইরানের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে পুরনো পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইসলামী বিপ্লবের জানবাজ মুজাহিদরা অযুত শহীদি নজরানা দিয়ে বিপ্লবকে রক্ষা করেছেন। বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার ধারক, পশ্চিমা নেতৃত্ব হতবাক হয়ে দেখেছে, বিপ্লবের আগে যেমন ইরানের জনগণ ইমামের নেতৃত্বে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় অটল দাঁড়িয়ে ছিলেন, ঠিক একইভাবে চাপানো যুদ্ধ মোকাবিলায়ও একটি জাতির গোটা জনগোষ্ঠী একাট্টা হয়ে প্রতিরোধের দুর্গ-প্রাচীর

গড়ে তুলেছেন। জীবনের বিনিময়ে বিপ্লব রক্ষার এই ইতিহাস ইসলামের প্রাথমিক যুগের সোনালী ইতিহাসের সাথেই তুলনীয়।

ইরাকের মাধ্যমে ইরানের বিপ্লবকে আঁতুড় ঘরেই নস্যাৎ করে দেয়া সম্ভব না হওয়ায় রিগ্যান সাহেবের উত্তরসূরী বুশ সাহেব ইরাকের কুয়েত দখল নাটকের সৃষ্টি করেন। আজও ইরানের বিরুদ্ধে সাদ্দাম হোসেনকে 'দানবীয় ভীতি' হিসেবে পশ্চিমারা টিকিয়ে রেখেছে। ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার সূত্রে এখন পুরো পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় মার্কিন নেতৃত্বের বহুজাতির সামরিক উপস্থিতি ইরানের বিপ্লবের জন্য স্থায়ী হুমকি সৃষ্টি করে রেখেছে। ঐ এলাকায় পশ্চিমা সামরিক শক্তির উপস্থিতি ইরানের বিরুদ্ধে রীতিমতো পরিকল্পিত প্ররোচনা। শুধু তাই নয়, মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট সরাসরি ইরানকে ইরাকের চেয়েও ভয়াবহ ও 'বিপজ্জনক শক্তি' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইরানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ লালন ও মদদ দানের অভিযোগ উঠানো হয়েছে। মিসরের হোসনী মোবারক, আলজিরিয়ার সামরিক জান্তার মুখপাত্র বাউদিয়াফ এবং সৌদী শাসকদের মাধ্যমে নয়া মার্কিন বিশ্বতন্ত্রের ধারকরা ইরানের বিরুদ্ধে নয়া ফ্রন্ট খুলেছে। ইতিমধ্যেই হোসনী মোবারক তাঁর দেশের ইসলামী বিপ্লবী তৎপরতার সকল দায় চাপিয়েছেন ইরানের উপর। এখানেই প্রকৃত ইসলাম ও বিকৃত ইসলামের মাঝে কনফ্রন্টেশনের সূচনা।

বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপট

মনে রাখতে হবে, স্নায়ুযুদ্ধ-তাড়িত বিশ্বে ইমামের নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লব সাধিত হয় এবং ইমামের বিস্ময়কর আবির্ভাব মুসলিম উম্মাহকে নেতৃত্ব সংকট থেকে উত্তরণ ঘটায়। ঐ সময় সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পরাশক্তি দোর্দণ্ড প্রতাপ চালিয়ে যাচ্ছিল। পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটো এবং কম্যুনিস্ট সামরিক জোট 'ওয়ারশ'র মুখোমুখি শক্তি পরীক্ষা, ব্যালেসটিক ক্ষেপণাস্ত্রের তাক করার ঘটনা ইউরো-মার্কিন জনগোষ্ঠী তথা শান্তিবাদী বিশ্ববাসীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলে। পুঁজিবাদ-কম্যুনিজমের দ্বন্দ্ব প্রতিনিয়ত বিশ্ববাসীকে আর একটি বিশ্বযুদ্ধের ভীতির মাঝে নিক্ষিপ্ত করেছিল। শাহের ইরান ছিল মার্কিন ব্লকের আঞ্চলিক পুলিশী রাষ্ট্র। সে কারণে ইরানে ক্ষমতার পালাবদল এবং স্থিতাবস্থা পরিবর্তনে সোভিয়েত নেতৃত্ব দৃশ্যতঃ স্বস্তি অনুভব করেছিল। বিশেষ করে মার্কিন-ইরান সংঘাত সোভিয়েতকে আরও আশ্বস্ত করেছিল। তবে ইরান বিপ্লবের সাথে সাথেই সোভিয়েত নেতৃত্ব ইরান সন্নিহিত মুসলিম দেশ-আফগানিস্তান দখল করে ইরানের বৈরিতার শিকার হয়। ইরান শুধু আফগান মুক্তিযুদ্ধকেই সমর্থন করেনি লক্ষ লক্ষ আফগান উদ্বাস্তুকেও আশ্রয় দিয়েছে। আফগান মুজাহিদদের জেহাদের অন্যতম সহযোগী শক্তি-ইরান আগাগোড়া আফগানদের পাশেই ছিল। আফগান মুজাহিদরা সুস্পষ্টভাবেই ইরানের বিপ্লব ও বিপ্লবী নেতৃত্ব থেকে

সরাসরি অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। যদিও শুরুতে আফগান মুসলমানদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে মার্কিন সহায়তা ছিল। কিন্তু আফগান মুক্তি সংগ্রাম যতই বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে যেতে থাকে এবং সংগ্রাম যতই ইসলামী চরিত্র লাভ করতে থাকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ততই নিজেকে গুটিয়ে নিতে থাকে এবং চূড়ান্ত পর্বে মার্কিন পলিসি আফগান মুজাহিদদের বিপক্ষে পরিচালিত হয়। এটা প্রকৃত ইসলামের প্রতি বিপ্লবী নেতার কমিটমেন্টকে আর একবার প্রমাণ করে। এক্ষেত্রে তাই বলতে হবে যে, আফগান মুজাহিদদের বিস্ময়কর বিজয় বহুলাংশে ইরানের ইসলামী বিপ্লবেরই উত্তরফল। অন্যদিকে এই প্রতিরোধের ধারায়ই বিশাল সোভিয়েত পরাশক্তির পতনের সূচনা হয়। সরাসরি কোন প্রতিবাদের ভয় না করেই বলা যায় যে, কম্যুনিস্ট পরাশক্তির প্রথম পরাজয় ঘটে মুসলমানদের হাতেই এবং এ বিজয় এককভাবে ইসলামের। ইমাম খোমেনী এখানে একক নেতৃত্বে ভাস্বর।

সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত মধ্য এশিয়ায় ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রক্রিয়ার সূচনায় ইরানের বিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশের শৃংখল-মুক্তি যদিও পশ্চিমা মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়েছে প্রত্যক্ষভাবে, তা সত্ত্বেও ইরানের ইসলামী বিপ্লব এবং ক্ষুদ্র আফগান জাতির হাতে বিশাল পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয় পূর্ব ইউরোপের শৃংখল-মুক্তি ত্বরান্বিত করেছে। ইমাম খোমেনী বিশ্ব রাজনীতির একটি প্রতিষ্ঠিত মিথ বা কিংবদন্তী চুরমার করে দিয়েছেন মানবীয় বিপ্লব ঘটিয়ে। ইরানের হাতে মার্কিন পরাশক্তির নাস্তানাবুদ হওয়া এবং আফগানদের হাতে সোভিয়েত পরাশক্তি পরাভব, সোভিয়েত বলয়ভুক্ত জাতিসমূহের শৃংখল-মুক্তির আকাংখাকে প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপায়িত করেছে। বিশেষ করে মধ্য এশিয়ার সোভিয়েত ব্লকভুক্ত মুসলিম জাতিসমূহের উত্থান পর্বে ইমাম খোমেনীর বিপ্লবী ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকরভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠে। এখানেই প্রকৃত ইসলামের অজেয় বিপ্লবী শক্তি দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।

ইমাম খোমেনীর বহুল আলোচিত তত্ত্ব "পূর্ব নয়, পশ্চিম নয়- ইসলামই শ্রেষ্ঠ" দুই বিশ্ব তত্ত্বের মূলে কুঠারাঘাত হেনেছে। এটা শুধু ইমাম খোমেনীর উচ্চকণ্ঠ ঘোষণাই নয়, তিনি তাঁর এই ঘোষণা ইরানী পররাষ্ট্রনীতিতে অত্যন্ত কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত করেছেন। তিনি এভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি নয়া কালচার ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেছেন। দুই পরাশক্তির প্রভাব বলয়ের বাইরে অবস্থান নিয়ে ইমাম খোমেনী তাঁর জাতিকে যেভাবে স্বতন্ত্রধারায় পরিচালনা করেছেন, তাতে অপরাপর জাতিসমূহ উজ্জীবনের প্রেরণা লাভ করেছে, এতে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় উত্থানের পটভূমি রচনা করেছে। এভাবেই আগামী বিশ্ব একটি ইসলামী বিপ্লবের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ শতকের এই মানবীয় বিপ্লবও তাই ইমামের নেতৃত্বের

বৃত্তকে অতিক্রম করতে পারছে না।

প্রকৃত ইসলামের নয়া রূপকার ইমাম

সত্যি কথা বলতে কি, ইমাম খোমেনী মজলুম জাতিসমূহের এবং বিশেষ করে মুসলমানদের জড়তা ভেঙ্গে দিয়েছেন। মুসলমানদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনাকে শানিত করেছেন। ভূ-মণ্ডলীয় আর্থ-রাজনৈতিক বলয় ভেঙ্গে দিয়ে স্ব-জাতীয় শক্তির উজ্জীবন ঘটিয়েও যে বিপ্লব সাধন করা যায়, ইমাম খোমেনী তা প্রমাণ করেছেন। বিশ্ব রাজনীতির দ্বি-মাত্রিক পরিমণ্ডলকে সমভাবে প্রত্যাখ্যান করে ইমাম খোমেনী যে ইসলামী বিপ্লব সাধন করেছেন, সেটা সমসাময়িক ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর সংযোজন। বিশেষ করে ইমাম খোমেনী নতুন করে প্রমাণ করেছেন যে, মজলুম জাতির সম্মিলিত প্রতিরোধ শক্তি অপ্রতিরোধ্য। মানুষের জেগে উঠার আকাংখা যদি প্রবল ও দুর্নিবার হয়, তার লক্ষ্য যদি হয় অভ্রভেদী এবং তার লক্ষ্য অর্জনের পথে জীবনদান যদি হয় মানুষের কাছে তুচ্ছ ঘটনা, তাহলে কোন শক্তিই মানুষের উত্থান প্রতিহত করতে পারে না। বিশেষ করে একমাত্র আল্লাহর গায়েবী শক্তির উপর নির্ভর করে মানবীয় শক্তির আপোষহীন উত্থান ঘটিয়ে ইমাম খোমেনী যে বিরল ইতিহাসের বাতায়ন খুলে দিয়েছেন সেই পথ ধরেই এখন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতিসমূহের উত্থান-আকাংখা প্রবলতর হয়ে উঠেছে এবং বহু ক্ষেত্রে এখন ঐ সব জাতি মানবীয় বিপ্লবের ধারাক্রম অতিক্রম করছে। ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, ইরিত্রিয়া, আলজিরিয়া, মিসর, সুদান, তিউনিসিয়া সহ গোটা মধ্যপ্রাচ্য জুড়েই এখন ইসলামী বিপ্লব অগ্নিগর্ভ বিস্ফোরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই পটভূমিতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার ক্লায়েন্ট সরকারগুলো ইরানের বিরুদ্ধে "বিপ্লব রফতানীর" অভিযোগ তুলছে। অথচ কোন বড় ধরনের মানবীয় ঘটনাই কোথাও সীমাবদ্ধ থাকে না। যেমনটি ঘটে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বেলায়। যে কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেই মানবজাতির উত্তরাধিকারীত্ব রয়েছে। তেমনি মানবজাতির একাংশের সংগ্রাম, সাধনা, বিপ্লব, বিদ্রোহ অবধারিতভাবেই অপর জাতিসমূহকে উদ্বুদ্ধ করবে নব উত্থানে। এটাই মানবজাতির ইতিহাসের প্রকৃতি। ফরাসী বিপ্লব কিংবা আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম কোন কোন জাতিকে যদি উত্থানে উদ্বুদ্ধ করে, তাহলে ঐ বিপ্লবকে ইতিহাসের কাঠগড়ায় টেনে আনা যায় না। বিশ শতকের মধ্য পর্বে এশিয়া-আফ্রিকায় যে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল, তাতে নিকট অতীতের ফরাসী বিপ্লব কিংবা মার্কিন জাতির স্বাধীনতা আন্দোলন যে প্রেরণা যোগায়নি সেটা কে বলতে পারে? আলজেরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল ফরাসী উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে। অথচ ফরাসী বিপ্লবের চেতনা আলজেরিয়ার সংগ্রামকেই উদ্দীপ্ত করেছে। এই উপ-মহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনও কম বেশী বৃটেনের আভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক রাজনীতির ধারায় পুষ্ট

হয়েছে।

আগেই বলেছি, ইমাম খোমেনীর বিপ্লবী আবেদন শুধু মুসলিম উম্মাহ'র ভূ-জনপদেই আলোড়ন ও উত্থান-আকাংখা সৃষ্টি করেনি, ল্যাটিন আমেরিকা সহ বিশ্বের অপরাপর জাতি-গোষ্ঠীকেও এই বিপ্লব বিপুলভাবে আকৃষ্ট করেছে। বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী অভিস্পাকে জাতিসমূহের সম্মিলিত ইচ্ছার কাছে, স্বাধীন চেতনার কাছে পরাভূত করার যে ইতিহাস ইমাম খোমেনী সৃষ্টি করেছেন, তা উম্মাহ্র বহির্ভূত জাতিসমূহের জন্য আলোর মশাল হিসেবে প্রেরণা যোগাচ্ছে।

ইমাম আগে বিশ্ব-নেতা হতে চাননি। তিনি প্রথমতঃ ইরানকেই তাঁর বিপ্লবের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন এবং ইরানে সফল ইসলামী বিপ্লব সাধনের পর বাইরের দিকে নজর দিয়েছেন। এভাবেই তাঁর বিশ্ব নেতৃত্ব কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামী বিপ্লবের একটি মডেল নির্মাণ করেই তিনি অন্যদেরকে আত্মসচেতন ও দায়িত্বগ্রবণ করতে চেয়েছেন।

জাতিসমূহের উত্থান ও ইরানের বিপ্লব

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের মূল ভিত্তি হচ্ছে তৌহিদ এবং মহানবী (সাঃ)-এর তরিকায় তা পরিপুষ্ট ও পরিণতির দিকে ধাবিত হয়েছে। মহানবী (সাঃ) যেমন কাফের-মোশরেকদের নিরন্তর প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন ঃ একহাতে চাঁদ, অন্যহাতে সূর্য এনে দিলেও তিনি ইসলাম থেকে এক বিন্দুও বিচ্যুত হবেন না, ইমাম খোমেনীও উম্মতে মুহম্মদী হিসেবে নবুয়তী ধারা অনুসরণ করে ইসলামের উপর পর্বতের ন্যায় অটল দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি প্রত্যাশা করেছেন, জালেমের উপর মজলুমের বিজয়। রাষ্ট্র ক্ষমতার উপর মজলুম জনগোষ্ঠীর বিজয় ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ লাভের যে পথ নির্দেশ ইমাম দেখিয়েছেন, তা নব্য সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণ-কৌশলকে বিপন্ন ও দুর্বল করে দিয়েছে। ইতিহাস আজ এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, ইরানের বিপ্লব সারা বিশ্বের মজলুম জাতিসমূহের জন্য একটি প্রতীকী মহাবিজয়।

ইসলাম কোন অবস্থায়ই গীর্জায় বন্দী খৃষ্টবাদ বা আচার সর্বস্ব পৌত্তলিকতার বিকল্প নয়। ইসলাম মানুষের সংগ্রাম-বিদ্রোহ-নির্মাণ-আত্মবিকাশের ব্যবস্থাপত্র, তার ইহ-পরকালীন মুক্তির পাথেয়। ইসলাম মানুষকে সক্রিয়, আন্দোলিত ও শ্রমনিষ্ঠ করে। অদৃষ্টবাদিতার মিথ্যাচার থেকে ইসলাম মানুষকে মুক্তি দেয়। আল্লাহর মদদ এবং মানুষের সদিচ্ছা ও স্ব-শ্রমের সমন্বয়কেই ইসলাম ভাগ্য বদলের উপায় মনে করে। ইমাম খোমেনী তাঁর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন।

ইমাম খোমেনী সাম্রাজ্যবাদী ইচ্ছাশক্তির হাতে বন্দী খৃষ্টীয় গীর্জার অর্গল ভেঙ্গে সেখানে তৌহিদের চাষাবাদ করার বুলন্দ আওয়াজ তুলেছেন। তিনি মার্কিন পাদ্রীদের

সরাসরি আহবান করে বলেছেনঃ আল্লাহর জন্য ঘন্টা বাজান, কাটারের জন্য নয়। খৃষ্টীয় গীর্জার রক্ষকরা তাদের রাষ্ট্রশক্তিকে অগ্রাহ্য করে ইমামের আহবানের প্রতি সাড়া দিতে পারেননি সত্য, তবে তাঁদের বিবেক তাদেরকে প্রতিনিয়ত দংশন করছে। পবিত্র কোরানের এই সাক্ষ্য ঃ "মরিয়ম তনয় ঈসা বলেছিল, হে বনী ইসরাইল। আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসুলএবং আমার পূর্ব থেকে তোমাদের নিকট যে তওরাত রয়েছে, আমি তার সমর্থক এবং আমার পরে আহমদ নামে যে রাসূল আসবে আমি তাঁর সুসংবাদ দাতা" (সূরা সাফ ঃ ৬) – ইমাম গীর্জার রক্ষকদের শুনিয়েছেন।

ইমাম খোমেনী সবসময়ই খৃষ্টানদের মৌল তাওহিদী শিক্ষার দিকে আহবান করেছেন। তিনি তাঁদের সাথে 'আহলে কিতাবী'র সম্পর্ক বিনির্মাণের চেষ্টা করেছেন, তাঁদেকে ঈসা মসিহর (আঃ) হেদায়াতের দিকে প্রত্যাবর্তিত করার নিরন্তর চেষ্টা করেছেন। মহানবী হযরত মুহম্মদ (সাঃ) নবী ঈসা (আঃ)–এই দু'জনের মাঝে ঐশী সম্পর্কের কথা তিনি বার বার খৃষ্টানদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ইমাম বলেছেনঃ "মহান নবী হযরত ঈসা (আঃ)–এর জন্মদিন–বড়দিন উদযাপন উপলক্ষে আমি বিশ্বের নির্যাতিত মানুষ, খৃষ্টান সম্প্রদায় এবং আমার স্বদেশী খৃষ্টান ভাইদেরকে শুভেচ্ছা জানাই। যে নবীর মিশন ছিল জান্নাতী ভাষা ও সৎকর্ম দিয়ে নির্যাতিত মানুষকে সাহায্য করা, ন্যায়বিচার ও সহনশীলতা প্রতিষ্ঠা করা, নির্যাতনকারীকে নিন্দা করা এবং বঞ্চিত মানুষকে সমর্থন করা।

চার্চের ফাদার ও খৃষ্টান ধর্মগুরুগণ জাগ্রত হোন এবং জালেমদের কবল থেকে নির্যাতিত ও অবহেলিত লোকদেরকে রক্ষা করুন। আল্লাহর ওয়াস্তে আর একবার আপনাদের চার্চের ঘন্টাধ্বনি বেজে উঠুক ইরানের নির্যাতিত মানুষের অনুকূলে এবং নির্যাতনকারীদের নিন্দায়।"

ইমাম খোমেনী গোটা বিশ্বকে দু'টি ধারায় বিভক্ত করেছেন। একদিকে তৌহিদবাদী ধারা, অন্যদিকে তাগুতী ধারা, একদিকে মজলুম অন্যদিকে জালেম। একদিকে আহলে কিতাব অন্যদিকে আহলে কিতাব বিরোধী অপশক্তি। এই বিভাজন বিশ্বব্যাপী মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে এক বিপ্লব সাধন করেছে। যদিও গীর্জায় নিয়ন্ত্রকরা সত্যের স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত। কিন্তু ইমাম খোমেনী যে তৌহীদবাদী মানবিক ঐতিহ্য সূত্রের উদ্বোধন ঘটিয়েছেন, তাতে তাঁর বিশ্ব নেতৃত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইমাম খোমেনী শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম রাজনৈতিক শিক্ষক এবং এক মহান মানবীয় বিপ্লবের স্থপতি। কম্যুনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের সাবেক প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের কাছে লেখা ইমামের ঐতিহাসিক চিঠি সমসাময়িক ঘটনায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তিনি তাঁর চিঠিতে কম্যুনিজমের অনিবার্য পতনের ইঙ্গিত

দিয়েছেন ঃ কম্যুনিজমের ঠাঁই হবে ইতিহাসের যাদুঘরে। তিনি গর্বাচেভকে বলেছিলেন, পুঁজিবাদের আশ্রিত না হয়ে ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ করতে। কিন্তু গর্বাচেভ ইমামের প্রস্তাব মেনে না নিয়ে পুঁজিবাদের উচ্ছিষ্ট ভোগে লিপ্ত হন। পুঁজিবাদ বিভক্ত-খণ্ডিত সোভিয়েত সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে পারবে কিনা, বলা কঠিন। তবে পুঁজিবাদ গর্বাচেভকে রক্ষা করতে পারেনি। গর্বাচেভের ইমাম খোমেনীর আহবানে সাড়া না দেবার ঘটনা রাশিয়াকে পরাশক্তির অবস্থান থেকে প্রকারান্তরে বিচ্যুত করে একটি আঞ্চলিক শক্তিতে পরিণত করেছে। সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণভুক্ত বিশাল মুসলিম মধ্য এশিয়া স্বাধীন হয়ে যাবার কারণে রাশিয়ার অর্থনীতি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। অথচ গর্বাচেভ পুঁজিবাদ গ্রহণ না করে ইসলামের দিকে ফিরে আসলে বিশাল মধ্য এশীয় মুসলিম জনপদ হয়ত তাদের সাথেই একই কনফেডারেশনের আওতায় মিলে মিশে থাকার কথা ভাবতে পারত।

ইরান বিপ্লবের প্রভাব

ইমাম খোমেনীর উত্থান এমন এক সময়, যখন কম্যুনিস্ট পরাশক্তি ইতিহাসের যাদুঘরে ঠাঁই নিতে বাধ্য হয়েছে এবং পুঁজিবাদী মার্কিন পরাশক্তির কর্তৃত্বও বিভিন্ন ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। যদিও কম্যুনিস্ট পরাশক্তির অনুপস্থিতিজনিত অনুকূল পরিস্থিতিতে একক বিশ্ব কর্তৃত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে চলে গেছে, তবু একমাত্র ইমামের ইরানই মার্কিন প্রভাব বলয়কে অগ্রাহ্য করে বিশ্বরাজনীতিতে একটি নবতর ধারা সংযোজন করেছে। বিশ্বের দিকে দিকে এখন আরও 'বিপ্লবী ইরান' তৈরী হয়েছে এবং হচ্ছে। মার্কিন একক বিশ্ব কর্তৃত্ব প্রায়শঃই গণবিদ্রোহ ও গণবিক্ষোভের শিকার হচ্ছে। এসবই মুসলিম ও তৃতীয় বিশ্ব এবং নিপীড়িত নির্যাতিত জনগণের মধ্যে ইমামের বিপ্লব ও নেতৃত্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব। বর্তমান শতককে 'ইসলামী পুনর্জাগরণের' শতক বলা হয়। এটাও ইরানের ইসলামী বিপ্লব উৎসারিত সাফল্য। শুধু ইসলামী বিশ্বেই নয়, ইউরোপ, আমেরিকায় যেখানে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ট, ঐসব জায়গায়ও মুসলমানরা এখন ঐক্যবদ্ধ, প্রতিবাদী এবং বিপ্লবী চেতনায় উদ্দীপ্ত। মুরতাদ রুশদীকে 'স্যাটানিক ভার্সেস' লেখার দায়ে মৃত্যুদণ্ড দানের ঐতিহাসিক ফতোয়া দানের মাধ্যমে ইমাম খোমেনী মুসলমানদেরকে স্বকীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় পবিত্রতা রক্ষার সংগ্রামে উদ্দীপ্ত ও ঐক্যবদ্ধ করেছেন। 'নীরবে মার খাবার যুগ' অতিক্রম করে মুসলমানরা এখন প্রতিরোধ গড়ে তোলার পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছেন। মিসর-আলজেরিয়া-সুদান-তিউনিসিয়ায় ইসলামী বিপ্লব এখন দোর গোড়ায়। যথার্থ নেতৃত্বের সংযোগ-সম্মিলন ঘটলেই ঐসব দেশে নয়া ইতিহাস সৃষ্টি হবে। সুদান ও মিসরের বিপ্লব-সম্ভাবনাকে ইরানের ইসলামী বিপ্লবের মানস সন্তান বলা চলে। 'ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর' পত্রিকা এ প্রসঙ্গে বলেছেঃ-"The Islamic

Revolution of Iran is Communicating a very powerful message to the Islamic groups; that is, the Muslims in Iran have been able to defeat a powerful ruler such as ex-Shah, other beliving groups can also do so in their countries."

–সত্য বটে, ইরানের সফল বিপ্লবের মাধ্যমে যে আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয় সারাবিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে, তা দুনিয়ার অন্যান্য মুসলিম দেশেও পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। একজন সমীক্ষকের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তিনি বলেছেন ঃ বিশ্বের যে কোন অঞ্চলের ইসলামী আন্দোলনেই কোন না কোনভাবে ইরানী বিপ্লবের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া যাবে। আর একজন আমেরিকান লেখক–সাংবাদিক মিঃ W. Carlsen বলেছেন ঃ khomeni was the powerful, Khomeni was that strong, Khomeni was that egoless and invincible. He was the source of revival of Islam, he was the source of the revolution. He was the source of whatever power this revolution and Islam represented to the world. Without him, I am certain, that monarchy would still be in place and Islam would be effectively enlistmented as a factor in the political desting of the middle East ..... Khomeni was at the centre of this Islamic eruption; Khomeini was the foundation head of the spiritual power that flowed into the hearts of muslims throughout the Middle-East at least those muslims who instenctively were close to the heart of Islam."

ইরানী বিপ্লবীকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে এজন্যই পশ্চিমারা এতটা আকুল। ইরান যাতে বিশ্বের ইসলামী বিপ্লব ও মজলুম জাতিসমূহের উত্থানে বৈষয়িক–নৈতিক–সামরিক সমর্থন জোগাতে না পারে, সেজন্য ইসলামী ইরানকে পঙ্গু করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগীরা নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ইমামের নেতৃত্বে ইরানে বিপ্লব সম্পন্ন হবার পর ইসরাইল বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন নতুন গতিবেগ পায়। মার্কিন দৌত্যকর্মে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মাধ্যমে আরব–ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রামের কবর রচিত হবার পর ইমামের বিপ্লবী চেতনাই ঐ আন্দোলনকে নতুন রূপদান করে। ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিকে ইমামের প্রত্যাখ্যান করার ফলে মার্কিন প্রভাব বলয় সংকুচিত হয়। ইসরাইল বিরোধী 'ইনতিফাদা' আন্দোলনের অভ্যুদয় মূলতঃ ইরানের 'মাথা নত না করার' নীতিরই বিজয়। এখনও মধ্যপ্রাচ্যে ইরান এক অপ্রতিরোধ্য রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি। লেবাননের হেজবুল্লাহ গ্রুপ এখনও দুর্দমনীয় শক্তিতে টিকে আছে। এরা ইরানের বিপ্লবের ফসল।

ইসরাইল অতিসম্প্রতি যে চার শতাধিক প্রতিবাদী ফিলিস্তিনীকে 'নো ম্যানস ল্যান্ডে' বহিষ্কার করেছিল, তারা চরম ভোগান্তি ও মৃত্যুর কাছাকাছি উপনীত হয়েও আত্মসমর্পন করেনি। এটাও ইরানী বিপ্লবের দৃঢ়তারই অনুসরণ। ইমাম খোমেনী দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, সশস্ত্র প্রতিরোধ ছাড়া ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোন অবকাশ নেই। তিনিই বলেছেন যে, ইসরাইলকে স্বীকার করে কোন শান্তি আলোচনা নয়। ইমাম খোমেনী ইসরাইলের জবর দখল থেকে মুসলমানদের প্রথম কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাস মুক্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ জেহাদের আহবান জানিয়েছেন। ইমামের 'কুদ্‌স দিবস' ঘোষণার ফলে একদিকে বায়তুল মোকাদ্দাস মুক্তি যেমন ইরানের জাতীয় দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, তেমনি বায়তুল মোকাদ্দাস মুক্তির বিষয়টি এখন মুসলিম উম্মাহর চেতনায় নবতর সংগ্রামের সংযোজন করেছে। এভাবে ধর্মীয় অধ্যাত্মবাদের সাথে ইমাম খোমেনী ইসরাইল বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের সম্মিলন ঘটিয়েছেন। প্রতিবছর মুসলিম উম্মাহ 'কুদ্‌স দিবস' পালন করে ইমামের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা প্রকাশ করছে।

ইরানের ইসলামী বিপ্লব সহিংস বা সশস্ত্র ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইমাম খোমেনী নির্বাসিত থেকে গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়ে শাহের পতন ঘটান। এটিও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ইমাম খোমেনী যথার্থ অর্থেই ইসলামের প্রকৃত পুনর্জাগরণকারী। তিনি পৃথিবীর তাবৎ মজলুম জাতিসমূহের অভিভাবক-বিপ্লবী কণ্ঠস্বর। ইসলামকে রাষ্ট্রশক্তির নিয়ামক হিসেবে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইসলামের মৃত রাষ্ট্রশক্তিকে উজ্জীবিত করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেনঃ ধর্মই হচ্ছে বিপ্লবের স্রষ্টা এবং তৌহিদই বিপ্লবের ভিত্তি আর রিসালাত হচ্ছে বিপ্লবের কাঠামো।

ইমামের বড় সাফল্য

ইসলামের প্রকৃত শত্রু চিহ্নিত করণ। তাগুতী শক্তির প্রতিভূ হিসেবে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চিহ্নিত করেছেন। সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতি, ভূগোল-ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বর্ণবাদ, মার্কিন ইহুদী, বৃটিশ চক্রকে তিনি মানবতার চরম দুশমন হিসেবে দেখেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর Eric Hoglen বলেছেনঃ Imam Khomeni Confronted the US and the West and enjoyed great influence in the third world,, specially in Africa, Asia and Latin America." মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি পরাশক্তিকে ইমাম মোকাবিলা করেছেন দোর্দণ্ড প্রতাপে, গোটা পাশ্চাত্যকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন, তৃতীয় বিশ্ব, বিশেষ করে এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকায় ইমাম অপ্রতিহত ও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছেন।

ইমাম প্রমাণ করেছেন ধর্মের ভিত্তিতেই সকল ঐক্য হতে পারে, ধর্মীয় আধ্যাত্মিক চেতনাই বিপ্লব রক্ষা করতে পারে। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে ইমাম ব্যাপক সুদূর প্রসারী গুণগত পরিবর্তন আনয়ন করেছেন। পাশ্চাত্যের বহুত্ববাদী নেতৃত্বের বদলে একক ইসলামী অধ্যাত্মবাদী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন ইমাম। আর এ নেতৃত্ব পবিত্র কোরান ও সুন্নাহর সার নির্যাস- উৎসারিত।

অনুসিদ্ধান্ত

ইমাম খোমেনী যে নেতৃত্বের মানদণ্ড ইতিহাসের কাছে গচ্ছিত রেখে গেছেন, তিনি যে বিপ্লবী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনি যে, ধর্মীয় রাজনৈতিক-আধ্যাত্মিক-মূল্যবোধ এবং আর্থ-সামাজিক কালচার দিয়ে গেছে, তাতে করে প্রকৃত ইসলামের নব রূপায়ণ হয়েছে। একই সাথে ইমাম খোমেনী মুসলিম উম্মাহ'র জন্য এক অনুপম-অনন্য নেতৃত্ব উপহার দিয়েছেন। তাঁর অবর্তমানেও তাঁর উত্তরসূরীদের কাছ থেকে মুসলিম উম্মাহ একই নেতৃত্ব পাচ্ছেন। অর্থাৎ ইমাম খোমেনী একটি নেতৃত্ব ধারা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, যা অত্যন্ত সার্থকভাবেই প্রকৃত ইসলাম ও বিপ্লবকে লালন ও সংরক্ষণ করছে। অন্যদিকে বিশ্বের নির্যাতিত -নিপীড়িত ও বিপ্লব-প্রত্যাশী জনগোষ্ঠী ইমামের বিপ্লবী নেতৃত্বে জাতীয় উত্থাপনের প্রেরণা ও দিক নির্দেশনা লাভ করেছে। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলার যে অন্তহীন অনুপ্রেরণা ইমাম রেখে গেছেন, ভবিষ্যৎ বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণপ্রতিরোধ গড়ে উঠলে এই পথেই তা এগুবে। ইমাম খোমেনী ইসলামের সাথে মজলুম মানুষের আর্তিকে সংযুক্ত করেছেন, ইসলামকে নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের অভিভাবক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাগুতী শক্তির প্রতিভূ সাম্রাজ্যবাদের বিপরীতে ইসলামকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে ইমাম খোমেনী এক অন্তহীন মানবীয় বিপ্লবের পথ নির্দেশ দিয়েছেন। কম্যুনিস্ট পরাশক্তিকে ইমাম পয়লা নম্বরের শত্রু চিহ্নিত না করে, মার্কিন পরাশক্তিকে এক নম্বর দুশমন ঘোষণা করে মানবজাতির মৌল সংগ্রামকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করেছেন। এই সংগ্রাম ভবিষ্যতে আরও দীপ্ত ও শাণিত হবে। ইমামের আগে ইসলাম ছিল পুঁজিবাদী পরাশক্তির পরিপূরক, সহায়ক শক্তি। পুঁজিবাদের স্বার্থে কম্যুনিজমের সাথে ইসলামের সংঘাত-সংঘর্ষকে পশ্চিমা শক্তি উপভোগ করতে। কিন্তু ইমাম জানতেন, অন্তঃসারশূন্য-আধ্যাত্মিকতা মুক্ত কম্যুনিজম আপন দুর্বলতায়ই বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং পুঁজিবাদকেই ইসলামের কনফ্রন্ট করতে হবে। এই কনফ্রন্টেশনে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ই ইতিহাসের অনুসিদ্ধান্ত। ইমাম খোমেনীর নেতৃত্ব কালোত্তীর্ণ, ঐতিহাসিক তাৎপর্যে মহিমান্বিত।

কিংবদন্তী পুরুষ ইমাম আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী

অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম

বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে ইসলামী বিপ্লবের সার্থক সংগঠক এক বিস্ময়কর নেতা ইমাম আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী বিশ্বজুড়ে অপশক্তির অন্তরে কাঁপন এনেছেন। কিংবদন্তী পুরুষ এই মহানায়ক তাঁর দেশ ইরানের মানুষকে কেবল দীর্ঘদিনের রাজতন্ত্রের শেকল থেকে মুক্ত করেননি, তাদেরকে ইসলামের মহান বিপ্লবী চেতনায় উজ্জীবিত করেছেন, তারা ইসলামী জিন্দেগী গ্রহণ করেছে, মেয়েরা রাতারাতি স্কার্ট ছেড়ে বোরখা ধারণ করেছে, ছেলেরা দাড়ি রেখেছে, মদ নিষিদ্ধ হয়েছে, অনাচার ও ব্যভিচারের সকল পথ বন্ধ হয়ে গেছে। ইরানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামী প্রজাতন্ত্র। ইমাম আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীকে তারা গ্রহণ করেছে তাদের আত্মার ইমাম হিসেবে, তাদের রাহবার হিসেবে। তারই বিপ্লবের প্রভাবে যে ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনদের অন্তরে মহা আতংকের সৃষ্টি হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদ ও ইয়াহুদীবাদ ভয়ে ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছে এসব কথা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য। ঘটনার গভীরে যেয়ে পারিপার্শ্বিক দুনিয়াটা পর্যবেক্ষণ করে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে ইমাম আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী ভাস্বর হয়ে ওঠেন একজন যুগনায়ক, শ্রেষ্ঠ সংগঠক ও মহান নেতা হিসেবে। তাঁর রুহানী শক্তির অনেক নিদর্শনই বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করেছে। তিনি সাম্রাজ্যবাদের হোতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার দোসরদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছেন। ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের ৪ নভেম্বর ইমাম খোমেনীর চেতনায় উদ্দীপ্ত তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এক ঝটিকা অভিযানের মাধ্যমে তেহরানস্থ মার্কিন দূতাবাস দখল করে নেয়। দূতাবাসের ৫২ জন কূটনীতিককে তারা আটক করে। এসব কূটনীতিকদের অধিকাংশই ছিলো গুপ্তচর। এই গুপ্তচরদেরকে উদ্ধার করবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নানা ফন্দি আঁটে। একপর্যায়ে তারা এক কমান্ডো হামলার মাধ্যমে ঐসব গুপ্তচরদের উঠিয়ে নিয়ে যাবার মতলব আঁটে। এই লক্ষ্যে তারা এক ঝাঁক হেলিকপ্টার গানশিপ অত্যাধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করে অতি সন্তর্পণে ইরানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। কিন্তু বিস্ময়কর হলেও সত্য ঐসব গানশিপ ১৯৮০ খৃষ্টাব্দের ২৫ এপ্রিল ইরানের তাবাস

লেখক ঃ প্রাবন্ধিক ও কলামিষ্ট, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা

মরুঅঞ্চলে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে একে একে সবগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ঐ অঞ্চলে ইরানের কোনো সেনা টহল ছিলো না, ছিলো না কোনো নিরাপত্তামূলক জরুরী ব্যবস্থা।

এ ঘটনা সারা পৃথিবীকে হতবাক করে দেয়। গায়েবী মদদ ছাড়া এমন ঘটনা ঘটতে পারে না। অনেকেই এই ঘটনাকে ইমাম খোমেনীর কারামতের নিদর্শন বলেছেন। এমনিতরো আরো বেশ কিছু ঘটনায় ইমাম খোমেনীর রুহানী শক্তির প্রমাণ মেলে। বহুল পরিচিত ম্যাগাজিন নিউজউইক তাবাস মরুর ঘটনাকে অলৌকিক ঘটনা হিসেবে তুলে ধরে নিবন্ধ প্রকাশ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকায় ঐ ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়।

এই বিস্ময়কর কিংবদন্তী পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৯ এপ্রিল সোমবার ইরানের ঐতিহাসিক জনপদ ইস্পাহানের নিকটবর্তী খোমেন শহরে। খোমেন ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে দক্ষিণে প্রায় ২১৯ মাইল দূরে অবস্থিত। তাঁর পিতা আয়াতুল্লাহ মুস্তাফা মুসাভী ও নানা মীর্যা আহমদ উভয়েই ছিলেন বিখ্যাত আলিম। এক তথ্যে জানা যায় আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীর প্রপিতামহ সাইয়েদ দীন আলী শাহ কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন এবং খ্যাতিমান আলিম ছিলেন। আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীর দাদা সাইয়্যেদ আহমদকে বলা হতো হিন্দুস্তানের সৈয়দ আহমদ। আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীর বয়স যখন মাত্র কয়েক মাস তখন তাঁর আব্বা একদল দুষ্কৃতিকারীর হাতে শহীদ হন। আর ১৫ বছর বয়সে তাঁর আম্মা মুহতারিমা হাজিরা ইন্তিকাল করেন। তাঁর বড় ভাই আয়াতুল্লাহ সৈয়দ মুর্তাযা পসন্দিদাহ একজন নামকরা আলিম।এই বড় ভাইয়ের কাছেই তাঁর লেখা পড়া শুরু হয়। পরে তাঁকে ইস্পাহানের বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেয়া হয়। ইস্পাহান থেকে তাঁকে আরাক শহরের মাদ্রাসায় ভর্তি করা হয়। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তাঁরা পবিত্র নগরী কোম-এ এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র। সর্বত্রই তিনি কৃতিত্বের নজীর স্থাপন করেন। ৩০ বছর বয়সেই তাঁর নাম সবখানে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি মুজতাহিদ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। কোম নগরীতে শুরু হয় শিক্ষকতা জীবন। তাঁর দর্শন চিন্তা ছাত্রদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে 'কাসফুল আসরার' বা ডিসকভারী অব সিকরেটস অর্থাৎ গোপন তথ্য আবিষ্কার নামে তাঁর রচিত একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি জাতীয়তাবাদ ও নৈতিক চেতনার ব্যাখ্যা করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, ইরান বহিঃশত্রু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার নিজস্বতা হারিয়ে ফেলেছে। তাই তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বৈদেশিক প্রভাব বলয় থেকে ইরানকে মুক্ত করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন। তিনি মনে প্রাণে এটা উপলব্ধি করেন যে, ইসলাম ছাড়া ইরানের মুক্তি সম্ভব নয়। সব সমস্যার সমাধান একমাত্র ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হতে পারে। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ইরানের প্রধান আয়াতুল্লাহ হন।

তখন থেকেই তিনি ইরানের ইসলামী নেতৃত্বে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব হিসেবে সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারী রেজা শাহ পাহলভী শ্বেতবিপ্লব নামে পরিচিত ৬ দফা পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই তথাকথিত শ্বেত বিপ্লবের বিরুদ্ধে মার্চ মাসে ইমাম রুহুল্লাহর নেতৃত্বে গড়ে উঠলো এক জোরদার আন্দোলন। তিনি ইসরাইলের সঙ্গে পাহলবী বংশের সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক গোপন আঁতাতের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলেন।

১৯৬৩ খৃষ্টাব্দের ৩ জুন সোমবার তিনি তেজোদীপ্ত এক ভাষণে জাতিকে শাহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য আহবান জানান বিশেষ করে তিনি ওলামায়ে কেরামকে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর নেতৃত্বে সারা দেশব্যাপী আলিম সমাজ সংঘবদ্ধ হয়। ৫ জুন তাঁকে গ্রেফতার করলো শাহের বাহিনী। ইরানের বিভিন্ন শহর প্রচন্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। কয়েক দিনে শাহের নিরাপত্তা পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলীতে প্রায় ১৫০০ ব্যক্তি প্রাণ হারায়। এমনিভাবে সমগ্র ইরানে শাহ বিরোধী আন্দোলন ভীষণ আকার ধারণ করতে থাকে। মার্কিনী অর্থ ও কারিগরী সহযোগিতায় ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত নিরাপত্তা সংস্থা সাভাক জন নিধনে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। অনেকের ধারণা এই সংস্থাটি ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ–এর সাহায্যপুষ্ট ছিলো। ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ৪ নভেম্বর বুধবার ইমামকে তুরস্কের ইজমিরে নির্বাসিত করা হয়। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে তিনি ইরাকের নাযাফ শহরে প্রেরিত হন। নাযাফ থেকে তিনি অত্যন্ত গোপনে আন্দোলনকে এগিয়ে নেবার বাণী ইরানে পাঠাতে থাকেন। নির্বাসিত অবস্থায় তিনি গোপন পথে শাহ বিরোধী প্রচারপত্র, টেপ রেকর্ডে বাণীবদ্ধ ভাষণ এবং নির্দেশনা ইরানের মানুষের কাছে পাঠাতে থাকেন। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শাহ ইরান রাজতন্ত্রের আড়াই হাজার বছর (সাইরাস থেকে) পূর্তি উৎসব পালন করেন এবং আরিয়া মেহের (আর্য দ্যুতি) উপাধি ধারণ করেন। এ ছাড়াও ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে পাহলবী বংশের ৫০ বছর পূর্তি উৎসব এবং ইসলামী ক্যালেন্ডারের পরিবর্তে শাহী ক্যালেন্ডারের প্রবর্তন ইত্যাদি ঘটনাবলী ইরানের জনগণের মধ্যে শাহ বিরোধী আন্দোলন আরো জোরদার করে তোলে। ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে ইমামের জ্যেষ্ঠপুত্র মুস্তাফা খোমেনী সাভাক বাহিনীর হাতে শহীদ হন। ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে একটি সরকারী পত্রিকায় আয়াতুল্লাহ খোমেনীকে নিয়ে একটি আপত্তিকর ও অপমানজনক নিবন্ধ প্রকাশিত হলে কোম নগরী সহ দেশের সবখানে চরম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দের ৩ অক্টোবর মঙ্গলবার ইরাক থেকে তিনি প্যারিসে যান। ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে। সমগ্র ইরানে জ্বলে ওঠে বিপ্লবের আগুন। জনতার প্রচন্ড বিক্ষোভের আঘাতে ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যায় তখ্‌ত–ই শাহান শাহী। প্রবল বিক্ষোভের মুখে ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী শাহ আত্মরক্ষার জন্য দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন।

তাঁর আর দেশে ফেরা হয়নি।

আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী দীর্ঘ ১৫ বছর নির্বাসনে কাটিয়ে ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ৫০ জন উপদেষ্টা ও ১৫০ জন বিদেশী সাংবাদিকসহ দেশে ফিরে এলেন। দেশে ফিরে এলেন এক মহান নেতা রুহানী শক্তিতে বলীয়ান এক অনন্য পুরুষ। তাঁর কোনো রাজনৈতিক দল ছিলো না, ছিলো না কোনো গেরিলা বাহিনী বা কোনো দুনিয়াবী শক্তির মদদ। সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর উপর ভাওয়াক্কুল ছিলো তাঁর, আর ছিলো জিহাদী চেতনা ও নির্ভীক চিত্ত। তাঁরই নেতৃত্বে ইরানে কায়েম হলো ইসলামী প্রজাতন্ত্র। ক্ষমতার মসনদে তিনি অধিষ্ঠিত হলেন না–আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবেই তিনি ইরানকে দান করলেন এক নতুন যিন্দেগী, সত্য সুন্দরের পথে পরিচালিত এক জিন্দিগী। মুকুটহীন সম্রাটরূপে তিনি সমগ্র ইরানকে সুসংহত করলেন। তিনি ইরানকে সুসংহত করেই ক্ষ্যান্ত হলেন না। তিনি বিশ্বের দেশে দেশে ইসলামের দাওয়াত পৌছালেন। ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দের ৪ জানুয়ারী তদানীন্তন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের কাছে প্রেরিত পত্রে বললেন, মিস্টার গর্বাচভ; সত্যের দিকে সকলেরই ফিরে আসা উচিত। তিনি গর্বাচভকে উক্ত পত্রের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এইভাবেঃ মিঃ গর্বাচভ, ইসলামের উপর গভীরভাবে গবেষণা করবার জন্য আমি আপনাকে আহবান জানাচ্ছি–এটা এজন্য নয় যে, ইসলাম ও মুসলমানদের আপনাকে প্রয়োজন বরং এ জন্য যে, ইসলামের মহান ও চিরন্তন মূল্যবোধ সকল জাতির সুখ–স্বাচ্ছন্দ্য ও মুক্তির উপায় হতে পারে এবং যেটা মানব জাতির মৌলিক সমস্যাসমূহের গিট খুলে দিতে পারে।——

ইমাম খোমেনী মুরতাদ সালমান রুশদীর মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করেন। ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে ইয়াহুদীদের দ্বারা পরিচালিত ভাইকিং প্রকাশনী বৃটিশ নাগরিক সালমান রুশদীর লেখা দ্য স্যাটানিক ভার্সেস নামের একটি আপত্তিকর বই প্রকাশ করে। এই বইটিতে ইসলাম ও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আপত্তিকর কথা থাকায় বইটির বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদের ঝড় উঠে নানা দেশে। ইমাম রুহুল্লাহ খোমেনী সালমান রুশদীর মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করেন। তিনি এ বিষয়ে একটি ফতোয়া প্রদান করে বলেন, বিশ্বের তেজোদীপ্ত মুসলমানদের অবগত করছি যে, স্যাটানিক ভার্সেস বইটি যা ইসলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে রচনা, ছাপা ও প্রকাশ করা হয়েছে, এর রচয়িতা এবং একইভাবে বইটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত প্রকাশকগণ মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হচ্ছে। তেজোদীপ্ত মুসলমানদের নিকট প্রত্যাশা করছি যে, তারা এদেরকে পৃথিবীর যে স্থানেই পাবে অতি দ্রুত হত্যা করবে, যাতে করে কোন ব্যক্তিই যেন মুসলমানদের পবিত্র নিদর্শনাবলীকে হেয় প্রতিপন্ন করতে না পারে। আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীর জীবন যাপন ছিলো সত্যিকার সূফীর মতো। তাঁর চেহারা সুরতে, পোশাক–পরিচ্ছদে, তাঁর আখলাকে, তাঁর লেখা কবিতায় তাঁর সূফী জীবন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি তাঁর পুত্র সৈয়দ আহমদ খোমেনীর উদ্দেশ্যে

প্রদত্ত এক অসিয়তনামায় বলেনঃ

হে ফরযন্দ।

প্রথমেই তোমাকে যে ব্যাপারে অসিয়ত করছি তাহলো এই যে, আহলে মা'রিফাত বা আউলিয়া দরবেশ গণের মকাম-মর্তাবা অস্বীকার করো না। এ ধরনের করা জাহিলদের রীতি-নীতি। যারা আউলিয়া কেরামের মর্তবাসমূহকে অস্বীকার করে ও অমান্য করে তাদের সঙ্গে উঠা-বসা ও আদান-প্রদান থেকে দূরে থেকো। কেননা, ওরা (অস্বীকার কারীরা) আল্লাহর পথ বা সত্য পথে বাঁধা দানকারী। ইমাম আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীর জীবন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তিনি ইলমে জাহির ও ইলমে বাতিন উভয় জ্ঞানই লাভ করে এক অনন্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর দেশ ইরান প্রাচীন সভ্যতার দেশ। এই দেশ বহু সুফীয়ায়ে কেরামের স্মৃতিধারণ করে রয়েছে। হাফিজ, সাদী, ফেরদৌসীর দেশ ইরান। বহু মুহাদ্দিস, আলিম, ফকীহ্ এই দেশেই জন্মগ্রহণ করেন। এই ইরানকে তিনি ভালোবাসতেন হৃদয় দিয়ে। দেশ ও জাতির উন্নয়ন চিন্তায় তিনি বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি দুনিয়ার সামনে সাম্রাজ্যবাদী ও ইয়াহুদীবাদীদের কালো মুখোশ উন্মোচন করে দেন। তিনি ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, একমাত্র ইসলামই দিতে পারে সত্যিকার সুখ ও সমৃদ্ধি। তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের আসল দুশমনদের চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী ও রাজতন্ত্রের লালনকারীরা ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য গত কয়েকশ' বছর ধরে ষড়যন্ত্র করে আসছে। ইয়াহুদী নাসারা চক্রান্তের শিকার মুসলিম দুনিয়া বহু পূর্ব থেকেই। সম্মিলিত নাসারা শক্তি ক্রুসেডের নামে ইসলামকে ও মুসলিমদের দুনিয়া থেকে মুছে দেবার জন্য যে সংঘবদ্ধ হয়েছিলো। নুরুদ্দীন জঙ্গী ও গাজী সালাহুদ্দীন প্রমুখ মর্দে মুজাহিদ তা প্রতিহত করে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে সমর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু সেই চক্রের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। আজ রিচার্ডের উত্তরসূরিরা তাদের কালো নখর মুসলিম দুনিয়ায় অবাধে বিস্তার করে রয়েছে অপরদিকে সালাহুদ্দীনের উত্তরসূরিরা কাপুরুষের মতো ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছে। ইসলাম বিরোধী ঐ চক্র অতি কৌশলে মুসলমানদের মধ্যে নানাভাবে বিস্তার করে তাদেরকে দ্বিধাবিভক্ত রাখবার তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। ইমাম খোমেনী এই ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ইয়াহুদীবাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে সারা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তোলেন। তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসকে ইয়াহুদীদের খপ্পর থেকে উদ্ধার করবার জন্য মুসলিম দুনিয়াকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বার উদাত্ত আহবান জানান এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের মুক্তিকে ইরানের ইসলামী বিপ্লবের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেন। মুসলিম দুনিয়াকে ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার লক্ষ্যে মাহে রমযানুল মুবারকের শেষ শুক্রবারকে আল কুদস দিবস পালনের জন্য আহবান জানান। ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দের মাহে রমযানুল মুবারকের শেষ শুক্রবার তথা জুমাআতুল বিদা'তে

প্রথম আল কুদস দিবস পালিত হয়। প্রথম আল কুদস দিবসে আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী এক বাণীতে বলেনঃ আল কুদস দিবস ইসলামেরই দিবস। বিশ্বের সকল মুসলমানকে এই দিবসে সতর্ক করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তাদের আধ্যাত্মিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি কতো বড়। তিনি আরো বলেনঃ বিশ্বের সকল দেশের সরকারকে একথা বুঝতে হবে যে, ইসলামের উপর বিজয় লাভ করা যাবে না। ইসলাম ও আল কুরআনই বিশ্বকে জয় করবে।

১৯৮০ খৃষ্টাব্দের মাহে রমযানুল মুবারকের শেষ শুক্রবারে পালিত হয় দ্বিতীয় কুদস দিবস। এদিন তিনি এক ভাষণে বলেনঃ যতদিন পর্যন্ত আমরা ইসলামের দিকে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ইসলামের দিকে ফিরে না আসি ততদিন পর্যন্ত আমাদের সমস্যা থেকেই যাবে। আমরা জেরুজালেম বা আফগানিস্তানের সমস্যা বা অন্যত্র আমাদের কোন সমস্যার সমাধান করতে পারবো না। মুসলিম জাতিকে আদি ইসলামে ফিরে আসতে হবে।

আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী একটি অসিয়তনামা প্রণয়ন করে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে যান। এই অসিয়তনামা ইরানী জাতি, ইরানের সরকার, ইরানের তরুণ সমাজ, লেখক, বক্তা, বুদ্ধিজীবী ও সমালোচকদের উদ্দেশ্যে প্রধানত প্রণীত হয়। তিনি ইন্তিকাল করেন ১৯৮৯ খৃষ্টাব্দের ৩ জুন শনিবার দিবাগত রাত ১০টা ২২ মিনিটে। পরদিন সকাল ৯টা ১০ মিনিটে মজলিসে শুরার ইসলামী ভবনে সেই সুদীর্ঘ অসিয়তনামাখানি ইরানের বর্তমান আধ্যাত্মিক নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী পাঠ করে শোনান। ৩৬ পৃষ্ঠার সেই অসিয়তনামায় ইমাম খোমেনীর চিন্তা ও চেতনার প্রকাশ ঘটেছে স্পষ্টভাবে। অসিয়তনামার শেষ পর্যায়ে এসে তিনি বলেন, সকলের প্রতি আমার অন্তিম আবেদন, সদা-সর্বদা আল্লাহতাআলাকে স্মরণ রেখে নিজকে চিনুন এবং সকল ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা ও স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে যান। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আপনাদের সহায়ক হবেন। আপনারা যদি আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে ইসলামী রাষ্ট্রের উন্নতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব ধরে রাখেন। আর আমি যেভাবে প্রিয় দেশবাসীর মাঝে জাগরণ, সতর্কতা, একনিষ্ঠতা, আত্মোৎসর্গ-মনোভাব, প্রতিরোধ চেতনা ও দৃঢ়তা দেখতে পাচ্ছি তারই ভিত্তিতে এ আশা পোষণ করছি যে, আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহে এ মানবিক ভাবধারা বংশপরম্পরায় অব্যাহত থাকবে। এমনকি পরবর্তী বংশধরগণের মাঝে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। ইমাম আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী ইরানী জাতির জীবনের পরতে পরতে ইসলামী চেতনা জাগ্রত করতে, তাদেরকে স্বাধীনতা ও শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার আস্বাদন দান করতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর এই আন্দোলনকে তিনি মঞ্জিলে মকসুদে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন যা বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছে। তিনি বিশ্ববাসীর কাছে কিংবদন্তী পুরুষ হিসেবে এক অনন্য সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। এক অনন্য বিপ্লবী নেতার মর্যাদায় তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী চক্রের মোকাবিলায় ইমাম খোমেনী (রহঃ)

মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব

আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ আল মুসাভী আল-খোমেনী ইতিহাসের এক কালজয়ী পুরুষের নাম। তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক, ইরানের ইসলামী বিপ্লবের মহানায়ক। একটি ঘুণে ধরা সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপর একটি নতুন সমাজ বিনির্মাণের কারিগর তিনি। তিনি ছিলেন স্বৈরাচারী পাহলভী রাজবংশের দাম্ভিকতাকে বিচূর্ণ করে দেবার সংগ্রামের বিজয়ী সিপাহ্সালার এবং আপোসহীন সত্যের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল এক আধ্যাত্মিক পুরুষ। মুক্তিপিয়াসী ইরানী জাতিকে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ ও জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত করার মহান শিক্ষক ছিলেন ইমাম খোমেনী। বস্তুতন্ত্র ও ভোগবাদের ভ্রান্ত দর্শন থেকে মানব জাতিকে হেরার রাজপথে আহবান করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ঐশী জ্যোতিতে ভাস্বর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। মুসলিম উম্মাহকে তার গৌরবময় ঐতিহ্য ও স্বকীয়তা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য তিনি ছিলেন এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রদীপ্ত ব্যক্তিত্ব। মুসলিম নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ইমাম খোমেনী ছিলেন আত্মপ্রত্যয়ী পথ-প্রদর্শক।

আধুনিক জাহেলিয়াতের মোকাবিলায় ইমাম খোমেনী ছিলেন মজলুম মানুষের মুক্তির দিশারী এক অবিসংবাদিত রাহবার। বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত শয়তানী চক্রের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন এক জ্বলন্ত প্রতিবাদ। সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ, ইহুদীবাদ ও স্বৈরতন্ত্রের বিষাক্ত ছোবলকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য শির উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। বিশ্ব পুঁজিবাদী লুটেরা গোষ্ঠী ও বিধ্বস্ত সমাজতান্ত্রিক বিভ্রান্তির বিপরীতে এক নতুন বিশ্বব্যবস্থার রূপকার ছিলেন আয়াতুল্লাহ খোমেনী। তিনি ছিলেন নির্যাতিত, শোষিত ও বিপন্ন মানুষের নিকটতম বন্ধু ও শিক্ষক।

সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আয়াতুল্লাহ খোমেনী যেভাবে ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তার সাথে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তা তাঁকে সমসাময়িক ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। ইমাম যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তা নতুন কোন ঘটনা ছিল না, ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় সত্যের নিশানবর্দার সকল নবী-রাসূল

লেখক ঃ প্রাবন্ধিক, কলামিষ্ট

(সাঃ) ও ইমাম-মুজাদ্দিদগণ একই আদর্শের লড়াই করে গেছেন। ইসলামের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্বের অবসান ও আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিরামহীন সংগ্রাম করেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইমাম খোমেনীর প্রয়াস ছিল তারই অনুবৃত্তি মাত্র। এ ক্ষেত্রে ইমামের অবদানকে মূল্যায়ন করতে হলে কিছুটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত তুলে ধরা প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নেতৃত্বে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে ইতিহাসের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিপ্লব সংঘটিত হয়। সে বিপ্লবের মূল চালিকা শক্তি ছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের একমাত্র মনোনীত দীন-ইসলাম। মহানবী (সাঃ) ছিলেন সমগ্র সৃষ্টিকূলের জন্য প্রশান্তির প্রতীক রহমাতুল্লিল আলামীন। তাঁরই নেতৃত্বে সংগঠিত ইসলামী বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে জাহেলী আরব সমাজের মজলুম বনি আদমেরা দাসত্বের নিগড় থেকে মুক্তি লাভ করে। সেদিন ইসলাম ও মুসলমানদের কাছে শয়তানী ও তাগুতী শক্তির চরম বিপর্যয় ঘটে। ইসলামের যে বিজয় পতাকা সেদিন তিনি উড্ডীন করে গেছেন কাল পরিক্রমায় তা নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে গেছে ধাপে ধাপে। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। মুসলমানদের এই অগ্রাভিযান প্রক্রিয়ায় তৎকালীন দুই বৃহৎশক্তি বাইজান্টাইন ও সাসানীদ সাম্রাজ্য পরাভূত হয়। সেই থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলাম ও ইসলামী সভ্যতা ছিল বিশ্বের সবেচেয়ে প্রভাবশালী শক্তি।[১] মুসলমানদের এরূপ অগ্রাভিযানকে প্রতিহত করার জন্য ইসলামের গোড়া থেকেই কাফির, ইহুদী ও খৃষ্টানরা নানাবিধ ষড়যন্ত্র শুরু করে।

ইসলামের শাশ্বত বিপ্লবী পয়গাম নিয়ে যেদিন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ময়দানে আবির্ভূত হন সেদিন তিনটি শক্তি তাদের পতনের প্রহর গুনতে থাকে। (১) তৎকালীন আরবের শোষক বণিক ও পুঁজিপতি শ্রেণী, (২) গোত্রীয় ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ক্ষমতাসীন শাসক গোষ্ঠী ও (৩) পুরোহিত ও অসাধু ধর্ম ব্যবসায়ী শ্রেণী। এ সকল গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের কারণেই মহানবী (সাঃ)-কে মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিযরত করতে হয়েছিল। মদীনায় মুসলমানদের সংহত অবস্থানকেও ঐ চক্র সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। রাসূল (সাঃ) মদীনার স্থানীয় ও অস্থানীয় সকল গোত্রের সংগে পারস্পরিক সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। মদীনার পার্শ্ববর্তী সুদখোর ইহুদী সম্প্রদায় ঐ চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিল। কিন্তু স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ইহুদীরা চুক্তি লংঘন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতী ও নাশকতামূলক কাজে নিয়োজিত হয়। সেদিন থেকে ইহুদী সম্প্রদায় বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে মুসলমানদের

বিরুদ্ধে যে শত্রুতার সূচনা করে তা আজ প্রাতিষ্ঠানিক ও আধুনিক রূপ নিয়ে বিশ্বময় ফেৎনা-ফাসাদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় ইহুদীদের বহু অন্যায় অপরাধ সত্ত্বেও তাদেরকে সাময়িকভাবে আরব ভূখন্ডে বসবাস করার অনুমতি দিলেও অনতিবিলম্বে সকল অমুসলিম জাতি গোষ্ঠীর হাত থেকে 'জজিরাতুল আরব'-কে মুক্ত করার জন্য তাঁর অন্তরঙ্গ সাহাবাদের নির্দেশ দিয়ে যান।[২] উল্লেখ্য ইহুদীরাই মহানবী (সাঃ)-কে একবার প্রস্তর নিক্ষেপ করে এবং একবার বিষ প্রয়োগে হত্যার অপচেষ্টা চালায়।

খৃষ্টানরাও গোড়া থেকেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধনে লিপ্ত হয়। রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নেতৃত্বে খৃষ্টানরা মুসলমানদের উপর হামলা চালায়। আবিসিনিয়া ও মিসরের খৃষ্টান শাসকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হয়। মহানবী (সাঃ) রোমকদের মোকাবিলা করার জন্য তাবুক পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর তিরোধানের পর এ সকল ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় পূর্ণ শক্তি নিয়ে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু মুসলমানদের ঈমানী শক্তি ও দুর্দমনীয় চেতনার কাছে তারা পরাজিত হয়। উপরন্তু ইসলামের সাহসী সৈনিকরা ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিসর, ইয়েমেন পর্যন্ত তাদের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। শুধু তাই নয়, এশিয়া আফ্রিকার ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে মুসলমানরা ইউরোপের মাটিতেও ইসলামের আলোকবর্তিকা নিয়ে যায়। স্পেনের কর্ডোভা ও গ্রানাডায় মুসলমানদের শাসনামলে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল পরবর্তীকালে তা ইউরোপের সভ্যতা বিকাশে অসামান্য অবদান রাখে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরাও অকপটে এই সত্যকে স্বীকার করে থাকেন। ঐতিহাসিক এজেপি টেল বলেন, Despite the tragedy of Spain (1610) the European civilization did not really get going until the twenteeth century.[৩] মুসলমানরা শৌর্য-বীর্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে সৌধ গড়ে তুলেছিল তা তাদের অনৈক্য, ভোগ-বিলাসিতা, অপরিণামদর্শিতার কারণে ক্রমান্বয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। মুসলমানদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইউরোপীয় খৃষ্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ১০৯৬ থেকে ১২০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত একে একে তিনটি ক্রুসেড ঘোষণা করে। তথাকথিত ক্রুসেড যুদ্ধের উপর ঐতিহাসিক টি, এ, আর্চার ও চার্লস পিভারেজ কিংসফোর্ড মন্তব্য করে বলেন, "ক্রুসেড যুদ্ধের দু'টো উদ্দেশ্য ছিলঃ (১) পবিত্র স্থানসমূহের উপর খৃষ্টান সরকারগুলোর দখল প্রতিষ্ঠা করা, এবং (২) ইউরোপে ইসলামের প্রচার ও প্রসারকে স্তব্ধ করে দেয়া।" তৃতীয় ক্রুসেডের সময় জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের সম্মিলিত বাহিনী জেরুজালেমে হামলা চালায়। কিন্তু মুসলিম সেনাপতি গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর প্রবল প্রতিরোধের মুখে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। বার

বার ধর্মযুদ্ধে পরাজিত হয়ে খৃষ্টানরা হতাশ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় তাদের কয়েকশ' বছর কেটে যায়। পরাজিত খৃষ্টানরা সম্মুখ সমরে মুসলমানদের সাথে না পেরে ইহুদীদের সাথে সম্মিলিতভাবে নানা প্রকার ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখে। এই উভয়শক্তির চক্রান্তের নীল নকশার ফলশ্রুতিতে প্যালেস্টাইন (ফিলিস্তিন) দখলের পরিকল্পনা প্রণীত হয়। তারা এসময় থেকেই একটি স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। ১৮৮২ সালে রাশিয়ায় ব্যাপক ইহুদী নিধনের পর বৃটেন ও ফ্রান্সের মত খৃষ্টান রাষ্ট্রগুলোর সহায়তায় শুরু হয় ইহুদীবাদী আন্দোলন। এ আন্দোলনের অংশ হিসাবে ফিলিস্তিনের পৈত্রিক ভিটে–মাটি থেকে মুসলমানদের বলপূর্বক ও অবৈধভাবে উচ্ছেদ শুরু করে। মুসলমানরা শুরু থেকে এর প্রতিবাদ করলেও তেমন কার্যকর কিছু প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। যে খৃষ্টান শক্তি স্পেনের আট শ' বছরের মুসলিম হুকুমতকে উৎখাত করে মুসলিম নারী–পুরুষ, শিশু–বৃদ্ধা–যুবা নির্বিচারে তলোয়ারের মুখে নিক্ষেপ করেছিল, তারাই ইহুদীদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে ফিলিস্তিনে আধিপত্যের হাত সম্প্রসারিত করে; তারাই 'লরেঞ্চ অব এরাবিয়া'র মাধ্যমে তুরস্কের ইসলামী খেলাফতের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে আরব জাতীয়তাবাদের শ্লোগান তুলে বিদ্রোহে প্ররোচনা দেয় ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তারাই তুরস্ককে শত্রুপক্ষে যোগ দিতে বাধ্য করে এবং অবশেষে সেই অপরাধে তুর্কী খিলাফতকে টুকরো টুকরো করে দেয়।[৪] ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন দখল করে ইংরেজ সেনাপতি জেনারেল এলেন বাই বলেছিলেন, "এতদিনে ক্রুসেডের পরিসমাপ্তি ঘটল।" ইতিহাসের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণী থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণে কত বেশী ঐক্যবদ্ধ ও সক্রিয়।

আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ

সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে শক্তির জোরে দুর্বল জাতিকে পদানত করে ভূখন্ড দখল, রাজনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক শোষণের একটি প্রক্রিয়া। সাম্রাজ্যবাদের শৃংখলে আবদ্ধ একটি জাতির কাছে সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে একটি অভিশাপ। পক্ষান্তরে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের কাছে উপনিবেশ হচ্ছে তাদের কাছে 'White man's burden'; বা 'শ্বেতাঙ্গদের বোঝা'। সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা এক এক জনের কাছে এক এক রকম। পাশ্চাত্য পন্ডিতরা সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞা দিয়েছেন তার কোন কোনটিতে সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ প্রতিফলিত হয়েছে। Raymond H. Buell বলেন, "Every unjustifiable demand made by one government upon another -every aggressive war is called imperialistic. Imperialism is a word which indeed covers many sins.[৫] মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী

Charles Hodges এর মতে সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে "A projection externally, directly or indirectly , of the alien political, economic, or cultural power of one nation into the internal life of another people..... it involves the imposition of control, open or convert, direct or indircet of one people by another.[৬] সাম্রাজ্যবাদের উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে দেখা যায়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপর জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার কালো হাত বিস্তার করে থাকে।

চতুর্দশ শতকের শেষদিকে দারিদ্র প্রপীড়িত ইউরোপের বিভিন্ন জাতিগুলো বাঁচার তাগিদে বহির্বিশ্বে তাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। এ সময় তারা নৌ পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি অর্জন করে। তারা বড় বড় জাহাজ নির্মাণ করে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার সমৃদ্ধশালী দেশগুলোর উদ্দেশ্যে সাগর-মহাসাগর পাড়ি দেয়। এভাবে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, পর্তুগাল, স্পেন প্রভৃতি দেশের দস্যু ও লুটেরা গোষ্ঠী ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। প্রথমে নিছক ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রমান্বয়ে ঐসব দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে তারা আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তারা এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও অনৈক্যের সুযোগে তাদের অবস্থান মজবুত করে এবং চাতুর্য, কপটতা ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা ঐসব দেশের বহু মূল্যবান সম্পদ ইউরোপে পাচার করতে থাকে। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনের ফলে শেষ পর্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ মুসলিম ভূখন্ড তাদের স্বাধীনতা বিকিয়ে দেয়। সাম্রাজ্যবাদীদের দীর্ঘকালের শাসন-শোষণে মুসলমানরা একদিকে অর্থনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত হয় এবং অপরদিকে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের চিন্তা-চেতনার দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। ইউরোপীয়রা এসব দেশ থেকে লুন্ঠন করে নিয়ে গেছে অঢেল সম্পদ; কিন্তু রেখে গেছে তাদের বিভ্রান্ত চিন্তার ফসল-একদল তথাকথিত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত গোষ্ঠী। সাম্রাজ্যবাদী শৃংখল থেকে নিজ জাতিকে মুক্ত করার জন্য বহু মুসলিম মুজাহিদ আমরণ লড়াই করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা এ জাতীয় সংগ্রামকে নাস্তানাবুদ করে দিয়েছে। উপমহাদেশে এরূপ বহু ঘটনা রয়েছে। অপরদিকে তাদেরই সৃষ্ট পাশ্চাত্য শিক্ষিত দেশীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে তারা পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে। এরাই আবার সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্ম দেয়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তরকালে যুদ্ধক্লান্ত ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো তাদের উপনিবেশ থেকে পাততাড়ি গুটাতে শুরু করে। উপনিবেশ ত্যাগের প্রাক্কালেও তারা ষড়যন্ত্রের

মোহ ত্যাগ করতে পারেনি। বিভিন্ন দেশে তারা যে পদলেহী গোষ্ঠী তৈরী করেছিল তাদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে আসে। বিশ্বে আজ ছোট বড় প্রায় অর্ধশত মুসলিম রাষ্ট্র স্বাধীনতার আস্বাদ লাভ করে চলেছে। সাম্প্রতিককালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক আগল ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে আরো অর্ধ ডজন মুসলিম রাষ্ট্র। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের কারণে অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রেরই নেতৃত্বে রয়েছে গণ-বিরোধী শক্তি, কোথাও রাজতন্ত্র, কোথাও স্বৈরতন্ত্র, কোথাও বা সামরিকতন্ত্র। বিশাল ভূখন্ড, বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদ নিয়ে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদের একটা ভাল অবস্থানে থাকার কথা। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা, সামরিক দৌর্বল্য ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকার কারণে তারা পরাশক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে আছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উত্থান

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, বিশেষতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে এবং যুদ্ধকালীন সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব রাজনীতিতে তার প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য চেষ্টা করতে থাকে। এর মূল কারণ হলো তার অর্থনৈতিক শক্তি ও আধিপত্য। একদিকে ইউরোপীয় শক্তির অবক্ষয় ঘটে, অন্যদিকে আমেরিকা তার সম্প্রসারিত অর্থনৈতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বে নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পায়। যেহেতু যুদ্ধে আমেরিকার তেমন কোন ক্ষতি ও ধ্বংস হয়নি, অথচ এর বিপরীতে ইউরোপীয় দেশগুলোর বিশেষ ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়; তাই আমেরিকা একটি বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে। যুদ্ধজনিত কোন ক্ষয়-ক্ষতি আমেরিকাকে তো স্পর্শ করেইনি; উপরন্তু যুদ্ধ সামগ্রী উৎপাদন করে সে প্রচুর অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করে। যুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলোতে আমেরিকার রাজধানী বিশ্ব বাজারসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের সংগে আমেরিকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক একচেটিয়া ও একক রূপলাভ করে এবং তার শরীকদের অর্থনৈতিক ও আর্থিক অবস্থা পর্যদুস্ত করে দেয়।[৭]

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়। সাম্যবাদের নামে রাশিয়া তার আশে-পাশে আগ্রাসন চালিয়ে বহু দেশে সমাজতন্ত্র চাপিয়ে দেয়। বিশেষ করে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন মুসলিম প্রজাতন্ত্রকে সোভিয়েত ইউনিয়নে যোগ দিতে বাধ্য করে। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃত্ব নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নও পরাশক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়। দুই বৃহৎ পরাশক্তির স্নায়ুযুদ্ধের ফলে দীর্ঘ চার-পাঁচ দশক ধরে বিশ্বে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি বিরাজ করে। দুই ব্লকের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতার ফলে যে ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের পাহাড় জমে উঠেছে, তার পেছনে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়েছে তা

সংগৃহীত হয়েছে উন্নয়নশীল বিশ্বের জনগণের কাছ থেকে শোষণের মাধ্যমে।[৮] সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে পরাশক্তির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এখন আমেরিকা একাই বিশ্ব রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। সে এখন জাতিসংঘকেও নিজের মত চালাতে চায়।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের খপ্পরে ইরান

আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন ও শক্তিশালী পাহলভী রাজবংশের সর্বশেষ সম্রাট মোহাম্মদ রেজা শাহ আমেরিকার ছত্রছায়ায় ইরানে বিত্ত-বৈভবের প্রাসাদ গড়ে তুলেছিল। প্রতিষ্ঠা করেছিল স্বৈরতন্ত্রের লৌহকপাট। সে ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বরকন্দাজ ও ইরানের মজলুম মানুষের শোষণের প্রতিভূ। শাহ শুধু তার দেশে অর্থনৈতিক শোষণ চালিয়েই ক্ষান্ত হয়নি; রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অংগনেও সে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল। তার আমলে ইরানী জাতির মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয় এবং শাহ-বিরোধী যে কোন তৎপরতাকে কঠোর হস্তে দমন করা হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলতে কিছু ছিল না। 'সাভাক' নামক গুপ্ত পুলিশ বাহিনী শাহ-বিরোধী শত-সহস্র লোককে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করে এবং চরম নির্যাতন চালিয়ে পঙ্গু করে দেয়।

'মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ইরানের ইসলামী ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য শাহ বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে। পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণা ও সংস্কৃতিকে সে ইরানবাসীর উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ও মদ-জুয়ার সয়লাবে গোটা দেশ ভেসে যাবার উপক্রম হয়েছিল। এসবের সমর্থনে পাশ্চাত্য মনোভাবাপন্ন একটা তথাকথিত অভিজাত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গড়ে তোলা হয়েছিল। তারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধের পরিবর্তে পাশ্চাত্য-মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছিল।'[৯]

আধুনিক প্রযুক্তি আনয়নের নামে শাহ ইরানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও অর্থনীতিকে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের করুণার উপর ছেড়ে দিয়েছিল। ইরানের সশস্ত্র বাহিনী মার্কিন সামরিক বিশেষজ্ঞদের দ্বারাই পরিচালিত হত। গুপ্ত পুলিশ বাহিনী সাভাকের প্রশিক্ষণ দেয়া হত ইসরাইলে। জনগণকে শোষণ করে অর্জিত অর্থ এবং তেলের বিনিময়ে সে অঢেল অস্ত্র আমদানী করেছিল। এভাবে মধ্য এশিয়ায় আমেরিকার পদলেহী একটা সামরিক শক্তি হিসাবে ইরানকে গড়ে তোলা হয়েছিল। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদেরকেও পাশ্চাত্য ধাঁচে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল।[১০]

ইরানের তেল সম্পদের বিরাট লভ্যাংশ বৃটেন ও মার্কিন তেল কোম্পানীগুলোর হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল। বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো ইরানে তাদের প্রভাব

সম্প্রসারিত করেছিল। বস্তুতঃ ইরানের অর্থনীতিকে পরনির্ভরশীল এবং বিশ্ব পুঁজিবাদের চারণভূমিতে পরিণত করা হয়েছিল। বিশ্ব পুঁজিবাদী চক্র সম্পদ আর প্রাচুর্যে টই-টুম্বুর ইরান থেকে সম্পদ লুটের জন্য রেজা শাহকে পুতুল হিসাবে ব্যবহার করতো। অপরদিকে গণবিচ্ছিন্ন শাহ জনগণের ঘৃণার মুখেও ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য পাশ্চাত্যের অনুগত ভৃত্যে পরিণত হয়েছিল।[১১]

ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পূর্বে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা যে সকল ক্ষেত্রে তার আধিপত্যবাদী হাত সম্প্রসারণ করেছিল তার কিছু দৃষ্টান্ত[১২] নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

(১) ১৯৫৩ সালে সংঘটিত অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের পেছনে আমেরিকা গোপন ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য, এই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জনগণের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করা হয় এবং শাহকে ক্ষমতায় বসানো হয়। এটা ছিল ইরানে সংঘটিত আমেরিকার সবচাইতে বড় অপরাধ। এর ফলে সেদিন জনগণের উপর চেপে বসা রেজা শাহ পরবর্তীকালে যত অপরাধ করেছে তার জন্য আমেরিকাই দায়ী।

(২) ১৯৬২ সালে "হোয়াইট রেভ্যুলেশন" নামে যে গণভোটের আয়োজন করা হয় তার পরিকল্পনা দিয়েছিল আমেরিকা। তথাকথিত এ গণভোটের মাধ্যমে শ্বেত বিপ্লবের নামে ইরানের কৃষি শিল্পকে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

(৩) ১৯৬২ সালের ৫ জুন নিরীহ ও নিরস্ত্র ১৫ হাজার ইরানী জনতাকে শাহের বাহিনী অন্যায় ও নির্মমভাবে হত্যা করে। এদের অপরাধ ছিল তারা ইসলামী আদর্শের অনুসারী এবং তারা শাহের অপকর্মের প্রতিবাদ করছিল।

(৪) শাহের গঠিত গোপন নিরাপত্তা বাহিনী সাভাকের সদস্যদেরকে সর্বাধুনিক নির্যাতনের কলা-কৌশলের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল সিআইএ ও ইসরাইলের বিশেষজ্ঞরা। এ বাহিনীর নির্যাতন ও হত্যার শিকার হয় হাজার হাজার প্রতিবাদী মানুষ।

(৫) ১৯৬২ সালে ক্যাপিটুলেশন আইন চাপিয়ে দেয়া হয়, যার ফলে ইরানে বসবাসকারী আমেরিকানদের যে কোন অপরাধের বিরুদ্ধে ইরানীরা বিচারের অধিকার হারায়।

(৬) ইরানের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়ে তাকে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও আমেরিকান ট্রাস্টের কার্টেল পদ্ধতির আওতায় আনা হয়।

(৭) ইরানের প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে ইউরেনিয়াম, তামা, তেল ইত্যাদি বিভিন্ন কায়দায় আমেরিকানরা লুণ্ঠন করে।

(৮) ইরানের ঐতিহ্যবাহী ইসলামী সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে পাশ্চাত্যের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে ইরানী জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়ার সকল কর্মসূচীতে আমেরিকা মদদ দেয়।

(৯) ইরানের কৃষি ও পশু সম্পদ শিল্পকে ধ্বংস করে দিয়ে তাকে পাশ্চাত্যের উপর নির্ভরশীল করে তোলা হয়।

(১০) ইরানের তরুণ সমাজকে উচ্ছৃংখল তথা আমেরিকার জীবনধারার প্রতি অনুরাগী ও মাদকাসক্ত করে তোলা হয়।

(১১) ইরানী সশস্ত্র বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে আমেরিকার উপর নির্ভরশীল করে তোলা হয়। ইরানী বাহিনীকে অস্ত্র সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যার ফলে পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় ইরান মার্কিন স্বার্থ রক্ষার কাজে নিয়োজিত হয়।

(১২) ১৯৭৮ সালে ৮ সেপ্টেম্বর 'কালো শুক্রবার' হাজার হাজার বিক্ষোভরত ইরানীকে হত্যা করা হয় এবং মার্কিন তল্পীবাহক ইরানী নিরাপত্তা বাহিনী এ নির্মম কাজটি করে।

(১৩) ইসলামী বিপ্লবের বিজয়ের প্রাক্কালে ইউরোপে নিযুক্ত মার্কিন সেনা কমান্ডার ইরানে উপস্থিত হয়ে ইসলামী বিপ্লবকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। তেহরানের মার্কিন দূতাবাসে গোয়েন্দাবৃত্তির যে পরিকল্পনা ও দলিল তৈরী করা হয়েছিল তার পেছনে এ কমান্ডারের হাত ছিল।

ইসলামী বিপ্লবের সাফল্যের পরও আমেরিকা এক মুহূর্তের জন্য ইরানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র থেকে বিরত থাকেনি। ইসলামী প্রজাতন্ত্রটিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়ার জন্য আমেরিকা যে সব চক্রান্ত করেছিল তার কিছু ফিরিস্তি[১৩] নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

(১) আমেরিকার ব্যাংকে গচ্ছিত ইরানের হাজার হাজার কোটি ডলার মার্কিন সরকার আটক করে। ইতিপূর্বে যে সকল পণ্য ক্রয়ের জন্য ইরান অর্থ পরিশোধ করেছিল আমেরিকা তার সরবরাহ বন্ধ করে দেয়।

(২) শাহের বিভিন্ন অপকর্মের সহযোগীদেরকে আমেরিকায় আশ্রয় দেয়া হয়। এমনকি সিংহাসনচ্যুত শাহকেও আশ্রয় দিয়ে লালন-পালন করে। ইরানের ইসলামী সরকারের উপর্যুপরি অনুরোধ এবং এ বিষয়ে মার্কিন সরকারের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ঐ সকল অপরাধীকে ইরানে ফেরৎ পাঠানো হয়নি। ইরানী জনগণের বিরুদ্ধে এভাবে দাঁড়িয়ে আমেরিকা আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করে।

(৩) মার্কিন সরকারের অব্যাহত হস্তক্ষেপ ও অপরাধের পরও তারা ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক আগ্রাসন চালানোর পাঁয়তারা করে। তারা রাতের অন্ধকারে তস্করের মত হেলিকপ্টার গানশীপ ও সৈন্য পাঠায় ইরানের অভ্যন্তরে হামলা চালানোর জন্য। অবশ্য আল্লাহর অসীম কুদরতে তা তাবাস মরুভূমিতে বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

(৪) মার্কিন অপকর্মের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে বিক্ষোভরত মুসলিম ছাত্রদেরকে মার্কিন পুলিশ অন্যায়ভাবে আটক করে ও নির্যাতন চালায়।

(৫) ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে এবং কমন মার্কেটভুক্ত দেশগুলোকে তাতে যোগ দিতে প্ররোচিত করে।

(৬) ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য ইরাকের ইসলাম বিরোধী বাথ সরকারকে প্ররোচিত করে এবং বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার সাহায্য দিয়ে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ইরাককে মদদ যোগায়।

(৭) ইরানের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও স্পীকারসহ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে হত্যা করার পেছনে মার্কিন হাত সক্রিয় ছিল।

এমনিভাবে আরো বহু মার্কিন অপরাধের বিবরণ রয়েছে যা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তুলে ধরা সম্ভব নয়।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইমাম খোমেনীর সংগ্রাম

সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, আধিপত্যবাদ, ইহুদীবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে আয়াতুল্লাহ খোমেনী ছিলেন এক জ্বলন্ত বিদ্রোহ। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি যে আপোষহীন দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদীবাদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়ে ইমাম মুসলিম উম্মাহকে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার আহবান জানান। মুসলমানদের প্রকৃত শত্রুকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে তিনি প্রজ্ঞা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেন।

ইমাম খোমেনী পরাশক্তির স্বরূপ উদঘাটন করতে যেয়ে বলেন,

"প্রকৃত বিষয় হচ্ছে এই যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শক্তিমদমত্ত সরকারগুলো বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কার্যতঃ বিশ্বকে 'ফ্রি' ও 'কোয়ারেন্টাইন-এ দু'ভাগে বিভক্ত করে রেখেছে। মুক্ত অংশের পরাশক্তিগুলো কোন আইনানুগ সীমারেখা ও ভৌগোলিক অবস্থান মানে না। অন্যদের স্বার্থের উপর আগ্রাসন চালানো, জাতিসমূহকে শাসন, শোষণ ও দাস বানানোকে তারা জরুরী, স্বীকৃত ও আইনসম্মত বলে মনে করে। অপরদিকে কোয়ারেন্টাইন এলাকায় দুঃখজনকভাবে বিশ্বের বেশীরভাগ দুর্বল জাতি, বিশেষ করে

মুসলমানরা বন্দী হয়ে আছে–তাতে তাদের বেঁচে থাকার এবং মত প্রকাশের কোন অধিকার নেই। এসব দেশের আইন–কানুন, নীতি–ফরমূলা সবই ওদের নির্দেশিত গোলামদের মনঃপূত এবং শক্তি মদমত্তদের স্বার্থরক্ষাকারী।"[১৩]

সাম্রাজ্যবাদের কালো চরিত্র চিত্রণের পর ইমাম খোমেনী তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন,

"আমরা বিশ্বে ইহুদীবাদ, পুঁজিবাদ ও কমিউনিজমের পচা বিষমূলসমূহকে সমূলে জ্বালিয়ে দিতে চাই। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, মহামহিম আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ও করুণায় এ তিন স্তম্ভ–ইহুদীবাদ, পুঁজিবাদ ও কম্যুনিজমের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থাসূহকে নাস্তানাবুদ করবো এবং রাসূল (সাঃ)–এর নেজামে ইসলামকে দাম্ভিক কুফরী বিশ্বে ছড়িয়ে দেবো। আজ হোক কাল হোক শিকলবদ্ধ জাতিসমূহ তা প্রত্যক্ষ করবে।"[১৪]

আয়াতুল্লাহ খোমেনী শুধু কথায় নয়, কাজেও সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তির উদ্ধত ফনাকে দাবিয়ে দেয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধানে পররাষ্ট্রনীতিকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতির ভিত্তিতে এবং ইসলামের নীতিমালা ও ভাবধারার সংগে সংগতি রেখে প্রণয়ন করা হয়। ইরানের সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–

'The foreign policy of the Islamic Republic of Iran shall be based on negation of any kind of domination and beign dominated, protection of overall independence and territorial integrity of the country, depending the rights of all moslems and the non-alignment policy before dominating powers and mutual peaceful relations with wonbelligerent countries."[১৫]

সংবিধানের ১৫৩ অনুচ্ছেদে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যূহ রচনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে,

"Any conventions resulting in domination of all aliens over natural and economic resources as well as over the culture and army and any other domains of the country shall not be allowed."[১৬]

ইরানী সংবিধানের উপরোক্ত ভাষ্য থেকে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, আয়াতুল্লাহ খোমেনী ইসলামী প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্র নীতিকে সর্বপ্রকার আধিপত্যবাদ

কিংবা তার কাছে আত্মসমর্পণের প্রতি অস্বীকৃতি, মুসলিম অধিকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনকারী দেশের সর্বাত্মক স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা সংরক্ষণ, আধিপত্যবাদী শক্তিবর্গের মোকাবিলায় জোটনিরপেক্ষতা এবং সংঘাতমুক্ত রাষ্ট্রবর্গের সাথে পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করেন এবং জনগণ কর্তৃক নিরংকুশভাবে তা অনুমোদিত হয়।[১৭]

উপরোক্ত নীতিভংগির আলোকেই ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বাধীন ইরান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শক্তিবর্গের প্রতি আপোষহীন মনোভাব, বিশ্ব জালেমদের মোকাবিলায় বিশ্ব-মজলুমদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন, পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় অনাবিল শান্তি, বিশ্বব্যাপী মুসলিম সংগ্রামীদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন ইত্যাদি বিষয়কে পররাষ্ট্রনীতির উল্লেখযোগ্য উপাদানরূপে গ্রহণ করে। ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিপ্লবের সাফল্যের অব্যবহিত পরেই ইমাম খোমেনী তাৎক্ষণিকভাবে সাম্রাজ্যবাদের করাল গ্রাস থেকে ইরানকে মুক্ত করার জন্য যে সব নীতিগত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত[১৮] গ্রহণ করেন তা নিম্নরূপঃ

(ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন 'সেন্টো' চুক্তি বর্জন;

(খ) জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে ইরানের যোগদান;

(গ) ১৯৫৯ সালের ইরান-আমেরিকা চুক্তি বাতিলকরণ;

(ঘ) ইহুদীবাদ, বেআইনী দখলদার ও লুটেরা ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্নকরণ:

(ঙ) ফিলিস্তিনী মুক্তি আন্দোলনকে স্বীকৃতি দান এবং ইরানে ফিলিস্তিনী দূতাবাস স্থাপনের অনুমতি প্রদান;

(চ) আমেরিকায় তেল রপ্তানী বন্ধকরণ;

(ছ) বিশ্বের সকল নির্যাতিত মানুষের মুক্তি আন্দোলনে সাহায্য প্রদান;

(জ) ইরানে তেল উৎপাদন ৬ মিলিয়ন ব্যারেল থেকে ২ মিলিয়নে হ্রাসকরণ;

(ঝ) সোভিয়েত ইউনিয়নে গ্যাস সরবরাহ বন্ধকরণ;

(ঞ) ক্যাপিটিউলেশন আইন বাতিলকরণ;

(ট) শাহ আমলের অপরাধী নেতৃত্ব ও মার্কিন গোলামদের বিচারের নির্দেশ;

(ঠ) ক্যাবার, নৃত্যক্লাব, বেশ্যাখানা, জুয়ার আড্ডা ও ক্যাসিনোসহ দুর্নীতি ও চরিত্র হননের পশ্চিমা স্টাইলের সকল উৎস কেন্দ্র বন্ধকরণ;

(ড) ১৯২১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির ৪র্থ ও ৫ম

অনুচ্ছেদ বাতিল; উল্লেখ্য ঐ চুক্তির আওতায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরানের কোন কোন অঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং আভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপ করতে পারতো;

(ঢ) আমেরিকার সাথে সকল প্রকার সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্নকরণ;

(ণ) ইরান থেকে এক লক্ষাধিক আমেরিকান সামরিক উপদেষ্টা ও বেসামরিক লোককে বহিষ্কারকরণ এবং গোয়েন্দাবৃত্তির অভিযোগে ইরানে আমেরিকান সেন্টার বন্ধকরণ;

(ত) ইরানে কূটনীতির নামে কর্মরত যে সকল ব্যক্তি ও কর্মচারী জঘন্য গোয়েন্দাবৃত্তিতে লিপ্ত ছিল তাদের গ্রেফতারকরণ;

(থ) শাহের আমলে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানী থেকে আণবিক ঘাঁটি নির্মাণ, কনকর্ড বিমান ক্রয় ও অতিরিক্ত অস্ত্র ক্রয়ের যে সকল চুক্তি করা হয়েছিল তা বাতিলকরণ:

(দ) দক্ষিণ আফ্রিকা, চিলি ও মিসরের পুতুল সরকারের সাথে সকল কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্নকরণ:

(ধ) ইরানে আমেরিকা কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ ও হস্তক্ষেপের বিষয় বিবেচনার জন্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠান;

(ণ) প্যালেস্টাইন, আফগানিস্তানসহ যে সকল মুসলিম ভূখন্ড আধিপত্যবাদের শিকার তাদের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন জ্ঞাপন;

(প) প্যালেস্টাইন ও জেরুজালেম মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থনসূচক প্রতিবছর রমজানের প্রথম শুক্রবার 'কুদস দিবস' পালনের ঘোষণা; এবং

(ফ) শাহের আমলে ইহুদীবাদী আন্দোলনের প্রচারের জন্য প্রতিবছর ৫২০ মিলিয়ন ডলার মঞ্জুরী দেয়া হত তা বন্ধকরণ।

ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও তার চাঁইদের প্রতি বিরাট চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। এসব বিপ্লবী সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে ইমামের যে দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে তার মূল বৈশিষ্ট্য হলোঃ 'প্রাচ্য নয়–পাশ্চাত্য নয়'। এই শ্লোগানের তাৎপর্য হলো, প্রাচ্যের কম্যুনিষ্ট শক্তিবর্গ ও পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক শক্তিবর্গসহ সকল অপশক্তির প্রতি চূড়ান্ত অস্বীকৃতি।

ইমাম খোমেনী ইরান ও মুসলিম বিশ্ব তথা দুনিয়ার সকল মজলুম মানুষের মুক্তির

সপক্ষে যে সকল অবিস্মরণীয় বক্তব্য রেখেছেন তার কতিপয় উদাহরণ নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

স্বৈরাচারী শাহের বিরুদ্ধে ইমাম

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তল্পিবাহক ও মজলুম মানুষের রক্ত শোষক রেজা শাহের অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে ইমাম খোমেনী ১৯৪১ সালে 'কাশফ-আল-আসরার' (রহস্য উন্মোচন) গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে বিরামহীন সংগ্রাম শুরু করেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি শাহের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে বলেন,

> "যে সরকার দেশের আইন ইনসাফের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, পুলিশের পোশাকে একদল দুবৃত্তকে নিরীহ ও সতী নারীদের অবমাননা করার নির্দেশ দেয়, এবং গর্ভবতী নারীকে লাথি মেরে গর্ভপাত ঘটানোর আদেশ দেয় সে সরকার জালেম সরকার। ..... স্বৈরতান্ত্রিক শাসক দস্যু রেজাশাহের ইস্যুকৃত নির্দেশাবলীর আদৌ কোন মূল্য নেই। তার পার্লামেন্টে গৃহীত আইনগুলো মুছে ফেলতে হবে, পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ঐ মূর্খ সৈনিকটির মগজ থেকে যে সব অর্থহীন শব্দ বেরিয়ে এসেছে তার সব নির্মূল করতে হবে। এবং একমাত্র আল্লার আইন টিকে থাকবে এবং তা কালের ধ্বংসকে প্রতিরোধ করবে।[১৯]

তথাকথিত শ্বেত বিপ্লবের বিরুদ্ধে ইমাম

ইরানে মার্কিন বিরোধী গণ-অভ্যুত্থানকে প্রতিহত করার জন্য রেজাশাহ আমেরিকার নির্দেশে 'শ্বেত বিপ্লব' বা 'শাহ ও জনতার বিপ্লব' নামে একটি কৃত্রিম সংস্কারমূলক কার্যক্রম চালু করার উদ্যোগ নেয়। মার্কিন হোয়াইট হাউসে এর পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছিল বলে ইরানীরা ব্যঙ্গ করে একে বলতো 'হোয়াইট রেভ্যুলেশন'। ইরানের আলেম সমাজ বিশেষ করে আয়াতুল্লাহ খোমেনী শাহের এই ভন্ডামীর বিরুদ্ধে জনগণকে সতর্ক করে দেন। স্বৈরাচারী শাহ বহির্বিশ্বে তার তথাকথিত বিপ্লবের প্রতি জনসমর্থন দেখানোর জন্য গণভোট অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়। ইমাম খোমেনী ১৯৩৬ সালের ২৬ জানুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য ঐ গণভোট বর্জনের জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান। ইমামের ঐ আহবানের প্রেক্ষিতে বৃটেন ও আমেরিকার সংবাদপত্রগুলো প্রচারণা চালাতে থাকে যে, 'ইরানের গোড়া, প্রতিক্রিয়াশীল ও চরমপন্থী মোল্লারা শাহের ভূমি সংস্কার ও নারী মুক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছে; তারা চার্চের ভূমি ফিরে পেতে চায় এবং মেয়েদের আপাদমস্তক ঢেকে রাখতে চায়'। ইমাম খোমেনী এ সময় অত্যন্ত কড়া ভাষায় শাহের বিরুদ্ধে জনগণকে রুখে দাঁড়ানোর আহবান জানান। তিনি বলেন-

> "আপনারা শাসক গোষ্ঠীর বেআইনী কার্যকলাপ রুখে দাঁড়ান। চরম পরীক্ষার

ভয়েও ভীত হবেন না। সরকার যদি শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে তাহলে নতি স্বীকার করবেন না। শাহ এবং জনগণের মধ্যে এত বিচ্ছিন্নতা কেন, কেনইবা এত পার্থক্য? ..... আমরা মুসলিম আলেম সমাজ ইসলামের জন্যই সংগ্রাম করি। কোন শক্তি তা যত বড়ই হোক না কেন, আমাদের স্তব্ধ করে দিতে পারবে না।"[২০]

উল্লেখ্য, ইরানী জনগণ ঐ গণভোট বর্জন করে। কিন্তু শাহ ঐ বিপ্লবের নামে ইরানের কৃষিকে ধ্বংস করে।

ক্যাপিটিউলেশন আইনের বিরুদ্ধে ইমাম

ইরানের পার্লামেন্ট আমেরিকা ও তার তল্পীবাহক রেজাশাহের প্রভাবে ক্যাপিটিউলেশন বিল নামে একটি কুখ্যাত আইন পাশ করে। এর মাধ্যমে ইরানে বসবাসরত মার্কিনী নাগরিকদের এমন কিছু সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয় যা পৃথিবীর কোন দেশে বিদেশী নাগরিকরা পেতে পারে না। এ আইনের ফলে মার্কিন কোন নাগরিক ইরানে কোন অপরাধ করলে তার বিচারের উপায় ছিল না। ইমাম খোমেনী এ আইনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের সংগে বলেন,

"আমেরিকান কোন সৈনিকের কুকুর যদি শাহকে কামড়ায় তাহলেও শাহের প্রতিকার চাওয়ার মত কোন আইনগত ভিত্তি নেই।"[২১]

প্রায় একই সময় শাহ যুক্তরাষ্ট্র থেকে অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত অস্ত্র ক্রয়ের জন্য ২০০ মিলিয়ন ডলারের এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। ইমাম তাৎক্ষণিকভাবে ঐ চুক্তির সমালোচনা করে বলেন,

"শাহের এ চুক্তি অনুমোদন করে মজলিস যে ভোট প্রদান করেছে তা অবৈধ ও সুস্পষ্টভাবে কোরআনের নীতি বিরোধী।"[২২]

ইমাম ইরানের সেনাবাহিনীর প্রতি এক আবেদনে তাদেরকে জেগে উঠতে বলেন এবং শাহকে উৎখাত করার আহবান জানান। তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন যে, তারা যেন এ স্বৈরতন্ত্রকে আদৌ বরদাশত না করে, এরা ইরানকে পুরোপুরি দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

তেল সম্পদ লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে ইমাম

ইরানের শাহ তার দেশে তেল সম্পদকে বলতে গেলে আমেরিকার হাতে তুলে দিয়েছিল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত (৬ মিলিয়ন ব্যারেল) তেল উত্তোলন করে তেলের মূল্য হ্রাস করার সুযোগ করে দেয়া হয় এবং তাতে লাভবান হয় পশ্চিমা দেশগুলো। শাহ তেল বিক্রয়লব্ধ অর্থ জনগণের কল্যাণে ব্যয় না করে তার বিলাসিতা এবং অহেতুক

সামরিক শক্তি বৃদ্ধির কাজে ব্যয় করতো। ফলশ্রুতিতে ঘুরে ফিরে ইরানী তেলও পাশ্চাত্যে যেতো এবং তেল বিক্রির ডলারও তাদের হাতেই ফিরে যেত। ইমাম খোমেনী এক ভাষণে বলেন,

"আমাদের তেল সম্পদ আমেরিকা ও অন্যদের দিয়ে দেয়া হয়েছে। এটা সত্য যে সরবরাহকৃত তেলের বিনিময়ে আমেরিকা অর্থ দিয়েছে। কিন্তু সে অর্থ অস্ত্র ক্রয় ও আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি নির্মাণে ব্যয় করা হয়েছে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে, প্রথমে আমরা তাদেরকে আমাদের তেল দিয়েছি। আমেরিকা এভাবে কূট কৌশলের মাধ্যমে (এ কূট-কৌশলে ঐ ব্যক্তিও সহযোগী হিসাবে কাজ করেছে) আমাদের নিকট থেকে দ্বিগুণ লাভবান হয়েছে।"[২৩]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর ইরান তার তেল সম্পদের উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য নির্ধারণ ও বাজার নিয়ন্ত্রণে ইরান ওপেকের প্রভাবশালী সদস্য হিসাবে সাহসী ও দৃঢ় ভূমিকা পালন করছে।

প্রতিবিপ্লব ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ইমাম

যে কোন বিপ্লবের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হলে সে সরকার বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিশেষতঃ পরাশক্তিগুলোর সমর্থন ও স্বীকৃতি কামনা করে থাকে। ইমাম খোমেনী জনগণের শক্তি ও আধ্যাত্মিকতার অনুভূতিতে বলীয়ান হয়ে বিপ্লবের পরে কোন শক্তির নিকট মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে বিরত থাকেন। যেখানে এরূপ ক্ষেত্রে পরাশক্তিগুলো করুণা বিতরণের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে সেখানে ইমাম খোমেনীর স্বাধীনচেতা মনোভাব তাদেরকে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ করেছে। আর সে কারণে প্রতি বিপ্লবী ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও অন্তর্ঘাতি তৎপরতার মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লবকে নস্যাত করে দেয়ার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা চক্রান্তে লিপ্ত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্ররোচনায় কম্যুনিস্টরা এবং মার্কিনীদের প্ররোচনায় তথাকথিত উদারপন্থীরা প্রতিবিপ্লবের জন্য চেষ্টা চালাতে থাকে। ইমাম খোমেনী প্রথমদিকে কিছুটা নমনীয় ভূমিকা গ্রহণ করলেও পরিস্থিতির গভীরতা উপলব্ধি করে পরবর্তীতে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। ইমাম ঐ সন্ত্রাসীদের সম্পর্কে ইরানীদের সতর্ক থাকার আহবান জানিয়ে বলেন,

"সারা দেশে ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সংগঠিত সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য বোমা বিস্ফোরণের পিছনে দুষ্কৃতকারী মার্কিন সরকারের কারসাজি রয়েছে। ..... আমাদের ইসলামী উম্মাহকে খোদায়ী শক্তির উপর ভরসা করতে হবে এবং মুনাফিকদের এ সকল বোমা বিস্ফোরণকে ভয় করলে চলবে না। বিদেশী শক্তির বিকারগ্রস্ত এজেন্টরা এগুলো করছে এবং এ সকল ধ্বংসাত্মক

কাজ ও অন্তত তৎপরতার মাধ্যমে তারা নিজেদের হাতে নিজেদের কবর খনন করছে। ..... বামপন্থী, ডানপন্থী ও বিগত আমলের পচে যাওয়া গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকুন।"[২৪]

মার্কিনীদের গুপ্তচরবৃত্তি ও চোরাগোপ্তা হামলার বিরুদ্ধে ইমাম

১৯৮০ সালের ২৫ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অত্যাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত হেলিকপ্টার গানশিপ চোরাপথে ইরানের তাবাস মরুভূমি এলাকায় প্রবেশ করে এবং আল্লাহর অসীম কুদরতে অলৌকিকভাবে একটার পর একটা ধ্বংস হয়ে যায়। এ ঘটনায় মার্কিনীরা হতভম্ব হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ইরানী মুসলমানদের ঈমান বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

স্মরণ করা যেতে পারে, ইসলামী বিপ্লবের পর ১৯৭৯ সালের ৪ নভেম্বর তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপ্লবী ছাত্ররা এক ঝটিকা অভিযান চালিয়ে মার্কিন দূতাবাস ভবন দখল করে নেয়। তারা সেখানে ৫২ জন কূটনীতিক নামধারী গুপ্তচরকে জিম্মি হিসাবে আটক করে এবং দাবী করে যে, শাহকে অবিলম্বে আমেরিকা থেকে ফেরৎ দিতে হবে এবং মার্কিন ব্যাংক ও কোম্পানীগুলোর কাছে ইরানী অর্থ ও শেয়ার বাবদ প্রাপ্য হাজার হাজার কোটি ডলার ইসলামী ইরানকে ফেরৎ দিতে হবে। ছাত্ররা দূতাবাসের মাইক্রো ফিল্মে সংরক্ষিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্রও হস্তগত করে। এসব দলিলে ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ছাড়াও পাকিস্তান, তুরস্ক, সৌদি আরব, কুয়েত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বহু দেশের ব্যাপারে মার্কিন গোপন পরিকল্পনা সংরক্ষিত ছিল। ঘটনায় মার্কিন প্রশাসন বিব্রত বোধ করে। নানা প্রকার চাপ দিয়েও যখন জিম্মি মুক্ত করতে তারা সক্ষম হচ্ছিল না, তখন রাতের অন্ধকারে ইরানের ভূখণ্ডে কমান্ডো অভিযান চালায়। এ ঘটনায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ইমাম খোমেনী বলেন,

"কার্টারের বুঝা উচিত মার্কিনীদের উপর এ নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ কাজের এমনই প্রতিক্রিয়া হবে যে, তার সমর্থকরা দুশমনে পরিণত হবে। কার্টারের আরো বুঝা উচিত, এ বিশ্রী কাজের জন্য তার রাজনৈতিক ভাবমূর্তি শূন্যের কোঠায় নেমে যাবে। প্রেসিডেন্ট হওয়ার আশা তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। এ কাজের মাধ্যমে কার্টার প্রমাণ করেছে যে, সে চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। আমেরিকার মত বিশাল দেশ শাসন করার যোগ্যতা তার নেই।"[২৫]

মজার ঘটনা হলো, ইমামের ভবিষ্যতবাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল। কার্টার পরবর্তী নির্বাচনে জয়লাভে ব্যর্থ হন।

চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ ও ইমাম খোমেনী

ইরানের বিপ্লবের বিরুদ্ধে মার্কিন ষড়যন্ত্র যখন কোনটাই সফল হচ্ছিল না, তখন উপসাগরীয় এলাকায় ইরাককে বেছে নেয়া হয় ইরানের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার জন্য। ইমাম খোমেনী যখন বিপ্লবোত্তর ইরানের পুনর্গঠনে ইরানী জাতিকে কঠোর পরিশ্রমে নিয়োজিত করেন, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে ১৯৮০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর ইরাক ইরানে হামলা চালায়। শুরু হয় সর্বনাশা যুদ্ধ। দীর্ঘ প্রায় ৮ বছর এ যুদ্ধ প্রলম্বিত হয়। যুদ্ধের শুরুতে ইরাক ইরানের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে এবং বিরাট ভূখন্ড দখল করে নেয়। এ দখলদারিত্বের সময়কালে ইরাক মানবাধিকার লংঘনকারী বহু জঘন্য অপরাধ করে। ইরানের সশস্ত্র বাহিনী ও জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে ইরাকীরা কিছুকালের মধ্যেই পিছু হটতে বাধ্য হয়। এক পর্যায়ে ইরানী ইসলামী বাহিনী ইরাকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। এ যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ হতাহত হয় এবং হাজার হাজার কোটি ডলারের সম্পত্তি ধ্বংস হয়। ইমাম খোমেনী ছিলেন শান্তিকামী। ইরানী জাতির প্রত্যাশা ছিল তারা দেশগড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্ররোচনায় ইরাক এজিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সবচেয়ে লজ্জার বিষয় হলো, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ইরাকের মত একটি মুসলিম দেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। তারা 'লরেঞ্চ অব এরাবিয়ার' মত আরব জাতীয়তাবাদের শ্লোগান দিয়ে এখানেও ইন্ধন জোগায়। ইমাম খোমেনী তাই আক্ষেপ করে বলেন,

> "ইরানীরা পারসিক, আরব নয়–এ অজুহাতেই আরববাদের নাম নিয়ে কাদেসিয়ার নাম ব্যবহার করে দুর্নীতিপরায়ণ ইরাকী সরকার আমাদের উপর আগ্রাসন চালিয়েছে। আমরা কখনও কোন দেশ আক্রমণ করতে চাইনি এবং বর্তমানেও এমন কোন ইচ্ছা আমাদের নেই। কিন্তু তারা যখন আমাদের উপর আক্রমণ করলো, এখন ধর্ম ও যুক্তির মানদন্ডে নিজেদের হিফাযত করা আমাদের জন্য একটি অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।"[২৬]

ইরাকী শাসক গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে শান্তির আহ্বান জানিয়ে ইমাম খোমেনী বলেন,

> "আমরা ইসলামী দেশগুলোর সাথে বিশেষতঃ পারস্য উপসাগরীয় এলাকার দেশগুলোর সংগে ভাই ভাই হয়ে বসবাস করতে চাই। আমরা তাদের সবার সাথে হাত মিলাতে চাই। ..... আমরা ইসলামী নীতি মেনে চলি। ইসলাম কোন মুসলিম দেশ দখলের অনুমতি আমাদের দেয়নি। আমরা তা কখনো করবো না। ..... ইরান আমেরিকা ও রাশিয়ার জন্য বিপদ, আপনাদের জন্য নয়। ইরান আপনাদের জন্য আল্লাহর রহমত স্বরূপ। আসুন, ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব নিয়ে

ইরানের সাথে মিলিত হোন যাতে আপনারা ভ্রাতৃত্বে ও স্বাধীন জীবনযাত্রার আনন্দ উপভোগ করতে পারেন।"[২৭]

ইমাম শান্তির প্রত্যাশী হলেও যখন পরাশক্তির চক্রান্তে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হলো, তখন নিজেদের প্রতিরক্ষা বিধান এবং যুদ্ধের সম্মানজনক নিষ্পত্তির জন্য তা ইমামকে অব্যাহত রাখতে হয়েছিল। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের মামুলি যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব অন্যায় ছিল বিধায় ইমাম তা মেনে নেননি। কিন্তু পরাশক্তির চক্রান্তে ইরাক যখন নির্বিচারে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে যুদ্ধকে চরম অমানবিক পর্যায়ে নিয়ে গেল এবং যুক্তরাষ্ট্র সুকৌশলে যুদ্ধকে সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে দিয়ে নিজে মোড়ল সাজার চক্রান্ত করলো, তখন ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ভবিষ্যত কল্যাণের কথা চিন্তা করেই ইমাম জাতিসংঘের যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব গ্রহণ করাকে সমীচীন মনে করেন।

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য প্রয়াসে ইমাম

জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় বিভেদ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ইত্যাদি কারণে মুসলিম উম্মাহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিরাষ্ট্রে আজ বিভক্ত হয়ে আছে। এরূপ জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণা সাম্রাজ্যবাদীদেরই বিকৃত চিন্তার ফলশ্রুতি যা মুসলিম জাতির এক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। পরিণামে বিশ্বের বিশাল ভূখন্ড ও বিপুল জনগোষ্ঠী নিয়েও মুসলমানরা দুর্বল হয়ে আছে। ইমাম খোমেনী বিশ্ব শোষকদের মোকাবিলায় মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ফেডারেশনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ১৯৮২ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের কতিপয় নেতৃবৃন্দ ইমামের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি যে বক্তব্য রাখেন তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। তিনি বলেন,

"এখন আমাদের নিজদের মধ্যে যুদ্ধ করা উচিৎ নয় ..... যদি একশ' কোটি মুসলমান তাদের বিরাট এলাকাসহ রাজনৈতিভাবে সংগঠিত হয় এবং একই ফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে উপনিবেশবাদের দোসর কিছুসংখ্যক ইহুদী তো দূরের কথা, বিশাল ক্ষমতাধর উপনিবেশবাদীদের পক্ষেও নিশ্চিতভাবে কোন মুসলিম দেশ আক্রমণ করা সম্ভব নয়।"[২৮]

জাতীয়তাবাদ ও শিয়া–সুন্নী ধুয়া তুলে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টাকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করে ইমাম খোমেনী বলেন,

"আমাদের বিরোধীরা মজলুম জনগণের মধ্যে, ইসলামী বা অনৈসলামী যাই হোক না কেন, অনৈক্যের বীজ ছড়ানোর চেষ্টা করছে এবং তারা চায় মুসলিম জাতিসমূহকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে। এজন্যই তাদের মুসলিম নামধারী মুখপাত্ররা, যারা প্রকৃতপক্ষে ইহুদীবাদের সংগে গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ,

তারা চেষ্টা চালাচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করতে।"

ইমাম আরো বলেন,

"ইসলামী দেশসমূহে যেসব নাপাক লোকজন শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে, তারা শিয়াও নয়, সুন্নীও নয়, বরং তারা হলো সাম্রাজ্যবাদের দালাল, যারা ইসলামী দেশসমূহকে আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়।"

জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করে ইমাম খোমেনী বলেন,

"এ সমস্ত পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে, তুর্কী জাতি, কুর্দী জাতি, আরব জাতি ও ইরানী জাতি প্রতিষ্ঠার ছদ্মাবরণে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম জাতিকে বিভক্ত করা।"

মুসলিম দেশগুলোকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার এবং তাদের প্রতারণার ফাঁদে পা না দেয়ার জন্য ইমাম খোমেনী সকলকে আহবান জানিয়ে বলেন,

"আসুন আমাদের ভাই বলে গ্রহণ করুন, যাতে করে আমরা সবাই মিলে বৃহৎ শক্তিগুলোর মোকাবিলা করতে পারি এবং নিজ নিজ দেশের হেফাজত করতে পারি। আপনারা কি মনে করেন জার্মানী, বৃটেন এবং তাদের চাইতে বড় শক্তি আমেরিকা ও রাশিয়া আপনাদের স্বার্থ চিন্তা করে? তারা শুধু নিজেদের স্বার্থই কামনা করে। তারা আপনাদের শোষণ করার জন্য দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করছে। তাদের কাছে আপনাদের প্রয়োজন যখন ফুরিয়ে যাবে তখন তারা আপনাদের খতম করে ফেলবে।—যখন আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশে স্বাধীন থাকতে পারবেন তখন আমরা সবাই একই কাতারে সামিল হয়ে যারা আমাদের ধ্বংস করতে চায় এবং আমাদের দেশগুলোকে তাদের কলোনী বানাতে সচেষ্ট, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারবো।"

পরাশক্তির বিরুদ্ধে এমন সুস্পষ্ট ও কঠিন ভাষায় বক্তব্য রাখার মত কোন ব্যক্তিত্ব সমসাময়িক ইতিহাসে ইমাম খোমেনী ছাড়া আর কাউকে দেখা যায় না। তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক। তিনি শিখিয়েছেন কি করে পরাশক্তির ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হয়। মার্কিনীদের উপর্যুপরি চক্রান্ত ও কমান্ডো হামলা, চারিদিকে চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ, অন্তর্ঘাতী বোমাবাজি, অর্থনৈতিক অবরোধ কোন কিছুই ইমাম ও তাঁর অনুরক্ত ইরানী জাতিকে ভরকে দিতে পারেনি। বরং প্রতিটি আঘাতকেই তিনি সমান জোরে প্রতিহত করে বুমেরাঙের মত ফিরিয়ে দিয়েছেন।

বিশ্ব ইহুদীবাদের বিরুদ্ধে ইমাম খোমেনী

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী লুটেরা ও ইহুদী বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে ইমাম খোমেনী সমভাবে লড়াই করেছেন। মধ্যপ্রাচ্যের ফিলিস্তিন ভূখন্ডে অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাইলকে তিনি

মনে করতেন আমেরিকার ঔরসজাত সন্তান। তাঁর মতে ইহুদীরা হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় শত্রু। ইমাম খোমেনী বলেন,

"আমাদের বর্তমানের যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা এসেছে আমেরিকা থেকে। সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা এসেছে ইসরাইল থেকে। ইসরাইল এসেছে আমেরিকার ঔরস থেকে।"[২৯]

ইসরাইলী ইহুদীরা মুসলমানদের প্রথম কিবলা এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মিরাজ গমনের যাত্রাস্থল আল-কুদসকে জবর দখল করে রেখেছে। শয়তান আমেরিকা ও ইহুদীবাদী দস্যু ইসরাইল মসজিদুল আকসাকে প্রতিনিয়ত অপবিত্র করে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তারা বায়তুল মোকাদ্দাস তথা জেরুজালেম নগরীকে অবৈধ ইসরাইল রাষ্ট্রের স্থায়ী রাজধানী করার গভীর চক্রান্ত করে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ৩০ লক্ষ ফিলিস্তিনী মুসলমান নর-নারী ও শিশুকে তাদের ভিটে-মাটি থেকে ইহুদীরা উচ্ছেদ করেছে। তারা দীর্ঘ ৪৫ বছর যাবত বিভিন্ন দেশের উদ্বাস্তু শিবিরে মানবেতর জীবনযাপন করছে। ইসরাইলী জিন্দানখানায় তিলে তিলে নিঃশেষিত হচ্ছে হাজার হাজার মুসলিম যুবক। ইহুদীদের কামান আর মর্টারের গোলার আঘাতে মৃত্যুর কোলে প্রতিনিয়ত ঢলে পড়ছে বহু ফিলিস্তিনী। ফিলিস্তিনী মুসলমানদের জান-মালের নিরাপত্তা তথা তাদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমানদের পবিত্র আল কুদসকে মুক্তির জন্য ইমাম খোমেনী তাঁর প্রত্যয় ঘোষণা করেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন জেরুজালেমে গিয়ে নামাজ আদায় করার। ইমাম খোমেনী পবিত্র রমজান মাসের শেষ শুক্রবারকে কুদস দিবস হিসাবে পালনের ঘোষণা দেন। কুদস দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে ইমাম খোমেনী বলেন, 'এটা এমন দিন যেদিন সকল দেশে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হবে। এদিনে পরাশক্তিসমূহকে দেখিয়ে দিতে হবে যে, তারা আর ইসলামী দেশ এবং মুসলমানদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না।"

ইমাম ইহুদীবাদী ইসরাইলের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন,

"ইসলাম, মুসলমান এবং সমস্ত আন্তর্জাতিক আইনের মাপকাঠিতে ইসরাইল আগ্রাসী ও সীমা লংঘনকারী। তাই তার এ সীমা লংঘনকে চিরতরে খতম করার ক্ষেত্রে সামান্যতম গাফেলতী ও অলসতাকে জায়েজ মনে করি না।"

"ইসলামী জাতি ও সরকারগুলোর উচিত ইসরাইলকে ধ্বংস ও মূলোৎপাটিত করা। ..... ইসরাইলের মোকাবিলায় নিজেকে প্রস্তুত করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ।"[৩০]

আমেরিকা ও ইসরাইলের ব্যাপারে ইমাম খোমেনী এতই আপোষহীন ও দৃঢ় ছিলেন যে কোন অবস্থাতেই ওদেরকে বিশ্বাস করতে পারেননি। তিনি বলেন,

"যদি আমেরিকা ও ইসরাইল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে তবুও আমরা তা কবুল করবো না। কারণ তারা চায় আমাদের ধোঁকা দিতে।"

কুখ্যাত সালমান রুশদীর বিরুদ্ধে ইমামের ফতোয়া

ইহুদীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের শয়তানী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে ইমাম খোমেনী যে সব সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তন্মধ্যে কুখ্যাত সালমান রুশদীকে হত্যার নির্দেশ সম্বলিত ফতোয়া সাম্প্রতিক বিশ্বে এক অভূতপূর্ব ঘটনা এবং তা ইতিহাসে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিষয় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত বৃটিশ লেখক ইহুদীবাদের প্ররোচনায় 'দি স্যাটানিক ভার্সেস' (শয়তানের পদাবলী) নামক গ্রন্থে ইসলাম ও মহানবী (সাঃ)–কে অত্যন্ত অশোভন ভাষায় চিত্রিত করে। তার এই অপকর্ম বিশ্বব্যাপী দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। উল্লেখ্য, ইহুদীদের প্রকাশনা সংস্থা 'ভাইকিং পেংগুইন' কুখ্যাত বইটি প্রকাশ ও বাজারজাত করার ব্যাপক উদ্যোগ নেয়। মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত সৃষ্টিকারী বইটিতে বিশ্বের বহু দেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

ইমাম খোমেনী গতানুগতিক প্রতিবাদ প্রকাশের গন্ডী থেকে বেরিয়ে বিষয়টিকে আরো গভীরভাবে পর্যালোচনা করেন। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন রুশদী নিছক একজন ব্যক্তিমাত্র নয়। তার কুখ্যাত কর্মটি বিশ্ব ইহুদীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদেরই চক্রান্তের ফসল। ইমাম উপলব্ধি করেন যে, ইসলামের শত্রুদের এরূপ ধৃষ্টতাকে আর বরদাশ্ত করা যায় না। তারা যাতে ভবিষ্যতেও এরূপ ঘৃণ্য কাজ করতে সাহসী না হতে পারে সেজন্য তিনি দৃষ্টান্তমূলক ও ঐতিহাসিক এক ফতোয়া দেন। তিনি কুখ্যাত রুশদীর কৃতকর্মের জন্য তার মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করেন। ইমামের ঐতিহাসিক ফতোয়াটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'লঃ

"বিশ্বের তেজোদীপ্ত মুসলমানদের অবগত করছি যে, 'স্যাটানিক ভার্সেস' বইটি যা ইসলাম, নবী করিম (সাঃ) ও পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে রচনা, ছাপা ও প্রকাশ করা হয়েছে, এর রচয়িতা এবং একইভাবে বইটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত প্রকাশকগণও মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হচ্ছে। তেজোদীপ্ত মুসলমানদের নিকট প্রত্যাশা করছি যে, তারা এদেরকে পৃথিবীর যেখানেই পাবে অতি দ্রুত হত্যা করবে। যাতে করে কোন ব্যক্তিই যেন মুসলমানদের পবিত্র নির্দেশাবলীকে হেয় প্রতিপন্ন না করতে পারে। আর যে ব্যক্তি এ পথে নিহত হবে সে শহীদ।"

যদি কোন ব্যক্তি 'স্যাটানিক ভার্সেস'-এর রচয়িতাকে নাগালের মধ্যে পেলেও তাকে হত্যা করার সামর্থ্য না রাখে, তাহলে সে যেন তাকে জনগণের নিকট পরিচয় করিয়ে দেয়, যাতে করে 'স্যাটানিক ভার্সেস'-এর রচয়িতা তার কৃতকর্মের সাজা পেয়ে যায়।"

ইমামের এই ফতোয়ায় বিশ্বব্যাপী সাড়া পড়ে যায়। রুশদীর বিরুদ্ধে বিরামহীন বিক্ষোভ, সমাবেশ চলতে থাকে। ইমাম যথার্থভাবেই শত্রুদের মূল দূর্গে আঘাত হানেন। পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী ও ইহুদীবাদী প্রচার মাধ্যমগুলো ইমামের ফতোয়ার সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠে। রুশদী মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকে। সে অন্ধ গুহায় আশ্রয় নেয়। আর তাকে লালন-পালন ও নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয় বৃটিশ সরকার।

সাম্রাজ্যবাদীদের তল্পীবাহক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ইমাম

সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদীবাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় কথা বলার পাশাপাশি ইমাম খোমেনী মুসলিম দেশগুলোর অপরিণামদর্শী স্বৈরশাসক ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধেও হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। তিনি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে তাদের শাসকদের সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে ইমাম অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। তিনি কোন রাখ-ঢাক বা সংকোচ না করে নির্দ্বিধায় মুসলিম সরকারগুলোকে তাদের দুর্বলতা ও দোষত্রুটি সম্পর্কে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। ইমাম এ প্রসংগে বলেন,

"মুসলমানদের আসল বিপদ ও অসুবিধা হচ্ছে তাদের নিজ নিজ দেশের শাসকদের নিয়ে। নিজেদের সরকারই তাদেরকে দুর্দিনের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বিভিন্ন জাতি মুসলমানদের জন্য কোন সমস্যা নয়। জনগণ তাদের স্বাভাবিক ও অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারে। কিন্তু সমস্যা বা অসুবিধা সৃষ্টি হয় বিভিন্ন সরকারের পক্ষ থেকে। যদি আপনারা একের পর এক বিভিন্ন মুসলিম দেশের দিকে তাকিয়ে দেখেন তাহলে এমন একটি দেশও আপনাদের চোখে পড়বে না যেখানে সরকার তাদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করেনি। এসব সরকার পরাশক্তিগুলোর ইচ্ছার কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করার কারণে বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।"[৩১]

সংক্ষেপে বলা যায় ইমাম মনে করতেন মুসলিম দেশগুলোর শাসকগুলো সাম্রাজ্যবাদীদের পুতুলের মত ব্যবহৃত হচ্ছে।

আয়াতুল্লাহ খোমেনী মুসলমান নামধারী স্বেচ্ছাচারী শাসকদের তথাকথিত ইসলাম-প্রীতির সমালোচনা করে বলেন,

"একদিকে ওরা অভিজাত ধনিক-বণিক শ্রেণীর ইসলাম ও ঘৃণ্য দরবারী আলেমদের ইসলাম, দ্বীনি মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চেতনাহীন ভন্ড-পীর মাশায়েখ ও মোল্লাদের ইসলাম, জিল্লতি ও লাঞ্ছনার ইসলাম, অর্থ-বিত্ত ও জবরদস্তির ইসলাম, প্রতারণা-আপোষ রফা ও বন্দীত্ব বরণের ইসলাম এবং মজলুমান ও নাংগা পা সর্বহারাদের পুঁজি ও পুঁজিপতিদের ইসলাম তথা এক কথায় ওরা আমেরিকান ইসলাম প্রচার করছে এবং অপরদিকে তাদের প্রভু সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার দরবারে সেজদা করছে।"[৩২]

ইরাকের বাথ পার্টির সরকার এবং মিসরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের কড়া সমালোচনা করে আয়াতুল্লাহ খোমেনী বলেন,

"সাদ্দামের ইসলাম সাবেক শাহের পিতা মুহাম্মদ রেজাখানের ইসলামের মতই। অনুরূপভাবে মিসরের সাদাতের ইসলামও সাদ্দামের মতই। এদের মুখে ইসলাম উচ্চারিত হয় বটে, কিন্তু কার্যতঃ এরা নিজেদের সামরিক ঘাঁটি আমেরিকার হাতে তুলে দেয়।"[৩৩]

ইমাম মিসর কর্তৃক ইসরাইলের সাথে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি স্বাক্ষরের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি আরব লীগ ও ওআইসি-তে ইসরাইলের বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে গড়িমসি ও নির্লিপ্ততার সমালোচনা করে বলেন,

"ইহুদী বর্ণবাদের সাথে ইসলামী দেশসমূহের রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্পর্ক কত উষ্ণ এবং অন্তরঙ্গ হলে এটা সম্ভব হতে পারে যে, ওআইসি-র শীর্ষ সম্মেলনের কর্মসূচী ও অধিবেশন থেকে ইসরাইলের সাথে বাহ্যিক ও মৌখিকভাবে সংগ্রামের কথাকেও বাদ দেয়া যায়। এদের যদি এক কণা পরিমাণও ইসলামী ও আরবী আত্ম-সম্মানবোধ ও ব্যক্তিত্ববোধ থাকতো তাহলে এরা ঘৃণ্য রাজনৈতিক, আত্ম বিক্রয়মূলক ও দেশ বিক্রির মত লেন-দেন করতে রাজী হতো না। এ তৎপরতা কি ইসলামী জাহানের জন্য লজ্জাজনক নয়? মুসলমানদের মধ্যে এমন কেউ কি নেই যে রুখে দাঁড়াবে এবং এ কলংক ও বেইজ্জতিকে ছুঁড়ে মারবে?"[৩৪]

সাম্রাজ্যবাদী ও ইহুদীবাদী চক্রান্ত ও খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ইমাম খোমেনী বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি আমেরিকা ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি বলেন,

"মুসলমানদের অবশ্যই জানা উচিত যে, যদ্দিন পর্যন্ত বিশ্বের শক্তির ভারসাম্য তাদের অনুকূলে পরিবর্তিত না হবে-ততদিন তাদের স্বার্থের উপর বেগানা

দুশমনদের স্বার্থসমূহই প্রাধান্য পেতে থাকবে আর প্রতিদিনই 'শয়তানে বুজুর্গ' (আমেরিকা) অথবা রাশিয়া নিজ স্বার্থে বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলবে। সত্যি, মুসলমানগণ যদি তাদের ইস্যুসমূহের ব্যাপারে বিশ্ব লুটেরাদের সাথে শক্তভাবে ফয়সালায় না পৌছান অথবা অন্ততঃপক্ষে নিজেদের বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গের সীমান্তে না পৌছান তাহলে কি শান্তিতে থাকতে পারবেন? পরাশক্তিবর্গ বিশেষ করে আমেরিকার নখর ও দাঁতগুলোকে অবশ্যই ভেংগে ফেলতে হবে। আমাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে দু'টোর যে কোন একটি বেছে নিতে হবে–হয় শাহাদাত না হয় বিজয়।"[৩৫]

রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ইমাম খোমেনী

১৯৮৭ সালে হজ্জ উপলক্ষে ইরানী হজ্জযাত্রীরা মক্কায় মুশরেকী ও কুফরী শক্তির ধ্বজাধারী আমেরিকা, রাশিয়া ও ইসরাইলের বিরুদ্ধে ধ্বনি উচ্চারণ করলে সৌদি শাসকগোষ্ঠী আল্লাহর মেহমানদের উপর নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায় এবং এতে ৪০০ হাজী শহীদ হন। এই হৃদয়বিদারক ঘটনার প্রেক্ষিতে ইমাম খোমেনী এক বাণীতে বলেন,

"আল্লাহর ঘরের হাজীদের হত্যাকান্ড দাম্ভিক কুফরী চক্রের নীতিসমূহের সংরক্ষণ এবং মুহাম্মদ (সাঃ)–এর নির্ভেজাল ইসলামের প্রসার ঠেকানোর জন্য একটি ষড়যন্ত্র মাত্র। ইসলামী দেশসমূহের অপদার্থ শাসকদের কলংকজনক ও ঘৃণ্য কার্যকলাপ কেবল অর্ধমৃত ইসলাম ও মুসলমানদের দুঃখ–কষ্ট ও বালা মুছিবতই বৃদ্ধি করছে। বিশ্ব মুসলমানগণ কি ভুলে যাবেন যে, আলে সৌদের ঘৃণ্য শাসনামলে মুসলমানদের সকল মাজহাবের শত শত আলেম, হাজার হাজার নর–নারী এবং আল্লাহর ঘরের হাজীদের পাইকারী হত্যার মত গর্হিত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে? মুসলমানরা কি দেখতে পাচ্ছে না যে, বিশ্বে ওহাবী ফের্কার কেন্দ্রগুলো ফেৎনা ও গুপ্তচরবৃত্তির আখড়ায় পরিণত হয়েছে?"[৩৬]

পবিত্র কাবাকে ইহুদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের করালগ্রাস থেকে মুক্ত রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে ইমাম বলেন,

" ..... ইনশাআল্লাহ, মানবতার উচ্চতম শৃংগস্বরূপ কাবা ও হজ্জ–যেখান থেকে মজলুমের ফরিয়াদকে সমগ্র বিশ্বে অবশ্যই পৌছাতে হয় এবং তৌহিদের বাণীকে ধ্বনিত–প্রতিধ্বনিত করতে হয়, সেখান থেকে আমেরিকা, রাশিয়া ও কুফর শেরকের সাথে আপোষের আওয়াজ উঠবে, আমরা এমনটি মোটেই হতে দেবো না। আমরা আল্লাহর কাছে এ শক্তি চাই যাতে শুধু মুসলমানদের কাবা থেকেই

নয় বরং বিশ্বের গীর্জাসমূহের ক্যারিলন থেকেও–'মার্গ বার আমেরিকা' 'মার্গ বার রাশিয়া' ঘন্টাধ্বনি বাজাতে পারি।"[৩৭]

সোভিয়েত নেতা গরবাচেভের প্রতি ইমামের ঐতিহাসিক বাণী

আয়াতুল্লাহ খোমেনী ১৯৮৯ সনের ৪ জানুয়ারী সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন নেতা মিখাইল গর্বাচেভের নিকট ইসলামের আহ্বান সম্বলিত ঐতিহাসিক পত্র এক বিশেষ দূত মারফত প্রেরণ করেন। বিশ্ব রাজনীতির গতিপ্রবাহ সম্পর্কে ইমাম যে কত গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন তা ঐ চিঠি দেখে বুঝা যায়। ইমাম গরবাচেভকে সমাজতন্ত্রের অত্যাসন্ন পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়ে তাকে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করার আহ্বান জানান। ইমাম বলেন,

"এখন থেকে কম্যুনিজমকে বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসের যাদুঘরগুলোতে খোঁজ করতে হবে।"

উল্লেখ্য এ ঘটনার অল্পকালের মধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিশ্বের বহু দেশে সমাজতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটে। ইমাম খোমেনী বিধ্বস্ত সমাজতন্ত্রের বিপরীতে কম্যুনিস্টরা ব্যর্থ ক্লান্ত হয়ে যাতে পুঁজিবাদের মধ্যে নিজেদের মুক্তির পথ অনুসন্ধান না করে সে জন্যও সোভিয়েত নেতাকে সতর্ক করে দেন। তিনি বলেন,

"আমি আপনাকে গুরুত্ব সহকারে বলতে চাই যে, মার্কসবাদী কুহেলিকার প্রাচীর ভাঙতে গিয়ে পাশ্চাত্য ও বড় শয়তানের জিন্দানখানায় ধরা দেবেন না।"

ইমাম খোমেনী ইরানের জনগণ, মুসলিম উম্মাহ এবং সবশেষে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্যের প্রতি ফিরে আসার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে তার দায়িত্ব সম্পাদন করেন।

ভ্যাটিকানের পোপের চিঠির জবাবে ইমাম

সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইসলামী ইরান জয়লাভ করলে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং সর্বত্র তার একটা প্রভাব পড়ে। এই দুই দেশের অবনতিশীল সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে খৃষ্টান জগতের ধর্মগুরু ভ্যাটিকানের পোপ ইমাম খোমেনীর কাছে এক চিঠি লিখেন। সেই চিঠির জবাবে ইমাম অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় আমেরিকার কুকীর্তির সমালোচনা করেন এবং পোপকে তাঁর আধ্যাত্মিক প্রভাব খাটিয়ে আমেরিকাকে নিবৃত্ত করার আহ্বান জানান। ইমাম তাঁর চিঠিতে বলেন,

"আমি আশা করি খৃষ্টানদের কাছে আপনার যে আধ্যাত্মিক মর্যাদা আছে তার প্রভাব খাটিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার সাম্রাজ্যবাদী বলপ্রয়োগের মনোভাব পোষণের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিন। কার্টারকে সাম্রাজ্যবাদী

মনোভাব পরিহার, মুক্তিকামী দেশগুলোর সাথে মানবীয় আচরণ করার এবং সে সাথে যীশুখৃষ্টের শিক্ষা অনুসরণের ও হঠকারিতা পরিত্যাগের উপদেশ দিন।"

ইমাম খোমেনী এমনিভাবে সকল ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতেন। কোন রকম রাখ-ঢাক করে বা আনুষ্ঠানিকতার নামে সংকোচ করে সত্য ও সঠিক কথাটি বলা থেকে বিরত থাকতেন না। তাঁর প্রতিটি কথাই ছিল বিপ্লবের এক একটি বাণী যা শত্রুদের বুকে কাঁপন সৃষ্টি করতো।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা নিসংকোচে বলা যেতে পারে যে, আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ আল-মুসাভী আল-খোমেনী জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদীবাদের মোকাবিলায় ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষার জন্য বিরামহীন প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তিনি বিশ্বব্যাপী জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের লড়াইয়ের মহান নেতা ছিলেন। তিনি বিশ্ব মানব সমাজে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি বলেন, "যতদিন পর্যন্ত না 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এই বাণী সমগ্র পৃথিবীতে ধ্বনিত হবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে। পৃথিবীর যেখানেই জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের সংগ্রাম সেখানেই আমরা আছি।" 'হয় শাহাদাত নয় বিজয়' - ত্যাগ ও কোরবানীর এই চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ইমাম খোমেনী আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন,

> "আমি আশা করছি যে, সকল মুসলমানই আজাদীর কুঁড়িসমূহ, বসন্তের সৌরভময় পুবাল-হাওয়া, মহব্বত ও এশকের কুসুম রাজির প্রস্ফুটন এবং নিজেদের ইচ্ছা-বাসনার স্বচ্ছ-সলিলের বর্ণধারা প্রত্যক্ষ করুক। আমেরিকা ও রাশিয়ার কর্মকর্তারা নীরবতা ও নিশ্চয়তার মরা-পানি ও গভীর কাদায় মৃত্যু ও বন্দীত্বের যে বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে তা থেকে আমাদের সবাইকে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে। এবং সেই দরিয়ার পানে ছুটে যেতে হবে-যেখান থেকে 'জমজম' কুয়ার পানি বের হয়ে এসেছে। আর আমেরিকান নাপাক দুশমনরা ও মার্কিন পোষ্যরা কাবা ও হেরেমের যে পর্দাকে অপবিত্র করেছে-তাকে আমরা নিজেদের চোখের পানি দিয়ে ধৌত করবো।"[৩৮]

আধ্যাত্মিকতার জ্যোতিতে ভাস্বর ইমাম খোমেনী তাঁর নিখুঁত চিন্তা ও প্রখর কর্মের যে আদর্শ ও শিক্ষা রেখে গেছেন তা যুগে যুগে মুসলমানদেরকে জিহাদী চেতনায় অনুপ্রেরণা যোগাবে। জীবনের শেষ মুহূর্তেও আল্লাহর দরবারে হাত তুলে তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে অধিষ্ঠিত করুন। আমীন।

পাদটিকা ঃ

১. Kalim Siddiqui, "Struggle for the Supremacy of Islam - some critical dimensions", (ed.), Issues in the Islamic Movement, The Open Press Ltd., Canada, 1983, p. 5

২. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, "মুসলিম উম্মাহর চিহ্নিত দুশমন ঃ সেদিন থেকে আজ", ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা, এপ্রিল-জুন, ১৯৮৪।

৩. Ibid. Kalim Siddiqui.

৪. প্রাগুক্ত, আবু সাঈদ ওমর আলী।

৫. Raymond L. Buell, International Relations, New York; 1929, P. 305.

৬. Charles Hodges, The Background of International Relations, New York, 1932, P. 421

৭. ওয়াহিদ সিনায়ী, "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উত্থান-পতন", নিউজ লেটার, ভল্যু ঃ ১৫, ইস্যুঃ ৩, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের সাংস্কৃতিক বিভাগ-ঢাকা-এর মাসিক বুলেটিন, মার্চ, ১৯৯৩ ইং।

৮. "যুক্তরাষ্ট্র একাই পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হতে চায়", নিউজ লেটার, ভল্যুঃ ১৫, ইস্যু ঃ ৪, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের সাংস্কৃতিক বিভাগ, ঢাকা, এপ্রিল, ১৯৯৩ ইং

৯. 'রাজতন্ত্রের ইতিহাস ঃ জুলুম ও বঞ্চনার ইতিহাস', নিউজ লেটার, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের দূতাবাসের সাংস্কৃতিক বিভাগ, ঢাকা, জুন, ১৯৯০।

১০. প্রাগুক্ত, নিউজ লেটার, জুন, ১৯৯০ ইং।

১১. প্রাগুক্ত, নিউজ লেটার, জুন, ১৯৯০ ইং।

১২. "American crimes in Iran", in Allahu Akbar, Islamic Republic of Iran, Tehran, P. 28-30.

১৩. প্রাগুক্ত, 'আল্লাহু আকবর'।

১৪. 'আলোর স্মারক ঃ ইতিহাসে চিরভাস্বর অবয়ব খোমেনী', ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা।

১৫. প্রাগুক্ত।

১৬. Constitutional Law of Islamic Republic of Iran, Tehran.

১৭. প্রাগুক্ত।

১৮. "আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলামী ইরান", নিউজ লেটার, ঢাকা, জানুয়ারী, ১৯৯১।

১৯. প্রাগুক্ত, Allahu Akbar.

২০. প্রাগুক্ত, আলোর স্মারক।

২১. প্রাগুক্ত, আলোর স্মারক।

২২. প্রাগুক্ত, আলোর স্মারক।

২৩. প্রাগুক্ত, আলোর স্মারক।
২৪. প্রাগুক্ত।
২৫. প্রাগুক্ত, শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে ইমামের ভাষণ থেকে।
২৬. প্রাগুক্ত।
২৭. প্রাগুক্ত।
২৮. প্রাগুক্ত।
২৯. প্রাগুক্ত।
৩০. এ, এ, সালামতউল্লাহ্, হাজার বছরের বিস্ময়, ঢাকা, ১৯৯০।
৩১. প্রাগুক্ত, হাজার বছরের বিস্ময়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। আলোর স্মারক, ইতিহাসে চিরভাস্বর অবয়ব খোমেনী, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯০।
২। Allahu Akbar, Islamic Republic of Iran, Tehran.
৩। The Imam Versus Zionism, Ministry of Islamic Guidance, The Islamic Republic of Iran, Tehran.
৪। এ, এন, সালামতুল্লাহ্, হাজার বছরের বিস্ময়, ঢাকা, ১৯৯০ ইং
৫। মতিউর রহমান, দক্ষিণ এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ, ঢাকা, ১৯৮৪
৬। Documents from the US Espionage Deu, The Center for the Publication of the U. S. Tehran.
৭। Ed. Kalim Siddiqui, Issues in the Islamic Movement, London, 1983.
৮। Confessions of some Highranking MKO Terrorists, Sazman-e Tablighat-e-Islam, Tehran, 1985.
৯। বামপন্থী তুদেহ নেতৃবৃন্দের স্বীকারোক্তি, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা।
১০। Constitutional Law of Islamic Republic of Iran.
১২। Imam Khomeni : As I saw him, Robin Woodsworth Carlsen, Cultural Centre of the Islamic Republic of Iran, Dhaka, 1403 Hijri.
১৩। The Campaign for Reconstruction, the Promising Victory of the oppressed, Department of International Relations and Co-operations, Ministry of Islamic Guidance, Tehran, 1986.
১৪। Jaffar Sabhani, The Imposed Peace and A Tyrant Group, Tehran, 1986.
১৫। Islamic Anti-Imperialism, Islamic Propagation Centre, Tehran, 1987.
১৬। The Historical Message of Imam Khomeni addressed to the Pilgrims of Kaba, Foundations of Islamic Thought, Tehran. 1408 Hijri.
১৭। Hamid Algar, The Islamic Revolution in Iran, Qum, 1981.
১৮। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত 'নিউজ লেটার'-এর বিভিন্ন ইস্যু।

১৪০০ শতকের আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব ইমাম খোমেনী

ডঃ মোসলেহ উদ্দিন আহমদ তারেক

"তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ জাতি। বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্য তোমদের সৃষ্টি। তোমরা ভালো কাজের নির্দেশ দেবে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকিবে। ..... তোমাদের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে অবতীর্ণ হলে তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। অতঃপর তারা কোন সাহায্য প্রাপ্ত হবে না।" (সূরা আল-এমরান ঃ ১১০-১১১)

উপরোক্ত দু'টো আয়াতের আলোকেই ইমাম খোমেনীকে মূল্যায়ন করা যায়। শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে আমরা যখন নিজেদেরকেই চিনতে ভুলে যাচ্ছিলাম ইমাম খোমেনী তখনই আমাদের চিন্তাশক্তিতে বিদ্যুৎ চমকানোর মত আবির্ভূত হলেন। এমনভাবে এ শতকে কোন মুসলমান আমাদের অন্তরকে আলোড়িত করেছেন বলে আমার জানা নেই। আর তাই ইমামের আগমন, আলোড়ন এবং ইরানের ইসলামী বিপ্লব সারা বিশ্বের সকল জাতির কাছে সপ্তম আশ্চর্যের চেয়েও অধিক আশ্চর্যের বিষয়। আর তাই সকল গণমাধ্যম ও বার্তা সংস্থাগুলো ইসলামী বিপ্লব কিংবা শাহের পতন নিয়ে যতটা সময় ব্যয় করেছে তার চেয়ে অধিক সময় দিয়েছে একটি শ্রেষ্ঠ জাতির প্রতিনিধি মুসলমান ইমাম খোমেনীকে নিয়ে।

ইমামের আগমন এমনই এক সময়ে যখন সারা বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনগুলো নেতিবাচক দৃষ্টিতে ভরপুর এবং দিক নির্দেশনার অভাবে গোটা মুসলিম জাহানই নানা সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। ঔপনিবেশিকতার অভিজ্ঞতা, বিদেশী আধিপত্য, সামরিক ক্ষেত্রে অনবরত পরাজয় ও বিদেশীদের উপর নির্ভরশীলতা, দারিদ্র, অর্থনৈতিক দুর্বলতা, আরব-ইসরাইল সংঘাত ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে আমরা যখন গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত তখনই সংঘটিত হলো ইরানের ইসলামী বিপ্লব। আর এমনই এক সময়ে তা' হলো যখন ইরান ছিলো একটি মুসলমান দেশে পাশ্চাত্যের সকল "মডেল"। এজন্যই তখন খোমেনীর ইসলামী বিপ্লব শত কোটি বিশ্ব মুসলিমকে যত না অনুপ্রাণিত করলো তার চেয়ে বেশী গুণে আঘাত আনলো পাশ্চাত্য সভ্যতায়, আর তা সামলাতে বিপ্লবের পনর বছর পরেও হিমশিম খেতে হচ্ছে সমগ্র বিশ্ব শক্তিকে, তৈরী করতে হচ্ছে বিভিন্ন গোষ্ঠী, আবিষ্কার করতে হচ্ছে নতুন

লেখক ঃ সহযোগী অধ্যাপক, লোকপ্রশাসন বিভাগ ও সিন্ডিকেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফন্দি-ফিকির, সহযোগিতা করতে হচ্ছে 'ঈমানী শক্তিকে' পদানত করানোর, 'মৌলবাদী' প্রতিহত করার জন্য সন্ত্রাসবাদ ঠেকানোর নামে নতুন নতুন মডেল।

আর এ ভয়ের প্রধান ও মুখ্য কারণ আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন ও শক্তিশালী পাহলভী রাজতন্ত্রকে সমূলে উৎপাটিত করে পাশ্চাত্য সভ্যতার আবরণের মধ্যে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত করে সদা জাগ্রত বলে প্রচারিত পশ্চিমাদের ঘুম পাড়িয়ে দেয়া। তাই খোমেনী ভীতি আজও তাঁর মৃত্যুর অনেকটি বছর পরেও ভীষণ ভীতি রূপেই রয়ে গেছে তাদের কাছে। আর সেই ভীতিই তারা মাঝে মাঝে অগোচরে প্রকাশ করে দেয় কুখ্যাত রুশদীকে ভিআইপি বানিয়ে।

কারণ ইমাম খোমেনী ছিলেন বর্তমান শতাব্দীর এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁরই আহবানে সমগ্র ইরানবাসী উজ্জীবিত হয়েছিলো এক বিপ্লবী মন্ত্রে। সর্বাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত এবং বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত শাহের সামরিক বাহিনী পর্যুদস্ত হয়েছিলো জেহাদের ও সত্য পথের যাত্রীদের ঈমানী আদর্শের কাছে। আর সেই আদর্শকে জাগিয়ে তুলেছিলেন ঐ শতাব্দীর একজন অতি সাধারণ মানব ইমাম খোমেনী। যা সংঘটিত হয়েছে বহু বছর ধরে আল্লাহ্‌র বান্দাদের মাঝে পাশ্চাত্যের বাঘা বাঘা গোয়েন্দা সংস্থার অগোচরে। যদিও এসব কিছুর স্থপতি ছিলেন আধ্যাত্মিক ও ঈমানী শক্তিকে বলীয়ান ইমাম খোমেনী।

অবশ্য ইরানের তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাও ইমাম খোমেনীকে এনে দিয়েছিল এই অভূতপূর্ব সাফল্য। ইরানের ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসাসমূহের প্রখ্যাত বুজুর্গ ব্যক্তিগণও খোমেনীর মত উপলব্ধি করেছিলেন সীমালংঘনকারীদের মুখোশ উন্মোচন করে সেই অধ্যায়ের যবনিকাপাত ঘটানোর প্রয়োজনীয়তাকে। কারণ সাংস্কৃতিক দিক থেকে ইরান পাশ্চাত্যকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অশ্লীলতা আর নৈশ ক্লাবের ছড়াছড়ি পাশ্চাত্যের স্বনামধন্য শহরগুলোকে হার মানিয়েছিল। মহিলা সমাজ অবহেলিত ও আধুনিকতার নামে ভোগ্যপণ্যে পরিণত হয়েছিল। সৃষ্টি করা হয়েছিল অভিজাত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, আমদানী হয়েছিল পাশ্চাত্যের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা ব্যবস্থার।

তাছাড়া অর্থনীতিকে চাংগা করার নামে করা হয়েছিল পর নির্ভরশীল। আর এসব কারণেই শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মুসলমানদের আবারও প্রতিষ্ঠিত ও স্মরণ করার জন্য বিশ্বে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হওয়া ছিল অপরিহার্য। কারণ ঈমানের অনুশীলন, আধ্যাত্মিক শক্তি এবং জেহাদের আদর্শকে ভুলেই যাচ্ছিল সেই জাতি যাদের সৃষ্টি বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্য। আর তারই প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই নবী করীম (সাঃ) এরজীবনাদর্শে।

ইমাম খোমেনীর আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল অপরিসীম। ইসলামী বিপ্লবের দশ বৎসর পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভগ্নপ্রায় অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি গর্বাচেভকে যে সাহসী আহবান জানিয়েছিলেন তা এ শতাব্দীরই নয় বহু শতাব্দী ধরে ইতিহাস হয়ে থাকবে। তিনি ছিলেন এমনই ব্যক্তিত্ব যিনি এ শতাব্দীতে সমগ্র বিশ্বকে ঈমানের শক্তিতে দু'ভাগে ভাগ করার জন্য ভয় দেখিয়ে অংগুলি নির্দেশ করেছেন। আর তাই পরাশক্তি এখন বড় বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে নিজেদের গোছাতে এবং সন্ত্রাসবাদের নামে মৌলবাদকে ঠেকাতে।

ইমাম খোমেনী ছিলেন এমন এক আধ্যাত্মিক পুরুষ যার নেতৃত্ব ইতিহাসের গতিধারাকেই পাল্টে দিয়েছে। তিনি পৃথিবী ত্যাগ করে গেলেও তাঁর নির্দেশ আজও পালনীয়। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ ও নির্ভরযোগ্য বিশ্বাসী ব্যক্তিত্ব, যিনি বিশ্ব মুসলিমকে তাদের কর্তব্য সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ)-এর বিদায় হজ্জের মহান বাণীগুলোকেই স্মরণ করাতে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন এমন এক দিক নির্দেশক যিনি পাশ্চাত্য ও ইহুদীচক্রের সাথে ঈমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদেরকে বুঝার ও উপলব্ধি করার আহবান জানিয়েছেন। তাই ইমাম খোমেনী আমাদের কাছে এই শতকের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব এবং মহান শিক্ষক।

তথ্য সাম্রাজ্যবাদ ও ইমাম খোমেনী

মাসুদ মজুমদার

১. সমাজবাদের আত্মহনন ও পশ্চাদপদতার পর পুঁজিবাদ তথা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইসলামকে টার্গেট করে নতুন করে স্নায়ুযুদ্ধের জন্ম দিয়েছে। মানবীয় মতবাদগুলোর অনিবার্য ধস্ ইসলামী শক্তির উত্থানকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। ইরানে ইমাম খোমেনীর (রঃ) নেতৃত্বের একক প্রভাব ও বর্ণাঢ্য বিস্তৃতির প্রেক্ষাপটে পরাশক্তি প্রথম প্রতিপক্ষ বিবেচনা করে ইমাম খোমেনীকে। তাই প্রথম সুযোগেই তারা সিআইএ'র মাধ্যমে ইমাম ও বিপ্লবের প্রাণ বন্যাকে ঠেকিয়ে দিতে চেয়েছিলো। কৌশল হিসাবে গ্রহণ করে রটনা, প্রচারণা এবং প্রচার মাধ্যমের মিথ্যাচার ও ধূম্রজাল সৃষ্টির অপপ্রয়াসকে। পাশ্চাত্যের ধারণা ছিলো এমন দৃষ্টিভঙ্গিই তাদের জন্য ইমাম ও ইরানকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য যথেষ্ট হবে।

পরাশক্তির তথ্য সন্ত্রাস এবং সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের যোগানদার ইহুদীবাদ। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমগুলো একচ্ছত্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ইহুদীরা। তাদের প্রথম কৌশল ছিলো ইরানের বন্ধু সেজে 'মোল্লাতন্ত্র' বলে বিপ্লবকে কোণঠাসা করে দেয়া। উন্নয়ন-প্রগতির প্রতি মেকী মমত্ববোধ প্রদর্শন করে তারা এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইলো যাতে বিপ্লবী মন্ত্র এবং নেতৃত্ব থেকে জনগণকে আলাদা করা সম্ভব হয়। এটা এমন একটি সূক্ষ্ম কৌশল ছিলো যে, দৃঢ়চেতা জাতি না হলে পরিস্থিতি ঘোলাটে করা সহজ ছিলো। ইমাম খোমেনী উদারপন্থী-কট্টরপন্থী বিভাজন ও জনগণকে উত্তেজিত করার জন্য পরাশক্তির সত্য-মিথ্যার ধূম্রজাল সৃষ্টিকে সহজেই চিহ্নিত করতে সক্ষম হলেন। তাঁর প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপকে উন্মোচন করতে সহায়ক হয়। সকল বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণার মুখেও তিনি সত্যপন্থীদের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হন।

ইমামের মৃত্যুর খবরকে নিয়েও সাম্রাজ্যবাদ কম করেনি। তারা তাৎক্ষণিকভাবে প্রচার করেছিলো ইমাম ছিলো মহীরূহ; এবার নেতৃত্বে শূন্যতা আসবে, বিপ্লব দুর্বল হবে, লক্ষ্যচ্যুৎ হবে, নেতৃত্বের কোন্দলের ফলে বিপ্লব নিশ্চিহ্ন হবে। তাদের এ সূক্ষ্ম প্রচারণায় ইরানী জাতি বিভ্রান্ত হয়নি তারপরও পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমগুলো কখনো

লেখক ঃ সাংবাদিক, কলামিস্ট, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, সাপ্তাহিক বিক্রম

প্রেসিডেন্ট হাসেমী রাফসানজানীর বক্তব্যের অংশ বিশেষ, কখনো বা রাহবার আলী খামেনেয়ীর বক্তব্যের কিছু অংশ তুলে ধরে, কখনো কখনো বিকৃত উপস্থাপনা করে দেশী-বিদেশী ইস্যুতে দু'জনকে বিপরীতধর্মী ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রচার করতে থাকে। এক সময় তারা প্রচার করতো ইমাম উন্মাদ, কট্টরপন্থী, পাগল। আবার নেতৃত্বের ভেতরের মত-পার্থক্য প্রচার করে তাকেই মহান বলে অন্যদের অযোগ্য প্রমাণ করতে চাইতো। তথ্য সাম্রাজ্যবাদের এ অপপ্রচার ও প্রচারণা থেকে ইমাম ইন্তেকাল করেও রেহাই পাননি। বিপ্লবীদের কাছে জীবিত ইমামের চেয়ে মৃত ইমামের মর্যাদা এবং গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। এটা তাদেরও অজানা নয়। তাই ধারা পাল্টিয়ে প্রচারণা চালাতে লাগলো, ইমামের ইরান আর বর্তমান ইরান এক নয়; তারা সরে দাঁড়িয়েছে ইমামের পথ থেকে, বিপ্লবের মূল ধারা থেকে।

বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনাকে এরা রটনায় নিয়ে আসতো। চোর, মদ্যপ বা হিজাববিহীন কোন নারী, চোরাকারবারী, বিদেশী এজেন্ট, দাঙ্গা-হাঙ্গামাবাজ যখন ধরা পড়তো এবং শাস্তি হতো; অমনি পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমগুলো এর ভেতর আবিষ্কার করতো মানবাধিকার লংঘনের কল্পকাহিনী, চোর-ডাকাতকেও বিপ্লব এবং খোমেনী বিরোধী প্রতিবাদী নেতা হিসাবে আখ্যায়িত করতো।

এ কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করতো সিআইএ। ইরানের ব্যাপারে সিআইএ'র মাত্রাতিরিক্ত এলার্জীর মূল কারণ দু'টো। এ গোয়েন্দা সংস্থাটি '৪৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর একমাত্র ইরানেই হাতেনাতে ধরা পড়ে এবং কূটনৈতিক আচরণের বাইরে তাদের গোয়েন্দাবৃত্তির প্রায় সকল জারিজুরি ফাঁস করে দেয়া হয়। ইমামের সম্মতিতে ছাত্ররা তাদের আস্তানা পর্যন্ত আবিষ্কার করে কাগজপত্র আটক করে। স্বরূপ উন্মোচিত হওয়ায় তারা মনস্তাত্ত্বিকভাবেই প্রচার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এটি একটি কারণ হলেও প্রধান কারণ নয়। প্রধান কারণ বিপ্লব ঠেকানো। 'মৌলবাদ' নামের ধূম্রজাল সৃষ্টি করে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে ঠেকানো।

আলোচ্য নিবন্ধে তথ্য সাম্রাজ্যবাদ এর স্বরূপ, আদি সাম্রাজ্যবাদ, তাদের কিছু কৌশল ও মগজ ধোলাইয়ের বিষয়গুলো প্রাসঙ্গিকভাবে আলোকপাত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। এ প্রয়াস তথ্য-সাম্রাজ্যবাদকে সীমিত পরিসরে হলেও চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ও ইমাম খোমেনীর দূরদর্শী চোখে উম্মার শত্রু-মিত্র চেনার প্রয়োজনে।

২. সত্য সুন্দরে আকীর্ণ মানব সভ্যতার ইতিহাস মানুষের মতই পুরাতন। পৃথিবীর প্রথম মানুষ শুধু একজন মানুষই ছিলেন না, বিধাতার অনুপম সৃষ্টিও ছিলেন; ছিলেন বিধাতার মনোনীত মহামানব-নবী।

মানব সৃষ্টির উষালগ্নেই শয়তানের অস্তিত্ব ছিলো, সত্যের প্রতিপক্ষ হিসাবে।

সুন্দরের বিপরীতে। তাই সত্য–মিথ্যার লড়াই এবং সংঘাত শুরু হয়েছিলো আদি থেকেই। আধুনিক বিশ্বে সত্যের ধরণ–ধারণ পাল্টায়নি, সত্য সত্যই থেকেছে, কিন্তু মিথ্যার ধরন–ধারণ ও রূপ পাল্টিয়েছে। সভ্যতার উৎকর্ষতার সাথে সাথে মিথ্যারূপী শয়তান এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন চেহারায় কৌশল পাল্টাচ্ছে শয়তান।

বিজ্ঞান এবং বস্তুবাদী সভ্যতার উৎকর্ষ এ যুগে শয়তানী চক্র ঠাঁই নিয়েছে মানুষের চিন্তা–চেতনায় এবং দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে। তাই সুযোগ পেলেই তারা সত্যের আলোকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়। নাস্তানাবুদ করে দিতে চায় সত্যের মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তিকে। শয়তানের এ প্রতিরোধ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিরোধ। শয়তানের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে প্রথমে বন্ধু সেজে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি, মিথ্যাশ্রিত বিভ্রান্তির প্রসার। অবশেষে বিপথগামী করা।

ইসলাম যেহেতু আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন। তাই শয়তান শুরু থেকে একে চ্যালেঞ্জ করেছে। মানবরূপী শয়তানের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে প্রথমে একশ্রেণীর মানুষের মগজে পচন ধরিয়েছে। বিকৃতির জাল বিস্তার করেছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য একশ্রেণীর মানুষ সব যুগেই প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়েছে। শয়তানের আধুনিক চেহারা কতটা ভয়াবহ এবং বিকট হতে পারে তা আমরা পুনঃপ্রত্যক্ষ করেছিলাম ইরানে; ইসলামী বিপ্লবের বিজয় ডংকা যখন বেজে উঠেছিলো ঠিক তখনই।

৩. আধুনিক শয়তানের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি এবং প্রতিভূ হচ্ছে পাশ্চাত্যের শক্তিরা এদের নেতৃত্ব দিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইসলামী বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেনী যখন ইরানে ইসলামী বিপ্লবের বীজ বপন করছিলেন, তখনকার ইরান ছিলো শয়তানের পদলেহী পাহলভী রাজবংশের করতলে। আর পুরো ইরান হয়ে উঠেছিল বিভ্রান্ত ইহুদী–নাছারাবাদের উন্মুক্ত চারণভূমি।

ইমাম খোমেনীর ইসলামী বিপ্লবের ডাক আমাদের কর্ণকুহরে অনেক বিলম্বে পৌঁছলেও শয়তানরূপী পাশ্চাত্য বিশেষতঃ আমেরিকার কাছে যথাসময়েই পৌঁছেছিল। তাই শুরু থেকেই তারা বিপ্লবের আহবানকে বিকৃত ও দিকভ্রান্ত করতে, বিপ্লবের চারা গাছটিকে সমূলে উপড়ে ফেলার লক্ষ্যে প্রথমেই শাহ'র মগজে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল 'মোল্লাতন্ত্র'কে খতম করে দেবার কুমন্ত্রণা।

পুরো পাশ্চাত্য কোরাস গেয়ে প্রচার করলো ইরানকে পশ্চাৎগামী করার জন্যই 'মোল্লারা' প্রগতির পথে বাধ সাধছে। শাহ ব্যবহৃত হলো বরকন্দাজ হিসাবে। ইসলামের শক্তি সম্পর্কে শয়তানদের জানা। তাই তারা প্রচার শুরু করলো, "ইসলাম এ যুগে 'অচল'; এ যুগের মানুষকে মধ্যযুগে ফিরিয়ে নেবার জন্য ইসলামের কথা বলা হচ্ছে।'

৪. ইসলামই একমাত্র শক্তি যা প্রতিষ্ঠিত হবার দাবী রাখে। ইসলাম পৃথিবীর যে

অঞ্চলেই উত্থিত হোক না কেন বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রোজ্জ্বল শিখায় রূপান্তরিত হবে-এ ধারণা পাশ্চাত্যের রয়েছে। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে পৃথিবীর উপর তাদের কায়েমী স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য; মজলুমদের চোখ-কান খুলে যাবে। মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্বের দিন ফুরিয়ে যাবে। তাই তারা প্রথমেই চেষ্টা করে আদর্শ হিসাবে ইসলামকে বিকৃত করে উপস্থাপন করতে, প্রগতি এবং বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক করে দেখাতে, যুগ-চাহিদা মেটাবার অক্ষমতা প্রমাণ করতে।

প্রাথমিক এ পদক্ষেপে তারা সফল না হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে তারা চায় ইসলামকে খন্ডিত করে উপস্থাপন করতে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-সভ্যতা থেকে আলাদা করে জীবন-জগত, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিকতা থেকে নিরপেক্ষ করে রাখতে। তথাকথিত ধর্ম বিশ্বাসের নামে সব কিছু থেকে ইসলামকে আলাদা করে 'প্রার্থনা নির্ভর' করে তুলে ধরতে। ইমাম খোমেনী অমন ইসলামকে আখ্যায়িত করেছিলেন 'আমেরিকান ইসলাম'।

এ দু'টো বুদ্ধিবৃত্তিক মগজ ধোলাই পর্বেও সফল না হলে তারা প্রত্যক্ষভাবে ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধে মনোভাব গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইসলামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে এরূপ সেন্টিমেন্ট গড়ার কাজে তারা পুরো প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগায়।

'মৌলবাদ, কট্টরপন্থী, উগ্রবাদী, মোল্লাতন্ত্র, মধ্যযুগীয় বর্বরতা' ইত্যাদি কতিপয় শব্দকে তারা বাছাই করে নেয়, এবং জঘন্য ভাষায় জনগণকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে।

৫. পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যম তা সংবাদপত্র হোক, আর ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া হোক, কিম্বা হোক সংবাদ সংস্থা, এগুলোর উপর একক ও একচ্ছত্র আধিপত্য চলে পাশ্চাত্য ইহুদীবাদী চক্রের। গুরুত্বপূর্ণ এসব জন ও গণ মাধ্যমগুলোর উপর তাদের নিয়ন্ত্রণের মূল লক্ষ্য হচ্ছে তাদের সুবিধা মত তিলকে তাল করা- তালকে তিল করা। সত্যকে সন্দেহের মোড়কে ঢেকে দেয়া। মিথ্যাকে রং ছড়িয়ে প্রকাশ করা, নিজেদের স্বার্থে সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করে ফায়দা লুটা।

সত্যিকথা বলতে কি, এরা মুসলমান এবং ইসলামের বিরুদ্ধে সব সময় যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করে রাখে। যেখানেই ইসলাম প্রতিষ্ঠার আওয়াজ উঠে, মুক্তির যুদ্ধ শুরু হয়, মুসলমানেরা মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করে, সেখানেই তারা প্রথম যুদ্ধ শুরু করে প্রচার মাধ্যম দিয়ে। বসনিয়া থেকে শুরু করে পেছনের ক্রুসেড যুগ সর্বত্র আমরা পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমের আগ্রাসী ও সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি। ইতিহাস সত্যের পক্ষে বলে। তাই এরা প্রায়ই ধরা পড়ে যায়। এদের সৃষ্ট ধূম্রজাল ছিন্ন করে মজলুমেরা মাথা তুলে দাঁড়ায়।

পশ্চিমা তথ্য সাম্রাজ্যবাদীদের ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পৃথিবীর মানুষ প্রতিদিন আটকা

পড়ছে। আজকের বিশ্বে আদর্শিক শূন্যতার প্রেক্ষাপটে পশ্চিমারা এককভাবে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া তাদের সাফল্য আশাতীত। মুসলমানদের মুক্তি আন্দোলনগুলোর উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ শতভাগ বলে তারাই দাবী করছে। রাজা-বাদশারা তাদের কেনা, বহুদেশের সরকার তাদের হাতের মুঠোয়। তারাই গণতন্ত্রদের একমাত্র সবকদাতা, মানবাধিকারের প্রবক্তা।

৬. ইতিহাসে একটি মাত্র ব্যতিক্রম আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। তা হচ্ছে বিস্ময়কর নেতৃত্ব আর যুগোপযোগী গুণাবলীর আধার, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ইমাম খোমেনী।

একদিন আমরা ঢাকায় বসে খবর শুনলাম ইমাম খোমেনী মারা গেছেন। ইরানী কর্মকর্তারা তাঁর মৃত্যু সংবাদ গোপন রেখেছেন। সম্ভাব্য গৃহযুদ্ধের আশংকায়। এ তথ্য সরবরাহ করেছে পশ্চিমা সংবাদ সংস্থা। এমন ডাহা মিথ্যা খবরটি পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম রটনা করেছিলো ইমামের মৃত্যুর প্রায় চার বছর আগে।

শাপুর বখতিয়ার, বনিসদর, মেহেদীবাজারগান প্রভৃতি নেতৃত্বকে অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য এবং উদারপন্থী বলে পশ্চিমারা প্রচার করলো বহুবার। অথচ এরা ছিলো জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত।

তেহরানে বোমা বিস্ফোরণের পর নেতৃত্ব শূন্যতার খবর দিয়ে তারা প্রচার করলো, ইরান শাহের আমলে প্রত্যাবর্তন করছে।

রাহবার খামেনেয়ী এবং প্রেসিডেন্ট রাফসানজানীর মধ্যকার কল্পিত ঠান্ডা যুদ্ধের খবর দিয়েছে এরা বহুবার। নেতৃত্বের লড়াইয়ে ইরান কাবু হতে চলেছে এ সংবাদ প্রায়ই পশ্চিমা মাধ্যমগুলো প্রচার করে বেড়ায়। ইরানে কট্টরপন্থী এবং উদারপন্থীদের সংঘাত দেখানো তাদের প্রচার মাধ্যমগুলোর রীতিমত রুটিন ওয়ার্ক। এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়াও তাঁরা ধারাবাহিকভাবে ইমাম খোমেনী এবং তার নেতৃত্বে পরিচালিত বিপ্লবকে আতুড় ঘরেই বিতর্কিত এবং গলা টিপে হত্যা করতে চেয়েছিলো।

বিশ্বযুদ্ধ প্রাক্কালে গোয়েবলসীয় মিথ্যাচারকে যদি মিথ্যাচার বলা হয়; তাহলে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হবার সময় থেকে এ নাগাদ তথ্য সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃক প্রচারিত মিথ্যাচারকে মহামিথ্যাচার বলেও শেষ করা যাবে না।

এদের মিথ্যাচারের কাছে ইদি আমিন পাগল হয়ে বেঁচেছে। নরিয়েগা মহা অপরাধী আখ্যা পেয়েছে। আফগানের 'মোল্লারা' কাবু হয়েছে। গাদ্দাফী-সাদ্দামেরা অধম সেজেছে। ইয়েলেৎসিনরা রাতারাতি উপরে উঠে এসেছে। কিন্তু সামান্য টলেননি ইমাম খোমেনী। অবস্থান পরিবর্তন করেনি ইরানী জনতা, বিপ্লবকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে ইরানী জনতার অঙ্গীকার তথ্য সাম্রাজ্যবাদীদের টনক নড়িয়ে দিয়েছে। তাদেরকে বাধ্য করেছে

কৌশল পাল্টাতে। রূপ পাল্টানো আধুনিক জাহেলিয়াত প্রতিদিন নতুন নতুন কৌশল গ্রহণ করছে। আদর্শিকভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ ইহুদী চক্রের প্রচার মাধ্যমগুলো নিরন্তর অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

৭. সাম্রাজ্যবাদ মানে পররাজ্যের উপর কর্তৃত্ব বিস্তারের রাজনৈতিক কূটকৌশল। ইংরেজীতে শব্দটা Imperialism, বাংলায় সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদ নেতিবাচক শব্দ। এটা মানুষের কু-প্রবৃত্তিজাত পশু প্রবৃত্তিরই বহিঃপ্রকাশ। আদি সমাজে এ রূপ ছিলো ভিন্নতর। একটি ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ আধুনিক রূপ পেয়েছে। ধারণা এবং সংজ্ঞায় এর পরিধি এখন বেশ বিস্তৃত।

এমন এক সময় ছিলো, তখন মানুষই সবকিছুর উর্ধ্বে বিবেচিত হতো। অল্প সংখ্যক মানুষের মধ্যে মানুষই সবচেয়ে দামী সম্পদের মর্যাদা পেতো। তাই শক্তিধররা চাইতো কিভাবে মানুষকে কাবু করা যায়, বাগে আনা যায়, প্রভূত্ব বিস্তার করা যায়। গোলাম এবং ক্রীতদাসের ধারণা সাম্রাজ্যবাদের সনাতনী রূপ। এ সময়টা দ্রুত পরিবর্তিত হলে মানুষ ভূমির দিকে নজর দিলো। কারণ পশু লালনে চারণভূমির যেমন প্রয়োজন ছিল; তেমনি প্রয়োজন ছিল; দাস বা গোলামদের বসতির বিস্তৃত পরিসর। নিজেদের জন্য আলাদা প্রাসাদ বা সুরক্ষিত এলাকা-অভিজাত পল্লী গড়ার। তাই একগোত্র অন্যগোত্রের ভূমিতে ভাগ বসাতো, জবর দখল নিতো। শক্তি প্রয়োগ করে ভূমি দখলের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের এ রূপটি আদি যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়েছে। মধ্যযুগে অবশ্য ভূমি থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো বাজারের উপর। বাজার নিয়ন্ত্রণ করে তারা স্বার্থ হাসিল করতো। বাজার দখল ও নিয়ন্ত্রণের এ ধারণা অস্ত্র বিক্রি পর্যন্ত গড়ালো। তাৎক্ষণিক এ ধারণায় যোগ হলো নিজেদের মতবাদ চাপানো, তা কখনো গণতন্ত্রের নামে, কখনো সমাজতন্ত্র বা অন্য কোন নামে। এ ধরনের সাম্রাজ্যবাদী ধারণায় রাজনীতি প্রাধান্য পেয়ে যায়। চোখ কান খোলা মানুষ এর রূপ বুঝে ফেলে বিধায় এটা বর্জনীয় হতে থাকে। এ সময় সাম্রাজ্যবাদের কাঁধে ভর করে কূটনীতি নামক এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক সাম্রাজ্যবাদ। এ সম্পর্কেও মানুষের সতর্কতা বৃদ্ধি পেলে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনই সাম্রাজ্যবাদের আধুনিক রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সম্প্রতি বিশেষতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটাও ঘৃণিত কাজ হিসাবে চিহ্নিত হলে সাম্রাজ্যবাদ সর্বাধুনিক রূপ গ্রহণ করে তথ্য প্রবাহে আধিপত্য বিস্তারের মধ্য দিয়ে। তথ্য সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে মানুষকে মানসিক গোলামীতে রূপান্তর করা সবচেয়ে সহজ। তাই সাম্রাজ্যবাদের আদিরূপ থেকে বর্তমান রূপ গ্রহণ করেছে, যাকে এক শব্দে আমরা তথ্য সাম্রাজ্যবাদ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। আধুনিক ধারণায় এটা এখনও নেতিবাচকভাবে চিহ্নিত হয়নি। কারণ সাম্রাজ্যবাদীদের যে কোন স্বরূপই প্রথমতঃ দৃষ্টিনন্দন এবং চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকে।

রূপটা থাকে সুন্দরের মোড়কে ঢাকা।

৮. 'মগজ ধোলাই' একটি আধুনিক পরিভাষা। এর অর্থ মানসিক গোলামে পরিণত করা। এটা করা সম্ভব সাহিত্য-সংস্কৃতি, বই-পুস্তক সহ বিভিন্ন প্রকাশনা ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার মাধ্যমে। পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এটাকে বিকশিত করা হয়। ব্রেন ওয়াশ বা মগজ ধোলাই এ যুগে এতটা কার্যকর যে কোন কোন সামর্থবান শক্তি ইচ্ছে করলে সমাজপতি, শাসকশ্রেণী, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সংস্কৃতি-সেবীকে এক লহমায় দাসে পরিণত করতে পারে। অভ্যাস পাল্টিয়ে দেয়া, কোন কাজকে মানসিক অভ্যাসে পরিণত করা সহজ না হলেও সমাজ-সভ্যতা নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারগুলোকে নিত্য কাজে লাগিয়ে সহজাতভাবে মানুষকে কুপ্রবৃত্তিজাত কাজে অভ্যস্ত করে তোলা সম্ভব। টিভি দেখা, সংবাদপত্র পড়া, রেডিও শোনা, গান, নাটক, নভেলে অভ্যস্ত করার মধ্য দিয়ে এটা খুব সহজেই করা সম্ভব।

একটি প্ররোচনামূলক গ্রন্থ ও তথ্য দিয়ে পুরো জাতির ধর্ম বিশ্বাসে চিড় ধরিয়ে দেয়া মোটেও কোন কষ্টকর কাজ নয়। যুগ যুগ ধরে প্রচারণা চালিয়ে সত্যের ভিতে ধস্ নামিয়ে দেয়া আজকের যুগে হয়তো অসম্ভব নয়।

বুদ্ধিমানের মগজ ধোলাই করা যায় বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায়, গরীবের মগজ ধোলাই করতে ক'টা টাকাই যথেষ্ট। ভোগবাদীকে ভোগে মত্ত করে, নারীবাদীকে নারীতে লেলিয়ে দিয়ে, চাওয়া-পাওয়াকে সহজলভ্য করে মগজ কেনা যায়।

৯. দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষে সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশগুলোকে দখলে নেয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে সাহায্য ও ঋণের যোগান দেয়। জনগণের মন-মগজ-ধোলাইয়ের জন্য সরবরাহ করতে থাকে বিকৃত তথ্য। চালায় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। সমাজতান্ত্রিক ব্লক এবং পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা এ উপলক্ষে তাদের সকল প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করায় বিশ্ব বিবেকের কাছে এগুলো তথ্য সাম্রাজ্যবাদ হিসাবে চিহ্নিত হয়।

তথ্য সাম্রাজ্যবাদের দু'টো শক্তিশালী অস্ত্র হচ্ছে প্রিন্টিং ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া। প্রিন্টিং মিডিয়ার অন্যতম শাখা সংবাদপত্র। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতনের পর পত্রিকা জগতে মার্কিন ও ব্রিটিশ মালিকানাধীন টাইম, নিউজ ইউক, ইকনোমিস্ট, নিউ ইয়র্ক টামইস, লস এঞ্জেলস টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল, প্যারিস থেকে মার্কিন মালিকানায় প্রকাশিত সংবাদপত্র 'ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন" তথ্য সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা পালন করে।

১৯৮৭ সনের সর্বশেষ হিসাবে দেখা যায় টাইম-এর এশিয়া সংস্করণের প্রচার সংখ্যা প্রায় দু'লাখ। ল্যাটিন আমেরিকা সংস্করণ বিক্রি হয় সোয়া লাখের কাছাকাছি। সারা বিশ্বে টাইম-এর ২০০ ধরনের সংস্করণ বের হয়, অতির আদলে। এছাড়াও

অতিরিক্ত প্রায় দু'লাখ কপি–টাইম প্রতি বছর এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। ১৯৭৬ সন থেকে ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল–এর এশিয়া সংস্করণের প্রকাশনা শুরু হয়। ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন একাজে হাত দেয় ১৯৮০ সালে। এ সকল পত্রিকার মালিক পক্ষ শুধু আঞ্চলিক সংস্করণ করেই ক্ষান্ত থাকে না। তাদের কথাগুলো উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও পত্রিকার সম্পাদকদের কাছ বিনামূল্যে প্রেরণ করে থাকে। নিউইয়র্ক টাইমস, লস এঞ্জেলেস টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট প্রতিদিন ৪০টি দেশের ১০০টি সংবাদপত্রের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সে সব পত্রিকায় তাদের বক্তব্যগুলো প্রকাশ করে কৃতার্থ হয়।

এ সকল পত্রিকায় কি ছাপা হয় তা ১৯৮১ সনের সেপ্টেম্বর মাসের নিউইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিনের একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায়। পত্রিকার মার্কিন সাংবাদিক ক্রিস্টোফার জোনসের কম্পুচিয়ার যুদ্ধের উপর লেখা একটি প্রতিবেদনে পলপট বাহিনীর বড় ধরনের ঘাঁটি স্থাপন এবং স্বচক্ষে পলপটকে দেখার কথা বলা হয়। ১৯৭৯ সন থেকে যে পলপটের সন্ধান ছিলো না তাকে স্বচক্ষে দেখার কাহিনী, যুদ্ধ বর্ণনা এবং যুদ্ধে ভিয়েতনামী অস্ত্রের ব্যবহার ও নৌবাহিনীর উপস্থিতির বিশ্বস্ত (!) বর্ণনা সম্বলিত প্রতিবেদনটি প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রতিবেদনটি প্রকাশের কয়েক মাস পর ১৩ জানুয়ারী নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র 'ভিলেজ ভয়েস" এক অভিযোগে বলা হয় জোনসের প্রতিবেদনে বর্ণিত একটি চরিত্র আঁদ্রে মলরোর চল্লিশের দশকে ইন্দোচীন সম্পর্কে লেখা একটি উপন্যাসের চরিত্রের অবিকল প্রতিরূপ।। এ অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে জোনসে বলেন, 'খানিকটা রং চড়ানোর' লক্ষ্যে তিনি ঐ বইয়ের সাহায্য নেন এবং তিনি কম্পুচিয়া যাননি। জুলাইয়ের ৪ সপ্তাহ তার বাবা মার ফ্লাটে অবস্থানকালে তিনি এই প্রতিবেদন তৈরী করে সুইজারল্যাণ্ডে চলে যান এবং সবেমাত্র থাইল্যাণ্ড থেকে আসার ভাব দেখিয়ে সুইজারল্যাণ্ডের লোকার্নো থেকে উল্লেখিত প্রতিবেদনটি নিউ ইয়র্কে পাঠান। তিনি প্রতিবেদনটিকে প্যারিসে খেমার বাহিনীর অফিসের মহিলা কর্মচারী কমরেড কণিকাকে কম্পুচিয়ায় যুদ্ধরত "চমৎকার বলশালী ধূসর চুলের পুরুষ" হিসাবেও উল্লেখ করেন।

পত্রিকায় মিথ্যা প্রতিবেদন প্রকাশের ঘটনা ব্যতিক্রম নয়, বরং সাধারণ ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ছবি ব্যবহারের মাধ্যমেও তারা মিথ্যাকে সত্যের মতো মানুষের কাছে তুলে ধরে। লা ফিগারোর সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে। নিকারাগুয়ার বিপ্লবী সরকারের ক্ষমতা দখলের পর ম্যাগাজিনটি দু'পৃষ্ঠার যে সচিত্র প্রতিবেদন ছাপে তাতে দেখানো হয় ১৯৮১ সনের ডিসেম্বর মাসে মার্কসবাদী গেরিলারা হন্ডুরাসে প্রবেশ

করে মহিলা ও শিশুসহ ২০০ লোককে গুলি করে হত্যা করে তাদের মৃত্যুদেহগুলো পুড়ে ফেলে। ছবিতে মৃতদেহের স্তূপ এবং অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ দেখানো হয়। প্যারিসে অবস্থিত নিকারাগুয়ার দূতাবাস এর প্রতিবাদ করলে "লা ফিগারো" এবং মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এডরিয়ান ফিশার স্বীকার করেন যে, ঘটনা মিথ্যা। ছবিগুলো সমাজতান্ত্রিক সরকারের নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের। মূলতঃ সমাজতান্ত্রিক সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই এ মিথ্যা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছিল। এ সকল পত্র-পত্রিকা একই ভূমিকা পালন করে। ইরানী বিপ্লব ও ইরান-ইরাক যুদ্ধকালীন সময়ও ইরানী বিপ্লবকে কোণঠাসা করার লক্ষ্যে এ সকল পত্র-পত্রিকা ইরানী বিপ্লবের নেতাদের বিরুদ্ধে অনেক কুৎসা প্রচার করেছে। নিরাপরাধ মানুষের হত্যাকারীদের সুষ্ঠু বিচারের মাধ্যমে সাজা প্রদানকে বলেছে হত্যা। আর বিচারকদেরকে বলেছে হত্যাকারী। কিন্তু কারাগারে হত্যা করা বা বাসা থেকে ধরে নিয়ে গুম করে দেয়ার জন্য তারা শাহ বা সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তোলেনি। এড়িয়ে গেছে যুদ্ধকালীন ইরাকের বর্বর আচরণকে। সমাজতান্ত্রিক ব্লকের পত্র-পত্রিকা আফগান মুজাহিদদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বলেছে দস্যুবৃত্তি। এ সবই করা হয়েছে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ রক্ষার্থে।

১০. ফোর সিস্টার হিসাবে খ্যাত সংবাদ সংস্থাগুলোর মোড়ল হচ্ছে নিউইয়র্কের এপি ও ইউপিআই, প্যারিসের এএফপি ও ইউপিআই। প্যারিসের এএফপি ও লণ্ডনের রয়টার আজ গোটা বিশ্বকে ভাগ করে নিয়েছে খবরের বাণিজ্য করার জন্য। বিশ্বে এপির গ্রাহক সংখ্যা ৯ হাজারের বেশী, যাদের মাধ্যমে সংস্থাটি প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ শব্দ বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ মানুষের কাছে পৌঁছায়। এশিয়ার দেশগুলোর কাছে সংস্থাটি প্রতিদিন প্রেরণ করে প্রায় ৯০ হাজার শব্দ। অন্যদিকে গ্রহণ করে মাত্র ১৯ হাজার। একই অঞ্চলে ইউপিআই প্রচার করে কমপক্ষে ৫০ হাজার শব্দ। এশিয়াতে এএফপি'র দৈনিক প্রচার সংখ্যা ৩০ হাজার শব্দ; আর গ্রহণ করে ৮ হাজার মাত্র। বিশ্বের ১৫৯ টি দেশে ছড়ানো ছিটানো রয়েছে রয়টারের সার্বক্ষণিক সাংবাদিক ও প্রতিনিধি, যারা বিশ্বের একপ্রান্তে ঘটে যাওয়া ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করে বিশ্বের অন্যত্র প্রেরণ করে দ্রুতগতিতে। আসলে বিশ্বব্যাপী সংবাদ শব্দ ও রেডিও ফটো প্রবাহের প্রায় ৯০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে ৪টি বহুজাতিক কর্পোরেশন। ইউনেস্কোর এক সমীক্ষায় দেখা যায়, বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারিত সংবাদে তৃতীয় দুনিয়ার অংশভাগ মাত্র ১৫ শতাংশের কাছাকাছি। এশিয়া (চীন ও জাপান বাদ দিয়ে), আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার পত্র-পত্রিকা ও রেডিওতে প্রকাশিত এ সম্প্রচারিত সংবাদের ৯০ শতাংশেরও বেশী আসে নিউইয়র্ক, প্যারিস ও লণ্ডন থেকে।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ৯টি এশীয় দেশের ১৪টি সংবাদপত্রের প্রকাশিত

তৃতীয় বিশ্বের খবরের ৭৬·৪ ভাগ এবং ল্যাটিন আমেরিকার ১৬টি পত্রিকার বিদেশী সংবাদের ৮০ ভাগ সরবরাহ করেছে উল্লেখিত সংস্থা। কিন্তু এরা ল্যাটিন আমেরিকা থেকে কোন সংবাদ প্রেরণ করে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩টি প্রধান টেলিভিশন নেটওয়ার্ক এবিসি, সিবিএস এবং এনবিসি'র প্রচারিত ১০৮টি সান্ধ্যকালীন খবরের উপর পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায় প্রচারিত মোট সংবাদের ২০ শতাংশ বিদেশী খবর, যার মাত্র ২ শতাংশ ল্যাটিন আমেরিকার। আর প্রচারিত এ ২ শতাংশের মধ্যে সে সকল সংবাদই রয়েছে যা পশ্চিমা বিশ্বের প্রয়োজন, তাদেরই স্বার্থ–রক্ষার্থে। আর সে সকল দেশের প্রকৃত বাস্তবতাকে প্রতিফলিত না করে সেখানকার আর্থ–সামাজিক উন্নয়নে আগ্রহী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারের বিরুদ্ধে নেতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলে। এ মন্তব্য সোভিয়েত লেখক এ গ্রাচেভ এবং এন ইয়েরমোশকিন এর। অবশ্যই সোভিয়েত ব্লকের পত্রিকা, সংবাদ সংস্থাগুলোর অবস্থা যে এর বিপরীত এমনটি নয়। সেখানে ছিল তাসের একচেটিয়া প্রভাব। উল্লেখিত চিত্রের অপর পিঠ মাত্র।

এ সকল সংবাদ সংস্থা সংবাদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেমন সাম্রাজ্যবাদীদের প্রয়োজনকে বেশী গুরুত্ব দেয়, তেমনি তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে এরা সংবাদের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেয় পশ্চিমা বিশ্বের প্রভেদের দৃষ্টিভঙ্গি। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক জনাব আলী রীয়াজ তার এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, উল্লেখিত কারণেই পোপ জন পলের উপর গুলি বর্ষণের খবরটি পরিবেশনের সময় প্রধান দু'টি বার্তা সংস্থা গুলি কর্ষণকারীর চেহারার সাথে প্যালেস্টাইনী ও চিলির 'সন্ত্রাসবাদীদের' মিলের কথাও উল্লেখ করে। ব্রাসেলসে ১৯৮১ সনের জুন মাসে পিএলও প্রতিনিধি গুলিবিদ্ধ হবার খবরটির সাথে এ ধারণাটিও প্রচার করা হয় যে চরমপন্থী আরবরাই এ কাজটি করেছে। সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক ও বোম্বের বাণিজ্যিক ভবনে বোমা বিস্ফোরণের দায়ভার প্রচার মাধ্যমগুলো মুসলিম উম্মাহর কাঁধে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল। খোমেনী ভক্তদের দুর্বল করার জন্য রয়টার একবার ইরানের ধর্মীয় নেতার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ প্রচার করে খুব কৌশলে। এই সংবাদ সংস্থাগুলোই সত্যকে গোপন করে ইরান–ইরাক যুদ্ধের সময় সাদ্দামকে বসিয়েছিলো দেবতার আসনে। আর এখন তুলে ধরেছে তাকে পশু হিসাবে। পরিণত করেছে কুর্দীদের ঘাতকে। এরাই ইদি–আমিনকে বানিয়েছিল পাগল, আইদিদকে দেশদ্রোহী।

পশ্চিমা বার্তা সংস্থাগুলোর সংবাদ প্রচারের অপকৌশল সম্পর্কে গুয়াতেমালার সাবেক প্রেসিডেন্ট জুয়ান জোসে আরেভেলো তার 'এন্টি কমিউনিজম ইন লেটিন এ্যামেরিকা ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখিছেন ল্যাটিন আমেরিকায় পুঁজিবাদী দেশের বার্তা সংস্থাগুলো 'হার্ট মেথড'।

১১. ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বড় হাতিয়ার হচ্ছে টিভি। আর একে এককভাবে দখল করে আছে পশ্চিমা দেশগুলো বিশেষ করে আমেরিকা। আর তাদের হাতে জিম্মি হয়ে আছে তৃতীয় বিশ্বের মানুষগুলো। আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের এ মাধ্যমগুলো তাদের স্বার্থের অনুকূলে আমাদের জন্য যা তৈরী করে তা আমরা গ্রোগ্রাসে গিলি। ফলে আকৃতিতে নিজ দেশের নির্ভেজাল বাসিন্দা থাকলেও চিন্তা–চেতনায় হয়ে যাই পশ্চিমা সেবক। এ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কি প্রচার করা হয় তার উপর ইউনেস্কোর অধীনে গবেষণা করেন টাপিও ভেরিস এবং কার্ল নর্দেনস্ট্রেং। তাঁরা ৫০টি দেশের টেলিভিশন অনুষ্ঠান পর্যালোচনা করে পাঁচটি সিদ্ধান্তে উপনীত হনঃ

(১) বিদেশে প্রেরণের জন্য তৈরী টিভি প্রোগ্রামগুলো কয়েকটি দেশের মুনাফা লাভের প্রচেষ্টায় লিপ্ত (২) ধনী পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র কম মূল্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এসব প্রোগ্রাম বিক্রি করে। (৩) অধিকাংশ দেশের সম্প্রচার সময়ের বিরাট অংশ ব্যয় হয় এসব আমদানি করা প্রোগ্রাম দেখাতে। (৪) আমদানি করা এসব প্রোগ্রামের অধিকাংশই হচ্ছে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, টিভি সিরিজ ও হাল্কা মনোরঞ্জক অনুষ্ঠান, (৫) টেলিভিশন সংবাদচিত্র বিনিময় ও ৩ টি পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে; ডিস, নিউজ, ইউপিআইটি এস সিবিএস নিউজ।

শুধু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই নয় নিজেদের মনুষ্যত্বহীনতা ও সামাজিক অসুস্থতা ভিন্ দেশে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে পশ্চিমা দেশগুলো এসকল প্রোগ্রাম তৈরী ও রপ্তানি করে থাকে। এ সকল অনুষ্ঠানগুলোতে কি থাকে বা কি দেখানো হয় তা জানার জন্য ব্রাজিলের O Estado De Sao Paulo পত্রিকাটি সাও পাওলো শহরের ৬টি টিভি স্টেশনের এক সন্ধ্যার ৩ ঘন্টায় বিদেশী অনুষ্ঠান বিশ্লেষণে ৬৪টি খুন, ৩৮টি বন্দুক যুদ্ধ, ১২টি লড়াই, ৩টি ডাকাতি ও ৯ টি সড়ক দুর্ঘটনার দৃশ্য দেখতে পায়। বিটিভির বিদেশী অনুষ্ঠান দেখলে এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। এ সকল দৃশ্যে দর্শকদের অনুভূতি কি হবে সে সম্পর্কে এক চমৎকার মন্তব্য করেছেন ফরাসী সাংবাদিক মরিস মাসিনো। তিনি বলেন, এসব দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত আমাদের চোখের সামনে যখন বাস্তবেই এমন ঘটনা ঘটবে তখন স্বাভাবিক ঘটনার মতোই আমরা গ্রহণ করবো, যা ইতিমধ্যেই বিবিসি'র কাছ থেকে শুনতে শুরু করেছি।

১২. বিভিন্ন সাহায্য পাওয়ার আশায় উন্নয়শীল দেশগুলো স্বল্পমূল্যে কোন কোন ক্ষেত্রে নাম মাত্র মূল্যে এ সকল প্রোগ্রাম বা ছবি কিনে থাকে। উন্নত দেশগুলো তাদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বেশী মূল্যে তৈরী এ সকল অনুষ্ঠান বা ছবি উন্নয়নশীল দেশে রপ্তানি করে থাকে। ১৯৭৬ সনে যুক্তরাষ্ট্র একটি আধ ঘন্টার ছায়াছবি দু'লাখ ডলার ব্যয়ে নির্মাণ করে কোস্টারিকার কাছে ৬০/৭০ ডলারে, কেনিয়ার কাছে ২৫/৩০

ডলারে বিক্রি করেছে। এ সকল কি উদারতা? এর পিছনে রয়েছে এক সুদূর প্রসারী সংস্কৃতি ধ্বংসের পরিকল্পনা, মানসিক দাসত্বে শৃংখলাবদ্ধ করার ষড়যন্ত্র।

পশ্চিমারা তৃতীয় বিশ্বের বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য যে সকল ছবি নির্মাণ করে তার অনেকগুলোর প্রদর্শন স্বদেশে নিষিদ্ধ। ছবিগুলোর তৈরীর প্রধান লক্ষ্য থাকে এ সকল দেশে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের পাশাপাশি পশ্চিমা বিলাস-পণ্যের বাজার সৃষ্টি। এক জরীপে দেখা গেছে, একটি চলচ্চিত্রে ফ্রিজের ব্যবহার দেখার পর ইন্দোনেশিয়ার মানুষের মাঝে ফ্রিজ ক্রয়ের ধুম পড়ে যায়, এবং সক্ষম -অক্ষম সকলের মনেই ঐ সাদা বাক্সটি পাবার আকাঙ্খা জাগে। ফলে সেটাকে তখন অনেকে কৌতুক করে 'ফ্রিজ বিপ্লব' নাম দিয়েছিলো।

একই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে পশ্চিমা প্রকাশনাগুলোও। দশটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান সারা বিশ্বের পুস্তক ব্যবসার প্রধান অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। এগুলো হচ্ছে ম্যাগ্রোহিল, জেরোক্স, সিবিএস, আরসিএ, প্রেন্টিস হল, স্কট, ফ্রেসম্যান এণ্ড কোং, আইটিটি, ওয়েস্টিং হাউস এবং জেনারেল লার্নিং কোং। এশিয়া ও আফ্রিকার পুস্তক বাজার নিয়ন্ত্রিত হয় মার্কিন, ফরাসী ও ব্রিটিশ প্রকাশক ব্যবসায়ীদের দ্বারা। একমাত্র মার্কিন প্রকাশনা সংস্থাগুলো বছরে কমপক্ষে ৩০ কোটি ডলারের বই বিক্রি করে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে। এ প্রকাশনাগুলোর মধ্যে হার্স্ট কর্পোরেশন, ওয়েস্টার্ন পাবলিশার্স, ওয়াল্ট ডিজনী প্রডাকশন্স ও রিডার্স ডাইজেস্ট হচ্ছে তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় একচেটিয়া পুস্তক ব্যবসায়ী। সত্তরটি দেশে রয়েছে ব্রিটিশ প্রকাশকদের বড় ধরনের বাজার। বছর কয়েক আগে ব্রিটিশ পাবলিশার্স এসোসিয়েশনের সচিব রোনাল্ড বার্কারের হিসাব মতে ব্রিটিশ ও মার্কিনী প্রকাশকরা বছরে ৩০৯ হাজার টাইটেলের বই প্রেরণ করে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে।

১৩. কথিত পশ্চিমাদের আরোপিত 'তৃতীয় বিশ্ব' শব্দটি জনগণের মনোজগতে উপনিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে পশ্চিমা দেশগুলোর সংবাদ সংস্থা, সংবাদপত্র, সিনেমা, টিভি'র পাশাপাশি রেডিও, তথ্য সংস্থা এবং বিভিন্ন ফাউণ্ডেশনও ব্যবহার করে থাকে। সারা দুনিয়ার বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের চিন্তাবিদদের মগজ ধোলাইয়ের লক্ষ্যে এ সকল ফাউন্ডেশন তাদের পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে। এটা করা হয় পুঁজিবাদী বিশ্বের অর্থনৈতিক , সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। এ লক্ষ্যে পুঁজিবাদী দেশগুলোর প্রায় ১৭ হাজার ফাউণ্ডেশন সারা বিশ্বে কাজ করছে যার পেছনে বছরে ব্যয় হচ্ছে কোটি কোটি ডলার। এ সকল প্রতিষ্ঠানের পেছনে প্রতি বছর যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তার অর্ধেক খরচ হয় মাত্র ২৫০টি ফাউণ্ডেশনের পেছনে। আর এদের মধ্যে

শীর্ষে আছে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ও রকফেলার ফাউণ্ডেশন। ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সম্পত্তির পরিমাণ ৩ মিলিয়ন ডলারেরও বেশী। আর ৩৫০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পত্তি রয়েছে রফফেলার ফাউন্ডেশনের। এ সকল ফাউণ্ডেশনের প্রধান কাজই হলো বিশ্বের সেরা চিন্তাবিদদের কাছে নতুন নতুন চিন্তাযোগ্য বিষয় সরবরাহ করা। যার উপর গবেষণার জন্য ঢালা হয় প্রচুর অর্থ। এ গবেষণার সকল ফসল উঠে গিয়ে মার্কিনীদের ঘরে। অনেক সময় এ সকল ফাউণ্ডেশন কোন কোন দেশের রাজনীতিতেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। ভারতে লোকসভা নির্বাচনে এশিয়া ফাউণ্ডেশনের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালানোর অভিযোগ উঠেছে কয়েকবার। আর তার প্রথম সভাপতি আর ব্লুম তো স্বীকারই করেছেন যে তাদের প্রধান লক্ষ্য হলো, এশিয়ার মাটিতে সমাজতন্ত্রের বিস্তার রোধ। কিন্তু এখন আর সমাজতন্ত্র নেই। আছে 'ইসলামী মৌলবাদ'। আর তা প্রতিরোধের উপায় উদ্ভাবনের জন্য এ সকল ফাউণ্ডেশন নিরলস গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

১৪. একই কাজ করে যাচ্ছে আমেরিকা ও বৃটেনের তথ্য সংস্থা USIS এবং বৃটিশ কাউন্সিল। USIS হলো যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য সংস্থা। হাবার্ট শিলার মন্তব্যের মধ্য দিয়েই এর উদ্দেশ্য ফুটে উঠে। তিনি বলেছেন, অন্যান্য দেশের জনগণকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ-উদ্ধারে USIS সাহায্য করে থাকে। শিক্ষা, গবেষণা প্রভৃতি সুযোগদানের মাধ্যমে USIS একটি দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোককে প্রভাবিত করে থাকে। ছাত্র থেকে বুদ্ধিজীবী পর্যন্ত সকলকেই তারা প্রভাবিত করার চেষ্টা চালায়। আর এ কাজের জন্য ১২৬টিরও বেশী দেশে USIS এর ৯ হাজারেরও বেশী কর্মচারী ২০টি ভাষায় প্রকাশনার সাথে যুক্ত। যার বার্ষিক ব্যয় প্রায় সাড়ে ৬ মিলিয়ন ডলার। বৃটিশ কাউন্সিলের ভূমিকাও অনুরূপ। শিক্ষা সংক্রান্ত সেবাদানের সুযোগে উপনিবেশের মানসপুত্র গঠনের লক্ষ্যে সেটিও তথ্য বিকৃতির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

১৫. আধুনিক গণ মাধ্যমগুলোর মধ্যে রেডিওর প্রভাব এবং জনপ্রিয়তা খুব বেশী। বর্তমান বিশ্বে ১০০ কোটিরও বেশী বেতার গ্রাহক যন্ত্র রয়েছে। অর্থাৎ প্রতি চারজনে একটি। রেডিও স্টেশনের সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। অথচ সংবাদপত্রের সংখ্যা মাত্র ৯ হাজার। তিরিশটি দেশের বহির্দেশীয় অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা বেশ বড় ধরনের। তারা প্রায় ১০০টি ভাষায় সপ্তাহে ১৫ হাজার ঘন্টা অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের পালের গোদা হলো ভোয়া এবং বিবিসি। ভয়েস অব আমেরিকা ৩৯টি ভাষায় ১৮৮ মিলিয়ন ডলার খরচ করে সপ্তাহে ৯৪০ ঘন্টার অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। প্রায় ৫০ লাখ গ্রাহক যন্ত্রের মাধ্যমে বিশ্বের কোটি কোটি লোক এই অনুষ্ঠান শুনে যার মধ্যে থাকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মতামত সম্বলিত সম্পাদকীয়,

মার্কিন জীবনধারা সম্পর্কে আলোচনা, সমীক্ষা এবং মার্কিন স্বার্থের অনুকূল সংবাদ। আর সে কারণেই ইরানে ইসলামী বিপ্লব, ইরান-ইরাক যুদ্ধ ও ইরাক-কুয়েত যুদ্ধের সঠিক সংবাদ আমরা পাইনি। স্বার্থগত কারণেই এ সংস্থাটি আফগান মুজাহিদদেরকে বলেছে মুক্তিযোদ্ধা, আর কাশ্মীরী মুসলমানদেরকে বলছে বিচ্ছিন্নতাবাদী। বার্মার বিরোধী দলীয় নেত্রী সুকীকে উপস্থান করছে গণতন্ত্রের মানসকন্যা হিসাবে, আর আলজেরিয়ার স্যালভেশন গ্রুপের নেতাদেরকে বলছে জঙ্গী সন্ত্রাসী ও মৌলবাদী। আর সে কারণেই সুকী পায় নোবেল পুরস্কার। আলজেরিয়ার স্বাধীনতা পাগল মুক্তিকামীরা প্রাণ দেয় ফাঁসিতে। একই উদ্দেশ্যে বিবিসিও ৩৮টি ভাষায় সপ্তাহে প্রায় ৮শ' ঘন্টার অনুষ্ঠান প্রচার করে, যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাজনৈতিক সংবাদ ছাড়া অন্য কোন সংবাদ থাকে না।

১৬. বিষয়টা জটিল কিন্তু অসম্ভব নয়। মহৎ প্রাণরা চিরায়ত মূল্যবোধগুলি খুব ধীরে ধীরে শৈশব থেকে নানাভাবে মানুষের মগজে গুঁজে দেন। আসল মগজটা একটা পাত্রের মত। কানায় কানায় ভর্তি ধারণা-চিন্তা-জ্ঞান দিয়ে এখানে আরো নতুন কিছু প্রবেশ করা যায়। পুরাতন মূল্যবোধ উপড়ে ফেলা যায়, এভাবে মগজধোলাই করে চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন করে ফেলা অসম্ভব নয়। এর মাধ্যমে মানুষের অভ্যাস, চিন্তা, বিশ্বাস এবং মানবিক চেতনাকে একেবারেই ওলট-পালট করে দেয়া যায়। এভাবেই তৈরী হয় পরজীবী বুদ্ধিজীবী, দালাল, ভাড়াটে।

বিশ্বাস, চিন্তা এবং রাজনৈতিক ধারাটাকে এভাবে দ্বন্দ্বে ফেলে দেয়া যুদ্ধ করে সম্ভব নয়। মগজ ধোলাই করে ধর্ম, অধর্ম, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতির সংজ্ঞাটাই পাল্টে দেয়া যায়। আর তথ্য সাম্রাজ্যবাদীরা মগজ ধোলাইয়ের এ সুযোগটা কাজে লাগায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। মগজে যদি থাকে বিবিসি বস্তুনিষ্ঠ, তাহলে তিলকে তাল বললে অবিশ্বাস হবে না। এ জন্য বিবিসি বস্তুনিষ্ঠ হবার ভান করার জন্য পঁচানব্বইটা সত্য বললো অথবা মিথ্যা বললোই না সত্যটা শুধু গোপন করলো। এভাবে বিশ্বাসের ভিত তৈরী করে একদিন হঠাৎ করে মোক্ষম লাভের লক্ষ্যে হাজারো সত্যের সাথে শুধু একজন জীবিত মানুষকে মৃত বলে সন্দেহের ধূম্রজাল সৃষ্টি করলে ধোলাই হওয়া মগজ বিনা প্রতিক্রিয়ায় এ খবরটি গ্রহণ করবে।

সাম্রাজ্যবাদকে চিহ্নিত করার কাজটি নিঃসন্দেহে দুঃসাধ্য। তাত্ত্বিকভাবে একাজটি অনেকেই করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু স্বরূপ উন্মোচন করে চিহ্নিত করার একক সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন ইসলামী বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেনী। তিনি শুধু তথ্য সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপকে চিহ্নিত করলেন না এর বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঘোষণা করলেন।

১৭. ইমাম খোমেনী বর্তমান বিশ্বের প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি সকল সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। পুঁজিবাদী ও বিশ্ব লুটেরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তার মিত্র এবং কম্যুনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তাঁর মিত্রদের একই সঙ্গে একই ভাষায় নিন্দা করেন। তিনি একই সময়ে ইহুদীবাদ, বর্ণবাদ, রাজতন্ত্র, সামরিকতন্ত্রসহ সকল জালেম ও শোষকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার বক্তব্য রাখেন। দুই পরাশক্তি ও তাদের চাঁইদের কাছে তিনি এক লহমার জন্যও আপোষ করেননি। আর সেজন্য ইরানবাসীকে স্বীকার করতে হয়েছে অনেক কোরবানী। শাহের বিরুদ্ধে বিপ্লব সংঘটনে ৬০ হাজার লোক শহীদ এবং প্রায় ১ লাখ লোক পঙ্গুত্ব বরণ করে। পুনরায় ইরান–ইরাক যুদ্ধে লাখ লাখ লোক শহীদ এবং হতাহত হয়। মার্কিনীদের মিসাইল হামলায় ইরানী যাত্রীবাহী বিমান বিধ্বস্ত হয়। সৌদি পুলিশের হামলায় শত শত ইরানী পবিত্র কাবাচত্বরে শহীদ হয়। এত রক্ত, এত ত্যাগ কোন জাতি একটি সত্যের জন্য সমসাময়িককালে দেয়নি। আর এত ত্যাগের পরেও ইরানী জনগণের কোন দুঃখ নেই। লাখ লাখ ইরানী মুজাহিদের রক্তের বিনিময়ে এমন বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে যার বিকাশে ইরান পেয়েছে একটা স্বাধীন আর্থ–সামাজিক–রাজনৈতিক কাঠামো এবং ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা।

ইরানী জাতি বিশ্বাস করে, যে অবিশ্রান্ত ধারায় ইসলামী বিপ্লবের বৃক্ষের শেকড় সিঞ্চিত হচ্ছে লাখো শহীদানের পবিত্র রক্তধারায় তা অবশ্যই একদিন মহীরূহ হয়ে সমগ্র পৃথিবীর মাটিকে শয়তানী অপছায়া থেকে মুক্তি দেবে এবং সকলের অনুভূতিতে ন্যায়, সুবিচার, স্বাধীনতা আর সুখের পার্থিব ধারণাকে মূর্ত করে তুলবে। এ বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হয়ে ইমাম বিপ্লবের পরপরই মুসলিম উম্মাহকে সাবধান করে দেন তাদের শত্রুদের সম্পর্কে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, মুসলমানদের বড় সমস্যাই হচ্ছে, তারা তাদের শত্রুদেরকে চিনতে পারে না। জীবনের অন্তিম মূহূর্তেও ইমাম খোমেনী মুসলমানদের একইভাবে সতর্ক করে গেছেন। তাঁর রেখে যাওয়া অসিয়তনামায় তিনি নতুন করে সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি ও তার দোসরদের সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে গেছেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় ইরানের পররাষ্ট্র নীতিকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রেখেছিলেন যা পরাশক্তিদের গাত্রদাহের কারণ হয়েছিল। তারই প্রতিহিংসাস্বরূপ তারা একের পর এক ইরানকে পর্যুদস্ত করে দেবার জন্য মরণপণ চেষ্টা চালিয়েছে। এমনকি তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিও তারা কটাক্ষ করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। বস্তুতঃ বিগত দুই শতকে যারাই সাম্রাজ্যবাদী লুটেরাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন ভূমিকা নিয়েছে তারাই 'পাগল' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। ইমাম খোমেনীকে সেভাবে চিহ্নিত করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ও ইয়াহুদীবাদী প্রচার মাধ্যমগুলো বিরামহীন প্রপাগান্ডা চালায়।

১৮. ইমাম খোমেনী পরাশক্তির মুখোশ উন্মোচন করতে যেয়ে বলেন, 'প্রকৃত বিষয় হচ্ছে এই যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, পাশ্চাত্যের শক্তিমদমত্ত সরকারগুলো বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কার্যতঃ বিশ্বকে 'ফ্রি' ও কোয়ারেন্টাইন এ দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। মুক্ত অংশের পরাশক্তিগুলো কোন আইনানুগ সীমারেখা ও ভৌগোলিক অবস্থান মানে না। অন্যদের স্বার্থের উপর আগ্রাসন চালানো, জাতিসমূহকে শাসন, শোষণ ও দাস বানানোকে জরুরী, স্বীকৃত, যৌক্তিক এবং আইনসম্মত বলে মনে করে। অপরদিকে, কোয়ারেন্টাইন এলাকার দুঃখজনকভাবে বিশ্বের বেশীর ভাগ দুর্বল জাতি, বিশেষ করে মুসলমানগণ বন্দী হয়ে আছে–তাতে তাদের বেঁচে থাকার এবং মত প্রকাশের কোন অধিকার নেই। এসব দেশের আইন–কানুন–নীতি–ফর্মূলা সবই ওদের নির্দেশিত গোলামদের মনঃপুত এবং শক্তিমদমত্তদের স্বার্থ রক্ষাকারী। ইমাম খোমেনী জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করেন, 'আমরা বিশ্বে ইয়াহুদীবাদী, পুঁজিবাদী ও কম্যুনিজমের পঁচা বিষমূলসমূহকে সমূলে জ্বালিয়ে দিতে চাই। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, মহামহিম আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ও করুণায় এ তিন স্তম্ভ ইয়াহুদীবাদ, পুঁজিবাদ, কম্যুনিজম এর উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থাসমূহকে নাস্তানাবুদ করবো এবং রাসুলুল্লাহ (সাঃ)–এর নেজামে ইসলামকে দাম্ভিক কুফরী বিশ্বে ছড়িয়ে দেবো। আজ হোক কাল হোক শিকলাবদ্ধ জাতিসমূহ তা প্রত্যক্ষ করবে।'

ইমাম খোমেনী মুসলমানদের তিন শত্রুর বিরুদ্ধে বজ্রকঠিন উচ্চারণের পর অপরিণামদর্শী মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে কথা বলেন। 'ইসলামী দেশসমূহের অপদার্থ শাসকদের কলংকজনক ও ঘৃণ্য কার্যকলাপ কেবল অর্ধমৃত ইসলাম ও মুসলমানদের দুঃখ–কষ্ট ও বালামুছিবতই বৃদ্ধি করেছে। ইসলামের পয়গাম অতিজাত মসজিদ ও সুরম্য মিনারসমূহের কোন প্রয়োজনই রাখে না। ইসলামের পয়গম্বর তাঁর অনুসারীদের ইজ্জত, সম্মান ও গৌরবের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন যা দুঃখজনকভাবে ভাড়াটে শাসকদের ভ্রান্তনীতি অবলম্বনের কারণে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে।' ইমাম খোমেনী রাজতন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করতে যেয়ে বলেন, 'একদিকে ওরা অতিজাত ধণিক–বণিক শ্রেণীর ইসলাম ও ঘৃণ্য দরবারী আলেমদের ইসলাম, দ্বীনি মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চেতনাহীন ভন্ড পীর–মাশায়েখ ও মোল্লাদের ইসলাম, জিল্লতি ও লাঞ্ছনার ইসলাম, অর্থ–বিত্ত ও জবরদস্তির ইসলাম, প্রতারণা–আপোষরফা ও বন্দীত্ব বরণের ইসলাম এবং মজলুমান ও নাংগা পা সর্বহারাদের উপর পুঁজি ও পুঁজিপতিদের ইসলাম তথা এককথায় ওরা আমেরিকান ইসলাম প্রচার করছে এবং অপরদিকে তাদের প্রভু সাম্রাজ্যবাদ আমেরিকার দরবারে সেজদা করছে।'

১৯. ইমাম খোমেনী সাম্রাজ্যবাদী, ইয়াহুদীবাদী ও কম্যুনিস্ট পরাশক্তির বিরুদ্ধে কথা বলার পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য উদাত্ত আহবান জানান। এ জন্যেই মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র পবিত্র কাবায় হাজীদেরকে শয়তানী চক্রের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেবার আহবান জানান। ইমাম বলেন, 'বিশ্বের মুসলমানগণ যেহেতু নিজ নিজ দেশে চাপ, জেল-জুলুম এবং মৃত্যুদন্ডের কারণে তাদের দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দেয়া শাসকশ্রেণীর অত্যাচার, অনাচার ও মহামুসিবতের কথা প্রকাশের অধিকার রাখে না, সেহেতু তারা আল্লাহর নিরাপদ হারাম শরীফে তাদের অন্তরের পুঞ্জীভূত ব্যথা ও মুসিবতসমূহকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতার সাথে ব্যক্ত করতে পারেন-যাতে অন্যান্য মুসলমানগণ তাদের নাজাতের উপায় চিন্তা করতে পারেন। তাইতো আমরা এ বিষয়টার উপর জোর দিচ্ছি যে, মুসলমানগণ অন্ততঃ আল্লাহর ঘর তথা আসমানী নিরাপদ হারামে জালিমদের যাবতীয় কলা-কৌশল ও কারাশৃঙ্খলা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত ও স্বাধীন দেখতে পাক। আর একটা বিরাট মহড়ার মধ্য দিয়ে, তারা যে বিষয়কে ঘৃণা করেন তার সাথে বারাআতের ঘোষণা দিক এবং নিজেদের মুক্তির জন্য যে কোন মাধ্যম ব্যবহার করুক।'

তাঁর সুস্পষ্ট, আপোষহীন ও প্রত্যয়দীপ্ত বক্তব্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তো বটেই তাদের এজেন্ট বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের কতিপয় শাসকদের জন্য অত্যন্ত গা-জ্বালার কারণ হয়। তারই ফলশ্রুতিতে ইরান-ইরাক যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয় এবং মক্কাতে ইরানী হাজীদেরকে হত্যা করা হয়। ইরানের বিরুদ্ধে উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ গঠিত হয় এবং তা সক্রিয় করে তোলা হয়। ইরানের বিরোধিতায় সক্রিয় ভূমিকা রাখার পুরস্কার স্বরূপ মিসরকে পুনরায় আরব লীগের সদস্যপদ দেয়া হয়। ইমাম যথার্থই এসব দেশের অপদার্থ ও পাশ্চাত্যের পদলেহী সরকারগুলোর স্থলে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সব দেশের মুসলিম জনগণের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। তাঁর এই আহবানে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আরব নেতারা নিজেদের গদীকে রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হন এবং যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের অন্যান্য মিত্রদের সাথে যোগসাজশে বিপ্লবকে ধ্বংস করে দেয়ার চক্রান্ত করে। কিন্তু তাদের আশা পূরণ হয়নি।

এভাবে শত্রু চিহ্নিত করার কারণেই তিনি হয়েছিলেন তথ্য সাম্রাজ্যবাদের টার্গেট। টার্গেট হওয়ার আগে শত্রু চিহ্নিত না করে গেলে ইতিহাসের মোড় ভিন্ন দিকে ঘুরে যেতো।

২০. সাধারণতঃ অস্বাভাবিক উপায়ে কোন সরকার পরিবর্তিত হলে সে সরকার বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিশেষতঃ পরাশক্তিগুলোর স্বীকৃতি কামনা করে এবং তাদের বস্তুগত ও নৈতিক সমর্থন আশা করে। কিন্তু ইমাম খোমেনী জনগণের শক্তি ও

আধ্যাত্মিকতার অনুভূতিতে বলীয়ান হয়ে বিপ্লব সংঘটনের পরে কোনো শক্তির মুখাপেক্ষী হননি। যেখানে পরাশক্তিগুলো করুণা ভিক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত থাকে সেখানে তাঁর স্বাধীনচেতা মনোভাব স্বাভাবিকভাবেই তাদেরকে ক্ষুব্ধ করেছে। যার কারণে চারদিক থেকে তাঁর প্রতি উপর্যুপরি ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। দেশের অভ্যন্তরে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্ররোচনায় কম্যুনিস্টরা এবং মার্কিনীদের প্ররোচনায় তথাকথিত উদারপন্থীরা গোয়েন্দাবৃত্তি ও অন্তর্ঘাতমূলক কাজের মাধ্যমে প্রতিবিপ্লবী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু ইমাম প্রথমদিকে নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করলেও পরে অত্যন্ত কঠোর হস্তে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। তিনি বিপ্লবের শত্রুদের মুখোশ জাতির কাছে উন্মোচন করে দেন। তারা জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ও ঘৃণিত বলে চিহ্নিত হয়। আজও তাদের ক্ষুদ্র গ্রুপ বিপ্লবের শিকড় কেটে ফেলার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করছে। আর তাদেরকে ইন্ধন যোগাচ্ছে পরাশক্তিগুলো। সাম্রাজ্যবাদী লুটেরা ও তাদের চাঁইদের রক্তচক্ষু ও জিঘাংসা মনোবৃত্তি সত্ত্বেও তিনি তাঁর নীতি ও বিশ্বাসের প্রতি পর্বতের মত অচল-অটল থাকেন। তিনি কারো কাছে সামান্যতম মাথা নত করতে রাজি হননি। বরং সকল ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে তিনি একের পর এক গোলামীর শৃঙ্খল ছুঁড়ে ফেলেন। তিনি সেন্টো থেকে ইরানের সদস্যপদ প্রত্যাহার করেন। ইসরাইলের সাথে আনোয়ার সাদাতের ক্যাম্পডেভিড চুক্তির তীব্র নিন্দা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অবমাননাকর দু'টো চুক্তি একতরফা বাতিল করে দেন। ইরান জোটনিরপেক্ষ জোটের সদস্যপদ গ্রহণ করে। মার্কিন তাবেদার সরকার, শাসক চক্রের সাথে ইরান সম্পর্ক ছিন্ন করে। গুপ্তচর বৃত্তির জন্য একই সঙ্গে মার্কিন ও সোভিয়েত কূটনীতিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এছাড়াও ইসরাইলের সাথে আপোষকামী নীতি অবলম্বনকারী রাষ্ট্রগুলোর ব্যাপারে কড়া নীতি অবলম্বন করা হয়। মিসরকে ওআইসিতে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাবে ইরান প্রবল বিরোধিতা করে। ইরান ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়ার প্রস্তাব সম্বলিত ফাহাদ পরিকল্পনাকেও প্রত্যাখ্যান করে। তিনি সুস্পষ্টভাবে ফিলিস্তিন, লেবানন ও আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের মুক্তি সংগ্রামী মজলুমদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ঘোষণা করেন। ইমাম খোমেনী বলেন, 'যতদিন পর্যন্ত না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এই বাণী সমগ্র পৃথিবীতে ধ্বনিত হবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে। পৃথিবীর যেখানেই জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের সংগ্রাম সেখানেই আমরা আছি।'

বিপ্লব সফল হবার পর ইমাম খোমেনী ঘোষণা করেন, 'আমরা আমাদের বিপ্লব রফতানি করবো।' প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পরাশক্তিবর্গ এবং ইসলামী বিপ্লবের ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত উপসাগরীয় অঞ্চলের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী এই ঘোষণাকে বিকৃত করে বলতে থাকে যে ইরান উপসাগরীয় অঞ্চলে রাষ্ট্রগুলোর উপর আধিপত্য চায়। ইরানের

পক্ষ থেকে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় যে, 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের উপর আগ্রাসন চালাতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয়, কিন্তু সমস্ত মুসলিম উম্মাহকে ইসলামের প্রতি সচেতন করে তোলা এবং পরাশক্তিবর্গের তথ্য জোয়াল থেকে মুক্ত হয়ে তাদের ইসলামী ও জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করাকে ইরান তার উপর ফরজ মনে করে।' গণবিচ্ছিন্ন ও পরাশক্তির পদলেহী সরকারগুলো ইমাম খোমেনীর এই আন্তরিকতাকে তাদের প্রতি শত্রুতা হিসাবে বিবেচনা করে। সেইভাবে প্রচারণা চালায়।

'প্রাচ্য নয় পাশ্চাত্য নয়'–বর্তমান শতাব্দীর সবচেয়ে বিপ্লবী শ্লোগান। এই শ্লোগানই পৃথিবীর সকল জালেম পরাশক্তিগুলোর মধ্যে হৃদকম্পের সৃষ্টি করে। তারা নিজেদের অপমানিত বোধ করতে থাকে। ইরানী জনতা 'মার্গবার আমেরিকা', 'মার্গবার রাশিয়া, 'মার্গবার ইসরাইল', 'মার্গাবার মুনাফেকীন' ইত্যাদি শ্লোগানের মধ্য দিয়ে ইসলামের বিপ্লবী নীতির প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে। এক কথায় ইমাম খোমেনী ইরানবাসীকে তো বটেই সারাবিশ্বের মজলুম মুসলমান ও অন্যান্য জাতিকে শিখিয়েছেন কিভাবে সাম্রাজ্যবাদী লুটেরাদের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হয়। মার্কিনীদের কমান্ডো আর মিসাইল হামলা, চারিদিকে যুদ্ধ, বোমাবাজি, অর্থনৈতিক বয়কট কোন কিছুই তাঁকে ও ইরানী জনগণকে বিন্দুমাত্র ভড়কে দিতে পারেনি এবং প্রতিটি আঘাতকেই তিনি সমান জোরে প্রতিহত করেছেন এবং তা বুমেরাং হয়ে ফিরে গেছে।

ইরানে ইসলামী বিপ্লব বিজয়ের পূর্বে 'ভয়েস অব আমেরিকা' থেকে ফার্সী ভাষায় কোন অনুষ্ঠান প্রচার হতোনা। কিন্তু বিপ্লবের তাৎক্ষণিক পরপরই তারা এ অনুষ্ঠান চালু ও প্রচার শুরু করে। প্রতিদিন প্রচুর সময় ব্যয় করে তারা শুধু বিপ্লবের বিরুদ্ধে বানোয়াট ও কল্পিত তথ্য জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

প্রায় দেড় হাজার মার্কিন সাংবাদিক সি,আই–এর অধীনে বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত, পত্রিকা ও জার্নালগুলো কম করে হলেও প্রতিদিন কয়েক হাজার শব্দ ইরানের বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে, মৌলবাদের কথা বলে প্রচার করে। ইহুদী ও মার্কিনীদের নিয়ন্ত্রিত টিভি নেটওয়ার্ক এবং নিউজ এজেন্সীগুলো প্রতিদিন পঞ্চাশ লক্ষাধিক শব্দ একযোগে ৯০টি দেশে ৭ হাজার গ্রাহকের মাধ্যমে শুধু ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণার অংশ হিসেবে প্রচার করে।

এর ফলে বিভ্রান্ত কমবেশী সবাই হচ্ছে, কিন্তু ইসলামী ইরানের জনগণ বিভ্রান্ত হচ্ছে না বললেই চলে। কারণ একটিই, ইমাম তথ্য সাম্রাজ্যবাদকে পূর্বাহ্নেই চিহ্নিত করেছেন।

এটা সম্ভব হয়েছিলো শত্রু মিত্র চিহ্নিত করার দূরদর্শিতার ফলে, তথ্যেরও সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র আছে এবং একে মোকাবেলা করতে হবে আপোষহীনভাবে, এ সত্য তিনি বুঝিয়ে গেছেন জীবদ্দশায়। সফলভাবে তথ্য সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিহত করার মাধ্যমেই। আজ কেউ স্বীকার করুক আর নাই করুক, এ সত্য প্রতিষ্ঠিত যে, সাম্রাজ্যবাদ আজ চিহ্নিত। তা তথ্যে, কূটনৈতিক তৎপরতা সহ সকল ক্ষেত্রে। আর এর কৃতিত্ব এককভাবে ইমাম খোমেনীরই প্রাপ্য।

The Role of Imam Khomeini (R) in The Resurgence of Real Islam in The Contemporary World

Muhammad Muzahidul Islam

When we talk about "real resurgence of the muslims" we mean a resurgence with real Islamic Spirit; an uprisal throughout the world towards the common goal of true Islamic revolution with a definite and comprehensive course of action. The resurgence must aimed at the victory of the oppressed class against all classes of oppressors of the world. And it was the great Islamic revolution of Iran that brought this spirit in the hearts of billions of muslims all over the world. Following the victory of the Islamic Revolution and the spread of pure Islam in the World. People once again have become acquainted with a different type of thinking and struggle which had been abandoned and enchained for years.[1] The designer and unique guide of this great revolution Late Hazrat Ayatullah Imam Khomeini was not only the leader of the Islamic Iran but also the unanimous leader of muslims of the world. He was the source of hope and aspiration for the oppressed muslims specially the Islamic fighters who are sacrificing their best for the great cause of upholding the banner of Islam in every corner of the world. In the words of W. Carlsen, an American writer and journalist :

> "Khomeine was the powerful; Khomeini was that strong; Khomeini was that egoless and invincible. ..... He was the source of revival of Islam, he was the source of the revolution. He was the source of whatever power this revolution and Islam represented to the world. Without

Writer : Assistant Professor Department of Finance And Banking, Dhaka University And Essaist

him, I am certain, that monarchy would still be in place and Islam would be effectively eliminated as a factor in the political destiny of the middle East."[2]

Just after the second world war in the middle of this century there was a great resurgence among the muslims all over the world. But, unfortunately, the world muslims at that time were in the crisis of leadership. As a result, the struggle and sacrifice which could have been sufficient to bring a revolutionary change in the muslim community as a whole, ultimately ended in the establishment of a number of muslim nation state. The emergence of this nation states could be termed as the first revolution of Islamic world and hence, a second revolution was inevitable. But with the passage of time the second revolution was proving more and more difficult to be accomplished than the first one. Some common misgivings within the muslims about the understanding of Islam and Islamic movement together with some external factors make this situation so worsen and hopeless. And the necessity of a great leader like Hazrat Imam Khomeini was felt very badly. He came with an extra ordinary personality, full of wisdom and uncommon political sagacity to rescue the drowning muslim ummah. He was a living inspiration to all for his simple but morally decorated pattern of living and high ranking of spiritual hierarchy. Those given the awareness or filling to know what he represented could not help but be filled with the fervour of Islam, the blessed confidence of martyrdom, the determination to spread Islam to the world. He uplifted and transformed; this was done not through some projected idea of his charisma; it was done by the actual marterial of life. In the worlds of Carlsen,

"Khomeini was at the centre of this Islamic eruption; Khomeini was the fountain head of the spiritual power that flowed into the hearts of muslims throughout the Middle-East at least those muslims who instinctively were close to the heart of Islam."[3]

were close to the heart of Islam."[3]

Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini was the unique successor of Sayed Jamaluddin Afghani, Mufti Sheikh Mohammad Abdhuhoo, Sheikh Abdur Rahman Kowa Kebi and Allamah Iqbal. His diagnosis about the real disease of the ummah and the prescription thereof was almost similar to his great predecessors. For example Allamah Jamaluddin Afghani detected the causes behind the decrepitude among the muslims as follows :

(1) Autocratic regime throughout the muslim world.

(2) Fanaticism based on ignorance and backwardness in the field of science and civilization.

(3) Retreat of the muslims from the real Islam and spread of anti-Islamic ideology.

(4) Differences and divisions among the muslims about Islam and secularism.

(5) The imperialist rule of the west.[4]

Hazrat Imam Khomeini recognised all these issues and some other issues as the real problem of the muslim ummah and prescribed a number of remedial measures so that they can overcome those problems and emerge as an unbeatable force of the world.

Imam and Muslim Unity

The Imam stressed on the unity of the muslims, According to him the muslims should be united and not think of themselves as being separated from each other. They should not think that borders are means to separate them. Muslim possesses great power when their hearts are together. The enemies of Islam and the muslims believe that they can continue their domination, aggression and exploitation of the resources of the Islamic countries under the banner of the disunity of the muslim nations and governments. They have always attempted to bring about crisis to keep them separate since it is natural that when

nations and governments are devided they can be weakened and dominating them will become easy.[5]

Imam And Shia-Sunni conflict

It was a great success of the Imam that he could minimise the Shia-Sunni conflict. In this case again he followed his predecessor Sayed Jamal Uddin Afghani who being a sunni revolutionary reformer was educated in Iran and tried his best to reduce the historical distance between Shia and Sunni. He proved this not only through writings and speeches but also through his course of action and behaviour. He got the credit of solving the Qurdi issue created by the imperialist power on the foundation of the Shia-Sunni conflict. Rights and previlages of the Sunnies were protected in the constitution of the Islamic Republic of Iran. Imam showed unbelievable respect to the sunni ulemas meeting him from all over the world as a state guest of Iran. For example, Imam performed his salat under the leadership of late Hazrat Hafezzi Huzur of Bangladesh during his visit to Islamic Iran. This broad out-look of the Imam brought him nearer to the hearts of millions of Sunni Muslim through out the world.

Imam and the Self Confidence of the Ummah

Before the victory of the Islamic revolution of Iran muslims all over the world were suffering from lack of confidence. They were mentally depressed and defeated by the beauty and glamour of the western civilization. There was least confidence remained to stand on their own feet and fight against the enemies of Islam. In fact the muslim countries were being dominated by the imperialist both economically and culturally.

Some of them were in the pocket of America while the others in the pocket of Russia. Clearly there was a mutual understanding between the then supper powers to rule and demolish the muslims by slow poisoning. Imam Khomeini for the first time declared the total negation of any kind of affiliation to both Eastern and Western blocks including

politico-economic-military and cultural affiliations. And undoubtedly, a country can achieve independence only by following these policy of non-alignment. In the words of Imam :

> "According to Islam no one should dominate you, you should not be dominated by others. We say that America should not exist as a power and the same is the case with Russia and other aliens."

The Imam believed that the fulfilment of this principle is only possible when they are united. In this regard he stated :

> "We can stand in front of the world and can say that we will neither deviate towards the east nor towards the west and that we follow the straight path, provided that we are united."

This principle is based on the teaching of the Holy Qur'an according to which any kind of domination of the unbelievers over the muslims is negated.

Identification of enemies—A great contribution of the Imam

To my observation Imam Khomeini was the first to identify the right friend and foe of the common muslims. Before him Russia and communism as considered as the number one enemy of Islam and muslims. In some countries America and capitalism was considered as second to fight against. Quite surprisingly in some leading muslim countries specially in those Middle Eastern muslim countries ruled by monarch America was treated as friend or at least harmless. Imam Khomeini for the first time declared America as great 'Satan' and ranked her at the top of the enemies of Islam and muslims. Before the revolution of Islamic Iran the world muslims knew least about the conspiracy of the USA. Even some of the Islamic movements of the world were so confused that when hundreds of true revolutionary muslims were shot dead in 1981 within and outside the Holy Qaba by king Khaled the Islamic movement in the subcontinent staged huge demonstration in favour of King Khaled and identified

the incidence as the attack on Holy Qaba. In fact, this was a planned conspiracy, by CIA against the Islamic revolutionarist of Saudi Arabia to long live the Kingship.

The anti-imperialist role played by the Islamic republic of Iran and its late revolutionary leader Ayatullah Khomeini changed the political picture of the world specially the third world countries. In a condolence message professor Eric Hoglen of John Hopkins University, USA, worte,

> "Imam Khomeine confronted the US and the West and enjoyed great influence in the third world, specially in Africa, Asia and Latin America."

Basic Change in the pattern of Leadership

Leadership is a vital issue in connection with the resurgence of a nation. Before Hazrat Imam Khomeini emerged with his colourful personality and charisma image, there was a crisis in the field of leadership of the muslim world. The lack of Charisma personalities was compelling the Islamic movements to think about plural leadership of the western pattern. Again, the leadership of most of the Islamic movements was being captured by the scholars having secular educational background. The religious leaders were being by-passed partly because of their own incompetancy and partly because of the western influence on several Islamic movements. Undoubtedly, Zihad is the question of life and death, And certainly, a call from an accepted religious leader to participate in Zihad is more influencial than a call from a secular educated Islamic leader. But unfortunately this truth was being overlooked by the leading Islamic movements specially in Sunni World. Two leading Islamic movement named Jamat-e-Islami in the sub continent and Ekhawanul Muslemin in the middle east had the same experience, that is both the movement had a long experiment to make some mokah having their foundation on secular education : Experiences show that this experiment failed. On the other hand Imam Khomeine has an experiment to insert the thoughts and knowledge of modern sociology, economics

science and technology in minds of arthodox relogious talents and thereby make them most effective and influencial leaders of the Ummah. This experiment has been proved successful. Once neglected turbaned heeds are now respected by all After the successful revolution, in Iran under the spiritual leadership of Imam Khomeini and his companions a change has been initiated in the leadership pattern of the muslim world. Religious leaders who had a common trend to maintain a moderate distance from all sorts of political activities.

The issue of Palestine and AL-Quds in Imam's View

The issue of Palestine was one in which the late leader of the Islamic revolution Imam Khomeini's very soul was involved in and he paid a lot of attention to this matter. The Imam invited the Islamic Ummah to boycott Israel as well as her guardian America and to intensify the struggle against them until the very liberation of the occupied lands and the Holy Quds from the Zionists. Imam repeatedly called on muslims to come and aid of their brothers in the occupied lands. He stressed that the future battle in the region would not be limited to the war between Arab nationalism and international Zionism and the retaking of occupied lands. In fact, he said, the most important and crucial battle would be between Zionism and the enemies of Islam against the Islamic Ummah. From this perspective the Imam issued various famous fatwas to alert the muslim to prepare themselves for the incoming Holy war. Imam says,

> "If there been any fair that foreign forces are attempting to dominate muslims politically and economically through their political relations with Islamic countries, muslims are duty bounds to declare their enmity and hostility by any means possible against them and force the Islamic Governments to severe these relations."

Imam further said,

> "It is not permissible to establish political or trade relations with certain countries which are puppets of

colonialism, such as Israel. Muslims are duty bounds to protest against such relations in any way possible. Those merchants who have dealings with Israel or its mercenaries are traitors to Islam and muslims and are means for the destruction of Islam."

In fact it was Imam Khomeini who inserted life to the apparently dead issue of Al-Quds. He brought into light the almost forgotten painful history of Palestine brothers. Imam Khomine taught the world that the striving and struggle against zionism is in fact a war between truth and falsehood and that the Palestenian aspiration is an Islamic issue of comprehensive dimension, not merely a regional issue.

Imam Khomeini declared the "day of Quds" on the last friday of Ramadan. The day is observed every year throughout the world in a befitting manner, Imam also discarded any sort of negotiation with Israel and its collaborators. He rightly concluded that Zihad is the only solution of the issue of Palestine and Al-Quds.

Imam and the issue of Satanic Verses

Imam Khomeini got the top of his popularity when he issued the historic decree sentencing Salman Rushdi to death. The desire of the muslims of the world was reflected in his decree. There was none except Imam Khomeine to do this Islamic duty. Even the ulemas of the middle eastern countries were hesitating to give any fatwa rather talking in a soft and mild tone. The great Imam alone sounded his mighty voice and declared Salman Rushdi as "Murtad" and appeal to the brave muslims to kill him where and whenever he is found. This fatwa brought and unbelievable impact both in muslim and secular world. To muslims the fatwa was a source of inspiration and self confidence and resurgence. On the other hand the whole secular world felt theratened and worried over the matter.

Imam's message to Gorbachev

Imam Khomeine emerged as a guardian of world leaders when he wrote a letter ot Michael Gorbachev, inviting him to

accept Islam. In his message Imam predicted the fall of communism. Imam's prophecy proved true within a short time. It was a miracle which again was in indication of his deep farsightedness and intution. Imam urged Gorbachev not to go back to the hell of capitalism. This letter was an uncommonn as well as brave call from a turbaned spiritual leader to a mighty ruller of the 2nd super power of the world. This letter again increased the popularity of the Imam. It seemed to be a reflection of the prehistoric event when Allah send Hazrat Musa to Pharoh, the top leader of that time.

Conclusion

All these issues had a great impact on muslims and the oppressed of the world. The existing struggle against oppressors got new life while new struggle in different parts of the world initiated following the Islamic revolution of Iran. It is for this reason one of the strategists of Brookland's Research centre in the US in this regard.

> "In all the Islamic movements, the foot prints of the Islamic revolution of Iran can be seen in one way or another, which must be researched."[9]

In fact the loud echo of the global Islamic revolution in countries following the principles of Islamic revolution designed by its great leader Imam Khomeini, for a long time, warned of danger in the western mass media. For example, "The Christian Science Monitor," a US daily, in a recent report disclosed the deep concern of the political and press circle of the US over the influence of the Islamic revolution of two great countries of African continent, i.e. Sudan and Egypt. According to the political analysts of this newspaper Iran's influence over Sudan is a great peril which can endenger and shake the foundations of the neighbouring Arab governments' rule and cause instability in Africa. According to the Monitor, Iran's presence in Sudan will affect the US backed govt. in Egypt as well. It further writes,

"the Islamic revolution of Iran is communicating a very

powerful message to the Islamic groups; that is, if the Muslims in Iran have been able to defeat a powerful ruler such as the ex-shah, other believing groups can also do so in their countries."[10]

Inclination towards Islam is not limited to the Middel East or Africa, but such an inclination exists in much of the world, with the growth of Islam in neighbouring regions of the Western civilization centre in Europe, such as Algeria, Tunisia, or Morocco in the south or Turkey or newly independent republics of central Asia and Easter Europe, the west feels more insecure than ever.

Political newspaper published in Bulgeria, in this regard emphasises that with the collapse of the base of the socialist countries, the Islamic movements have spread in the world. World capitalism in order to exploit more countries cruelly violates moral regulations and national customs. In this direction, Islam, with developed values, is able to save the society from the danger of decline, injustice and oppression. This newspaper further believes that the victory of Islamic movements in Tunisia and Moroccos will take place in near future and that Pakistan, Afhganistan, Palestine and Turkey are the future travellers of this caravan of Islamic movement. The new 'Intifada' movement in the occupied Palestine, the blood sheding fighting in Kashmir, and the fighting in Azarbaizan and the saddest massacre of the recent history in Bosnia to demolish their Islamic identity and great fight back from Bosnian Muslims—all are the outcome of the victory of Islam in Iran led by Imam Khomeini. The victory of the muzahideen in Afhganistan against the Red imperialist is a direct handling of the leader of the Islamic revolution of Iran.

The renewal of the Islamic identity of the Muslims and the proof of Islam's ability to administer the societies, has led to self-confidence among the Muslims of the world and it is recognized by all authorities now.

In fine, we like to note the impression of a muslim

journalist from Switzerland, Ahmed Huber, who believe that Imam Khomeini (R.A.) has made the muslims political, i.e. he has spread a political way of thinking among the muslims. The Muslims understand that Islam, the Quran, and the traditions of the prophet (S.A.W.) are powerful sources which can bring about changes in various political, cultural and economic fields.

References :

1. Islam in Western Europe and America, Echo of Islam No. 87, Sept. 1991.
2. Robin Woodsworth Carlsen, Imam Khomeini, As I saw Him, Cultural Centre of the Islamic Republic of Iran, 1983, pp. 21-22.
3. Robin Woodsworth Carlsen, Op. cit., pp. 22.
4. Shahid Ayatullah Mortuza Mutahari, Islamic Movement of this Century, Hizbullah publication, Dhaka.
5. Imam and the foreign policy of the Islamic Government Echo of Islam.
6. Imam and the foreign policy of the Islamic Government, Jamil Kadivar, Echo of Islam, No. 86, July 1991, pp. 29.
7. Imam Khomeini in the words of world personalities, Echo of Islam, No. 86, July 1991, p. 33.
8. Palestine in Imam Khomeinies view, Echo of Islam, No. 87, Sept. 1991.
9. Islam's Status in International Relations, Echo of Islam, No. 87, Sept. 1991.
10. Islam's Status in International Relations, Op. cit Sept. 1991.
11. Islam's Status in International Relations, Op. cit, Sept. 1991.

ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ভোট দিচ্ছেন ইমাম

ইমাম খোমেনী ঃ একজন নির্ভরযোগ্য অভিভাবক

অধ্যাপক ওয়াসেক বিল্লাহ্

ইরানের ইসলামী বিপ্লবের অবিসংবাদিত নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ্ আল-মুসাভী আল-খোমেনী ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে ২২৫ কিঃ মিঃ দক্ষিণে ছোট্ট শহর 'খোমেইন' এ ১৯০১ সালের ২৩ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। ইমামের পিতা-সাইয়্যেদ মুস্তফা মুসাভী ছিলেন সে আমলের ইরাক ও ইরানের মধ্যে একজন বিশিষ্ট আলেম ও মুজতাহিদ। ইমামের পিতামহের নাম সাইয়্যেদ আহমদ-ই-হিন্দী (ভারতীয় বিখ্যাত সাইয়্যেদ আহমদ) এবং প্রপিতামহের নাম সাইয়্যেদ দ্বীন আলী শাহ কাশ্মীরী। ইমামের মাতামহের নাম আয়াতুল্লাহ মির্জা আহমদ, একজন সুবিখ্যাত ধর্মশাস্ত্রবিদ। ইমামের এ সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা দ্বারাই অনুমিত হয় যে, যুগ যুগ ধরে ভারত, ইরাক, ইরানে যে সকল ধর্মতত্ত্ববিদগণ ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে নিজ নিজ ভূমিকায় উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত ভাস্বর হয়ে আছেন তাঁদেরই যোগ্যতম উত্তরসূরী হলেন ইমাম খোমেনী (রঃ)।

শৈশব থেকেই ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। তাঁর শিক্ষা জীবনের শুরু হয় একজন উপযুক্ত শিক্ষকের নিজ গৃহে। মাত্র সাত বৎসর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কোরআন পড়া শেষ করেন। এরপর শুরু হয় তাঁর অন্যান্য বিষয়ের পাঠ। তৎকালীন ইরাক ও ইরানের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষকদের বিশেষ যত্নে বিকশিত হয়ে উঠে তাঁর বিভিন্নমুখী প্রতিভা। জীবনের প্রথম ২৭টি বৎসর তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর উচ্চতর ডিগ্রীলাভ করে এক প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। যে সব বিষয়ে তিনি বুৎপত্তি অর্জন করেন সেগুলো হলো-ধর্মতত্ত্ব, ইসলামী আইন, হাদীস ও তফসীর শাস্ত্র, রহস্য বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, দর্শন ইত্যাদি। তাঁর সম্মানিত শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন হাজী মির্জা রেজা নাজাফী, শায়খ আব্দুল করিম হায়েরী, শেখ মুহাম্মদ গুলপায়েগানী, মরহুম আব্বাস আরাকী, হাজী সাইয়্যেদ মুহাম্মদ তাকি খুনসারি, সাইয়্যেদ আলী ইয়াসরিবি কাশানী, মির্জা মুহাম্মদ আলী শাহাবাদী, ইমাম আয়াতুল্লাহ বুরুজারদী প্রভৃতির মত যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, দার্শনিক ও মুজতাহিদগণ।

১৩৪৭ হিজরীতে তিনি একজন দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক হিসাবে কোমে অধ্যাপনা

লেখক ঃ অধ্যাপক, নাসিরাবাদ কলেজ, মোমেনশাহী

শুরু করেন। ছাত্রদের উপকারার্থে তিনি নিজ বিষয় ছাড়াও নীতিশাস্ত্র, আত্মিক জ্ঞান এমনকি রহস্য বিজ্ঞানের উপরেও পৃথক ক্লাশ আরম্ভ করেন। তাঁর এ সকল ক্লাশ তৎকালীন সময়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে, অচিরেই তা বিশ্বাসঘাতক শাসক চক্রের রোষানলের শিকার হয়। কারণ ইমামের পাঠদানের মধ্যেই নিহিত ছিল ইরানের শোষিত বঞ্চিত মানুষের মুক্তির হাতছানি। ইরানের স্বৈরাচারী সম্রাট রেজা শাহ এটাকে বরদাশত করতে পারেননি। শাহের হুমকীর মুখেও ইমামের পাঠদান অব্যাহত থাকে। ১৩৬৪ হিজরীতে ইমাম গবেষণা পর্যায়ের উচ্চতর ক্লাশগুলোতে ঐতিহ্য বিজ্ঞান, ফিকাহ্ ও উসূলে ফিকাহর উপর পাঠদান শুরু করেন।

ইমাম খোমেনী (রঃ)-এর এ অধ্যাপনা জীবনে ইরাক-ইরানের আলেম সমাজ একটি নূতন দিক-নির্দেশনা লাভ করে। ইমাম এ দীর্ঘ সময়ে তার অনুসারী, ছাত্র, সমকালীন শিক্ষক ও ধর্মতত্ত্ববিদদেরকে হযরত ইমাম মেহদী(আঃ)র আত্ম প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত আলেম ও মুজতাহিদ সমাজের ভূমিকা কি হওয়া প্রয়োজন তা বুঝাতে চেষ্টা করেন। ঈমানী চেতনার রাজ্যে এরূপ বিপ্লব সৃষ্টির ঘটনা নিতান্তই বিরল। যুগ-যুগান্তের পরিবর্তনের ধারায় এবং পাশ্চাত্য প্রীতি ও অনুকরণের সয়লাবে যখন ইরানী মুসলমানগণ ধর্মহীনতার সাগরে প্রায় নিমজ্জমান, যখন তথাকার আলেম সমাজ ব্যক্তিগত ঈমান রক্ষার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ঠিক সে সময়ে তাদের কর্তব্যবোধকে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে ইমাম খোমেনীর ভূমিকা এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। ইমাম খোমেনী ইরানের আলেম সমাজ ও ছাত্রদেরকে বিপ্লবী চেতনায় জাগ্রত করার জন্য যে কর্মসূচী নিয়েছিলেন তাই ছিল তৎকালীন মার্কিন সেবাদাস রাজতন্ত্রের কুখ্যাত বিশ্বাসঘাতক শাহের মাথাব্যথার অন্যতম কারণ। শাহ জানতো যে, ইমামের শিক্ষা ও বক্তৃতা ক্রমাগত মানুষের মোহমুক্তি ঘটাচ্ছে। একসময় এ মোহাবিষ্ট মানুষগুলোই তার বিরুদ্ধে প্রলয়কান্ড ঘটিয়ে বসবে। তাই ইমামকে শুরুতেই স্তব্ধ করে দিতে সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ইমাম নির্বাসিত হন ইরাকের নাযাফে। কিন্তু শাহ্ বুঝতে পারেনি যে এক ইমামের নির্বাসনে তাঁর মিশন বন্ধ করা যাবে না। ইমাম ইতোমধ্যেই তৈরী করে ফেলেছিলেন অসংখ্য জ্ঞানীগুনী, ছাত্র, শিক্ষক এবং ইসলামের নিশান বরদার। স্বৈরাচারী শাহ সরকার ইমামসহ এই ইসলামী নেতৃবৃন্দকে কারাগারে বন্দী বা নির্বাসিত করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তার বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্রে ফয়জিয়া মাদ্রাসায় বার বার হামলা করে মাদ্রাসার ছাত্র, শিক্ষক সমর্থকদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে চেষ্টা করে। শাহ্ তার 'সাভাক' নামক গুপ্ত পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে দেশের সকল জায়গায় ইমামের অনুসারীদেরকে হত্যা, গুম, কারাগারে প্রেরণ ও ১৯৬৩ সালের ২২ মার্চ শাহ সরকারের অত্যাচারের একটি নিকৃষ্ট দিন। সেদিন তার নির্দেশে ফয়জিয়া মাদ্রাসায় শাহের খুনী বাহিনী ইমামের বক্তৃতা শ্রবণের জন্য আগত হাজার হাজার জনতার উপর

বিনা উস্কানিতে নির্বিচারে মেশিনগানের গুলিবর্ষণ করে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে। সভ্যতার ইতিহাসে শাহের এ পৈশাচিকতা এক কলংকময় অধ্যায় হিসাবে সংযোজিত হয়ে আছে। এরপরেও ইমাম তাঁর অনুসারীদেরকে ধৈর্যের সাথে তাঁর মিশনকে এগিয়ে নিবার আহবান জানান।

সরকারের পক্ষ থেকে নিরস্ত্র জনতার উপর এরূপ নির্মম গুলিবর্ষণের ঘটনা গোটা জাতির তন্ত্রীতে এক অভাবনীয় ঝংকার তুলে। এ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে দেশজুড়ে প্রতিবাদ মিছিল, শোক মিছিল ও শোক সমাবেশ হতে থাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে শাহ্ বেসামাল হয়ে পড়েন। ইমামকে কারাবন্দী করা হয়। এতে গোটা ইরান যেন ক্ষোভে ফেটে পড়ে। পরের ঘটনা আরো করুণ আরো নির্মম। দেশের বড় বড় শহরগুলোতে এর প্রতিবাদে লাখো জনতার ঢল নামে। তাদের শ্লোগান ছিল 'হয় খোমেনী না হয় মৃত্যু'। শহরের অধিকাংশ স্কুল-কলেজ, দোকান পাট বন্ধ হয়ে যায়। শাহ দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। কিন্তু তাতেও জনতার প্রতিবাদী মিছিল বন্ধ করতে না পেরে শাহের সৈন্যরা মুক্তিকামী জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এসব নরঘাতকের হাতে ৫ জুন ১৯৬৩ ইং তারিখে তেহরানে ১৫০০, কোমে ৪০০ নিরস্ত্র জনতা শাহাদত বরণ করে। এতবড় পৈশাচিক নির্যাতনকে শাহ্ চাপা দিতে পারেনি। বিশ্বের দরবারে এ সংবাদ সবিস্তারে প্রকাশিত হয়।

এ গণঅভ্যুত্থানের চাপ সামলাতে না পেরে শাহ্ ইমামকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন। কিন্তু ১৯৬৪ সালের ৪ নভেম্বর পুনরায় গ্রেফতার করে তুরস্কে নির্বাসন দেন। ১৯৬৫ সালে ইমামকে তুরস্ক থেকে ইরাকের নাজাফে স্থানান্তর করা হয়। ইমাম দেশ থেকে বিতাড়িত নির্বাসিত ঠিকই কিন্তু তাতেই কি আন্দোলন থেমে গেছে? সারা দেশে ইমামের এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার অনুসারী আলেম ইমামের নির্দেশ ও মিশন নিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যান। ইতোমধ্যে শাহ্ তার নির্যাতনের সম্ভাব্য সকল পথ ও কূটকৌশল অনুসরণ করে মুক্তিপাগল জনতাকে ঠেকাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সবই বিফল হয়ে যায়। নির্বাসিত ইমামের নির্দেশ সম্বলিত ক্যাসেট জনতাকে আরো উদ্দীপ্ত করে তোলে। শত সহস্র মানুষ স্বেচ্ছায় শাহের সৈন্যদের গুলিতে শাহাদত বরণ করতে থাকে। জনতা শাহের সকল নির্দেশ, অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। এরপর আসে ১৯৭৮ সনের ৮ সেপ্টেম্বরের সেই কৃষ্ণ শুক্রবার। এদিন ছিল ৯ মুহররম। তেহরানের রাজপথে সেদিন লাখো জনতার ঢল নামে। গোটা রাজধানীকে শাহ্‌বিরোধী শ্লোগানে প্রকম্পিত করে তারা সমবেত হয় জালেহ্ ময়দানে। অতর্কিতে শাহের নরঘাতক বাহিনী নিরস্ত্র জনতার উপর হেলিকপ্টার গানশিপ থেকে বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ করতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যেই রক্তের সাগরে ভরে উঠে ময়দান। পাঁচ হাজার নিরপরাধ মানুষ শাহাদতের অমিয় পানে ঢলে পড়েন ময়দানে। হাজার হাজার আহতরা কাতরাতে থাকে।

সভ্যতার ইতিহাসে সংঘটিত এ ধরনের নির্লজ্জ ও পৈশাচিক ঘটনা বিরল কিন্তু তারপরেও জনতাকে থামানো যায়নি। শাহের অন্যায়ভাবে দখলকৃত সিংহাসনটি উল্টে দিতে বদ্ধপরিকর ইরানের আবাল-বৃদ্ধবনিতার অপরিসীম ত্যাগ আর রক্তের কাছে শেষে শাহ্ হার মানতে বাধ্য হন। ১৬ জানুয়ারী ১৯৭৯ শাহ্ তার পরিবার-পরিজন নিয়ে দেশত্যাগ করেন। তখনো মার্কিন পদলেহী শাপুর বখতিয়ারের সরকার ক্ষমতায়। ইমাম দেশে ফিরার সিদ্ধান্ত নেন। বখতিয়ার সরকারের সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ সালে ইমাম দেশের মাটিতে পা রাখেন। উল্লসিত লাখো কোটি জনতার পায়ের নীচেই চাপা পড়ে যায় শাহ্ ও তার বংশ পরম্পরার রাজতন্ত্র। বখতিয়ার সরকার খড়কুটোর মত ভেসে যায়। অগণিত শহীদের রক্তে স্নান করে ইমামের নেতৃত্বে গড়ে উঠে ইসলামী প্রজাতন্ত্র।

দর্শনগত দিক থেকে ইমাম

ইমাম খোমেনী (রঃ) এর জীবন ও কর্ম বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তিনি শৈশব থেকেই পারিবারিক ঐতিহ্যে লালিত এমন একটি দর্শনের অনুসারী হয়ে বড় হয়েছেন যা তাঁকে শেষ পর্যন্ত একটি সফল পরিসমাপ্তি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

ইমামের পূর্ব পুরুষগণ প্রায় সকলেই ইসলামী দর্শনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ভাগ্যক্রমে তিনি যে সকল শিক্ষকের নিকট বিভিন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন তাঁরাও সকলেই ছিলেন ঐ একই দর্শনের অনুসারী। মহান আল্লাহ এ পৃথিবীতে কেবলমাত্র তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যই মানুষ পাঠিয়েছেন। কিন্তু যুগে যুগে মানুষ এ সত্যটি ভুলে গিয়ে প্রবৃত্তির দাসত্ব করেছে ও চিরস্থায়ী ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে। পথভ্রষ্ট এ মানুষগুলোকে আবার সুপথে পরিচালিত করার জন্য যুগে যুগে নবী রাসূলদের আগমন ঘটে। এমনিভাবে শেষ নবী মুহাম্মদ (দঃ) এর আগমন নির্গমন সমাপ্ত হয়েছে। অতঃপর আর কোন নবী আসবেন না। খোলাফায়ে রাশেদীনের সোনালী যুগের পর থেকে ক্রমান্বয়ে পৃথিবী তাগুতী শক্তির হাতে চলে গেছে। সীমাহীন মূর্খতায় বিশ্বব্যাপী মুসলিম সম্প্রদায় নিমজ্জিত হয়ে গেছে। মুসলিম নেতৃত্ব খোদাদ্রোহী শক্তির কাছে মাথা নত করেছে। বিশ্ব জুড়ে সীমাহীন দুর্নীতি, অত্যাচার, অবিচার, শোষণ-বঞ্চনা ও অশান্তির সয়লাব। এমতাবস্থায় প্রিয় নবী (সাঃ) এর ওয়ারিশ আলেম সমাজই আবার সোচ্চার হয়ে এ পাপরাজ্য থেকে মানুষকে শান্তির পথ ও সফলতার পথ নির্দেশ করতে পারেন।

ইমাম খোমেনী (রঃ) রাসূলের ওয়ারিশ হিসেবে যথাযথ দায়িত্ব পালনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তিনি এক্ষেত্রে নিজস্ব কোন নূতন দর্শনের জন্ম দেননি। বরং মুহাম্মদ (সাঃ) এর আনীত দর্শন, যা চিরকল্যাণময় এবং মানব জাতির সফলতার পথ প্রদর্শক।

তার আলোকে ইমাম যুগোপযোগী যে সকল পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছেন তা-ই হলো ইমামের দর্শন। ইমাম খোমেনী মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন "ধর্মই হচ্ছে বিপ্লবের প্রকৃত স্রষ্টা।" সময়ের প্রেক্ষাপটে তিনি আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং আর্থ-সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধানের মাধ্যমে দেশে শান্তি স্থাপন করতে চাইলেন। তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেন যে, সাম্রাজ্যবাদের অদৃশ্য কালো থাবা এবং দূরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনার মূলোৎপাটন করতে হলে জনগণকে পুঁজিবাদ, জালেম, শোষক ও শয়তানী শক্তির কুটিল চক্রান্ত সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। এ উদ্দেশ্যেই তিনি ১৯৪১ সালে 'কাশ্‌ফ-আল-আসরার' গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে তৎকালীন জুলুম শাহী সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি লিখেন "একমাত্র ধর্মই মানুষকে বিশ্বাসঘাতকতা ও অপরাধের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ যারা ইরানের রাষ্ট্রীয় কর্ণধার, তারা মেকী ধর্মে বিশ্বাস করেন অথবা তাদের আদৌ কোন ধর্ম বিশ্বাস নেই। এ কথা বলা চলে যে, যে সব নেতৃবৃন্দ দেশের স্বার্থে কথা বলেন, বাস্তবে তারা নিজেদের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। যারা নির্বাচনের পূর্বে টাকা ঢালেন, তারা নির্বাচনের পর বেশী উপার্জনের প্রত্যাশা করেন।"

ইমাম অনুভব করেন যে, প্রিয় নবীর অনুসৃত পদ্ধতিই সফলতার একমাত্র পথ। প্রিয় নবী চরম অত্যাচারিত হয়েও যেমন বলেছিলেন, "আল্লাহুম্মা এহ্‌দী কাওমী ফা-ইন্নাহুম লা-ইয়ালামুন"-'হে প্রভু আমার কওমকে হেদায়েত দাও। তারা বুঝে না, জানে না।" ইমাম সে দর্শনেই উদ্বুদ্ধ হয়ে জনতাকে সচেতন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি প্রিয় নবী (দঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এমন একটি দুর্বার সত্যের সৈনিক বাহিনী গড়ে তুলেন, যারা সত্যের প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যার বিতাড়নে জীবন বাজী রেখে পথ চলতে সদা প্রস্তুত ছিল।

ইমাম খোমেনীর মতে, রাজতন্ত্র একটি অবৈধ শাসন ব্যবস্থা। কারণ রাজতন্ত্র চলে যুগ যুগ ধরে। এখানে জনগণের ইচ্ছার কোন মূল্যায়নের সুযোগ থাকে না। এটা হতে পারে না। ইমাম বলেন, "ইরানের রাজতন্ত্রের বয়স শত বৎসরের বেশী হয়েছে। রাজতন্ত্রের পত্তনকালে তৎকালীন জনগণ সে আমলের সরকারকে নির্বাচিত করলেও এবং তখন তা বৈধ থাকলেও বর্তমান কালের জন্য তা কোনক্রমেই বৈধ হতে পারে না। কারণ আজ শতবর্ষ পূর্বের মানুষ আমাদের শাসন ঠিক করে দিতে পারেন না। যেমন আমরা পারি না শতবর্ষ পরের শাসক নির্বাচন করতে। প্রত্যেক যুগের শাসক নির্বাচিত করার অধিকার সে যুগের মানুষেরই। কাজেই পূর্বেকার নির্বাচনের ধুঁয়া তুলে রাজ সিংহাসন দখল করা সম্পূর্ণ অবৈধ।"

দার্শনিক ইমাম বিশ্বাস করতেন যে, কোন খোদাদ্রোহী, মুনাফেক বা ধর্মহীন ব্যক্তিত্ব কখনই মুসলিম উম্মাহর বৈধ শাসক হতে পারে না। কারণ মুসলমানদের

পার্থিব সকল কার্যাবলী আখেরাতের সফলতার আলোকে পরিচালিত হবে। এখানে তথাকথিত মেকী সভ্যতা বা সংস্কৃতির কোন মূল্য নেই। কাজেই মুসলমানদের দুনিয়ার সকল কাজে আল্লাহর হুকুম এবং নবী (দঃ)–এর আদর্শের বাহিরে চলার কোনই পথ নাই। এমতাবস্থায় মুসলমানের কোরান–হাদীসের আলোকে পথ চলার দিশারী হলেন দেশের সত্যিকার আলেম সমাজ। আর এ জন্যই রাষ্ট্রীয় বিধান রচনা ও পরিচালনার দায়িত্বও আলেম সমাজেরই। ইমাম তাঁর এ দর্শনকেই 'বেলায়েতে ফকিহ' নামে প্রকাশ করে ইরানের আলেম সমাজকে জাগ্রত করেছেন। তিনি বলেন, "রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার এ চিন্তা তাঁর নিজের কোন সৃষ্টি নয়। স্বয়ং রাসূল (সাঃ) আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর মনোনীত বিধানকে বাস্তবে রূপায়িত করে এর আদর্শিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর মুসলিম উম্মাহ্ তথা বিশ্ববাসীকে অন্ধকারে ফেলে দুনিয়া থেকে বিদায় নেননি। বরং হুকুমতে ইলাহিয়াকে সুদৃঢ় করার জন্য খোলাফায়ে রাশেদীনের সোনালী যুগের সূচনা করে দিয়ে গেছেন। এ ব্যবস্থা বরাবরই একটি ঐশী ব্যবস্থা। কাজেই এ ঐশীব্যবস্থার সাথে কোনক্রমেই কোন জালেম, লম্পট, মিথ্যাচারী, দুর্নীতিপরায়ণ শাসকের কোনই সম্পর্ক থাকতে পারে না। যদিও মুসলিম বিশ্বের বেশীরভাগ শাসকই ঐ প্রকৃতির ও স্বার্থপর এবং দুনিয়াদার।" আল্লাহর আইনে ঐ সব শাসকের শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং তাদের মনগড়া আইনের প্রতি আনুগত্য করা কোন মুসলমানের উপরই জরুরী নয়।

ইমামের ইসলামী বিপ্লবের দার্শনিক ভিত্তি হলো আল কোরআনের সেই নির্দেশ, "হে বিশ্বাসীগণ তোমরা ইহুদী–নাসারাদেরকে বন্ধু বলে মনে করো না, (কারণ) তারা তো পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ঐরূপ ব্যক্তিদেরকে হেদায়েত প্রদান করেন না। যারা নিজেদের প্রতি অন্যায়কারী। (সূরা মায়েদা–আয়াত ৪০)।

ইমাম তার কৈশোর থেকেই দেখেছেন ইরানের ক্ষমতাসীন সরকারগুলোর ইহুদী–নাসারাদের সাথে সখ্যতার পরিমাণ কত। দেশের অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাজনীতি সবই পাশ্চাত্যের নির্দেশিত পথেই পরিচালিত হয়েছে। এ সখ্যতার কারণেই শাহ সরকার ইরানের তেলসম্পদসহ অর্থনীতির মূল চাবিকাঠি মার্কিনীদের হাতে তুলে দিয়েছেন। দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেশকে পরনির্ভরশীল করেছে, ইহুদী ইসরাইলের সাথে সখ্যতার কারণে মার্কিন ও ইসরাইলী সামরিক উপদেষ্টাদের হাতে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ন্যস্ত করেছে। বিনিময়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার নামে দেশে সীমাহীন দুর্নীতি, বেহায়াপনা, নগ্নতা, নৈতিকতাহীনতাসহ সব ধরনের ধ্বংসাত্মক উপকরণ আমদানী করেছে।

ইমাম বুঝেছিলেন, কোরআনের নির্দেশই একমাত্র ধ্রুব সত্য। এর বাইরে ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নেই। কাজেই তিনি জাতিকে সুনিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্যই তাগুতী শক্তির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে স্বাধীনভাবে বাঁচার সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। যদিও এ সংগ্রামে হাজার হাজার তাজা প্রাণের কোরবানী দিতে হয়েছে তবুও তিনি তাঁর আদর্শের সফলতা ইরানী জনগণের ঘরে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন এবং একই সাথে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর প্রাণে মুক্তির আলো প্রজ্জ্বলিত করেছেন।

ইসলামী জগতে কারবালার মর্মন্তুদ ঘটনাটি একটি হৃদয় বিদারক স্মরণযোগ্য ঘটনা হিসাবে বিবেচিত। এদিন নবী করীম (সাঃ) এর আদরের নাতি ইমাম হুসাইন (রাঃ) তৎকালীন ক্ষমতাসীন স্বৈরাচারী ইয়াজিদ সরকারের পিশাচ বাহিনীর হাতে সংগী সাথীসহ কারবালার ময়দানে শাহাদতবরণ করেন। ইয়াজিদ বাহিনী শুধুমাত্র নবী দৌহিত্রকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তার লাশকে টুকরো টুকরো করে, তার উপর দিয়ে সদর্পে ঘোড়া ছুটিয়ে, তাঁর তাঁবু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, তার পরিবারের মহিলা-শিশুসহ সকলকে বন্দী করে বিভিন্নভাবে মানসিক যন্ত্রণা দিয়ে উৎসব করেছিল। নবী নাতীর অপরাধ কি ছিল? তিনি ইয়াজিদের অবৈধ সরকার এবং তার স্বৈরাচারী আচরণ তথা ইসলাম বিরোধী আচরণকে গ্রহণ করেননি এবং মুসলিম জনতাকে তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার বিনিময়ে তাঁকে সপরিবারে এ শাস্তিবরণ করতে হয়েছে। কিন্তু ঐ মর্মান্তিক ঘটনার পর ১৪০০ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ইয়াজিদ তার পরিষদ, পরিবার, সৈন্যসহ ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ ইয়াজিদকে ঘৃণাভরে স্মরণ করবে এবং শতকোটি লা'নত করতে থাকবে। পক্ষান্তরে ইমাম হুসাইন (রাঃ) তাঁর শাহাদাত দিয়ে ইসলামী অনুশাসন রক্ষার যে ভিত্তি দাঁড় করেছিলেন সে ভিত্তিই কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীন রক্ষার ভিত্তি হিসাবে সমাদৃত হতে থাকবে।

"ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালা কি বা'দ।" ইমাম খোমেনী (রঃ) এ দর্শনের একনিষ্ঠ বিশ্বাসী ছিলেন বলেই তাঁর অগণিত সমর্থককে এ মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। কাজেই আধুনিক বিশ্বে কোন অস্ত্র নয়, কোন গেরিলা যুদ্ধ নয়, কোন কূটনৈতিক প্রচেষ্টা নয়, কোন রাজনৈতিক অভ্যুত্থান নয় শুধুমাত্র তলোয়ারের উপর রক্তের বিজয় এর মন্ত্রে মুগ্ধ হাজার হাজার জনতার স্বেচ্ছা শাহাদতের বিনিময়ে ইরানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইমাম বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছেন যে, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় কোন অর্থ, অস্ত্র বা সৈন্যের প্রয়োজন হয় না। শাসক শক্তি বা পরাশক্তি বলে কেউই বিজয় ঠেকাতে পারে না যদি মুসলিম উম্মাহ হুসাইনী আদর্শের অনুসারী হতে পারে এবং সেই কোরবানীর জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে। বিজয়

অচিরেই তাঁদের পদচুম্বন করবে।

ইমাম খোমেনী (রঃ) এর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

এ অধ্যায়ের শুরুতেই বলে রাখা ভাল যে, ইমাম খোমেনী বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত রাজনীতির সমর্থক ছিলেন না। আধুনিককালে কথিত রাজনীতির, সবটুকুই মানব রচিত এবং শত সহস্র ভুলভ্রান্তিতে ভরপুর। এখানে মিথ্যাচারিতা প্রবঞ্চনা, স্বার্থান্ধতা, অত্যাচার, শোষণ আর ভোগ বিলাসের সীমাহীন প্রবণতা ছাড়া আর কিছুই নেই। ইমাম এমন এক রাজনীতির অনুসারী ছিলেন যা রাসূলে খোদা (সাঃ) কর্তৃক আনীত ও প্রণীত ঐশী রাজনীতি। যে রাজনীতির গন্ডি থেকে কোন মুসলমানই দায়শূন্য নয়, যে রাজনীতি মুসলিম উম্মাহর ইহ ও পারলৌকিক সফলতার একমাত্র উপাদান এবং অমুসলিম বিশ্বের জন্য একমাত্র শান্তির গ্যারান্টার। এ রাজনীতির চর্চা ও বিকাশ জগতে মুসলমানের মর্যাদা বৃদ্ধি ও অধিকার সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দেয় আর এর অনুপস্থিতি মুসলিম উম্মাহকে পদে পদে অপমানিত, পর্যুদস্ত ও বিনাশ সাধন করে।

ইমাম খোমেনী সেই মুহাম্মদী রাজনীতির একজন সার্থক বাহক হিসাবে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে যে ভূমিকা রেখেছেন তাতে শুধু যুক্ত হয়েছে তাঁর প্রজ্ঞা, কৌশল। সমসাময়িককালের মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার রাজনীতির প্রেক্ষিতে তিনি এমন এক অসাধারণ রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেছেন যা বর্তমান বিশ্বের খ্যাতনামা রাজনীতিবিদদেরকেও বিস্ময়ে হতবাক করে রেখেছে। আধুনিক বিশ্বের স্বৈরাচারী শাসকবর্গ পরাশক্তিকে যতটা ভয় না পায় তারচেয়েও বেশী ভয় পায় ইমাম খোমেনীর নীরব রাজনীতিকে। কি সেই রাজনীতি?

ইমামের রাজনীতির মূল সূর ঐটিই যা খোদাপ্রদত্ত সুর। এ বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে আল্লাহর সৃষ্ট মানুষের মাঝে মৌলিকভাবে কেউ শাসক আর কেউ শাসিত এমন নেই। নিজ নিজ জন্মগত অধিকারের ভিত্তিতে সবাই স্বাধীন। মানুষের চিরন্তন এ স্বাধীনতার মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য চাই কিছু শৃঙ্খলা। এ শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত কতিপয় মানুষ (অর্থাৎ সরকার) শুধুমাত্র জনতার কল্যাণের সেবক বৈ আর কিছু নয়। এ সেবার ক্ষেত্রে তাদের অবহেলা, স্বেচ্ছাচার, স্বৈরাচার, শোষণ সবই জনতার আদালতে যেমন বিচারযোগ্য ঠিক তেমনি আখেরাতের মহা বিচারালয়েও তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য। কিন্তু যুগে যুগে শাসকগোষ্ঠী জনতার সরলতা, নির্লিপ্ততা অসচেতনতা ও অক্ষমতার সুযোগে ক্ষমতায় গিয়েই স্বৈরাচারী, স্বেচ্ছাচারী, শোষক প্রবঞ্চকে পরিণত হয়েছে। জনতা যুগ যুগ ধরেই শোষিত ও প্রবঞ্চিত হয়েছে। শোষণ ও প্রবঞ্চনার ভিত্‌কে মজবুত করার জন্যই যুগে যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নাম বা আধুনিক রাজনীতির নামে বিভিন্ন শাস্ত্রমন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে। কাজেই মানব রচিত এসব তন্ত্রমন্ত্রের কোনটিতেই মানুষের শাশ্বত মর্যাদার নিশ্চয়তা থাকতে পারে না।

ইমামের এ উপলব্ধিই তাঁকে এমন এক রাজনীতির পথে পরিচালিত করে যা প্রচলিত রাজনীতি থেকে ভিন্ন হলেও এর বাস্তবতা ও সফলতা প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত। ইমামের রাজনৈতিক কর্মকান্ডেই এর যথেষ্ট উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়–যেমন ইমাম খোমেনীর রাজনীতিতে প্রবেশের প্রথম সোপান তাঁর কাশফ–আল–আশরার গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'যে সরকার দেশের আইন ও ইনসাফের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, পুলিশের পোশাকে একদল দুর্বৃত্তকে নিরীহ ও সতী নারীদের অবমাননা করার নির্দেশ দেয় এবং গর্ভবতী নারীদেরকে লাথি মেরে গর্ভপাত ঘটানোর আদেশ দেয় সে সরকার জালিম সরকার। 'অন্যত্র লিখেন, 'স্বৈরতান্ত্রিক দস্যু রেজা খানের ইস্যুকৃত নির্দেশাবালীর আদৌ কোন মূল্য নেই। তার পার্লামেন্টে গৃহীত আইনগুলো মুছে ফেলতে হবে, পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ঐ মূর্খ সৈনিকটির মগজ থেকে যে সব অর্থহীন শব্দ বেরিয়ে এসেছে সব নির্মূল করতে হবে এবং একমাত্র আল্লাহর আইন টিকে থাকবে এবং তা একালের ধ্বংসকে প্রতিরোধ করবে।'

ইরানের শাহের সাথে মার্কিন সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠতম। মার্কিন ও ইসরাইলী স্বার্থরক্ষার জন্য পারস্য অঞ্চলে পাহারাদারের ভূমিকা ছিল ইরানী সরকারের। কাজেই শাহ জাতির উন্নতির জন্য মার্কিন নির্দেশ ব্যতীত একটি পদক্ষেপও গ্রহণ করতে পারতেন না। যেমন মার্কিনী নির্দেশনায় শাহ ইরানে শ্বেত বিপ্লব নামে একটি সংস্কার আন্দোলন শুরু করে। এর দু'টি লক্ষ্য হলো ভূমি সংস্কার এবং নারী স্বাধীনতা। মূলতঃ ইরানের কৃষি অর্থনীতিকে পঙ্গু করে ইরানকে খাদ্যের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল করা এবং নারীদেরকে ভোগ্যপণ্য ও বিপণন সামগ্রীতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যেই এ বিপ্লব পরিচালিত হয়েছিল। ইমাম অবিলম্বে পাশ্চাত্যের এ ষড়যন্ত্রের রহস্য জনতার কাছে ফাঁস করে দেন এবং জনগণকে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানান।

ইরানে মার্কিন স্বার্থ নিশ্চিত করার জন্য কুখ্যাত ক্যাপিটিউলেশন আইন পাশ হয়। উক্ত আইনে ইরানে বসবাসকারী মার্কিনী নাগরিকদের এমন কিছু সুযোগ–সুবিধা দেয়া হয় যা কোন দেশ কোন বিদেশীকে দিতে পারে না। ইমাম শাহ সরকারের এহেন জঘন্য নতজানু মনোভাব সম্পর্কে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, 'আমেরিকার কোন সৈনিকের কুকুর যদি শাহকে কামড়ায়, তা হলেও শাহের প্রতিকার চাওয়ার মত কোন শক্তি নাই।' এ সময় সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের নামে আমেরিকার সাথে শাহের দুইশ' মিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সে চুক্তির ভিত্তিতে এ সাকুল্য অর্থ মার্কিন নীতি ও পরিকল্পনা মাফিক খরচের নীতি নির্ধারিত হয়। ইমাম বুঝতে পারলেন মার্কিন প্রেমে উন্মাদ শাহ কার্যতঃই দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে

পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করছে। এর প্রেক্ষিতে ইমাম সেনাবাহিনীকে জেগে উঠার আহবান জানান। কিভাবে তাদের স্বাধীনতা হরণ করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে তা তিনি সবিস্তারে জনতার কাছে প্রকাশ করেছেন।

ইমামের এ শাহ তথা রাজতন্ত্র বিরোধী দীর্ঘ সংগ্রামের হেতু কি? একটু অনুসন্ধান করলেই এর হেতু স্পষ্ট হয়ে উঠে। ইরানের রাজতন্ত্র যুগ যুগ ধরে মার্কিনী ও ইসরাইলী সহযোগিতায়ই টিকেছিল। শাহ ও তাঁর পূর্বসূরীরা তাদের এ সিংহাসনকে বহাল রাখতে গিয়ে তাদের নির্দেশে যুগ যুগ ধরে এমন সব কার্যকলাপ করেছে যা ইরানী জনতার শুধু ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকারকেই ক্ষুণ্ন করেনি তাদের অর্থনীতিকেও চিরতরে পরনির্ভরশীল করে ছেড়েছে। দেশের এক শ্রেণীর ক্ষমতালোভী ও স্বার্থান্ধ মহল ঐসব পদক্ষেপের সহযোগী হলেও বৃহৎ জনগোষ্ঠী বরাবরই এর বিরোধিতা করেছে। অতঃপর বিরোধীদের স্তব্ধ করার জন্য যখন শাহ নির্যাতনের পথ গ্রহণ করে, তখন তা সরকার উৎখাত আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। আর এ আন্দোলনের ন্যায় ভিত্তিক ও সাহসিকতাপূর্ণ নেতৃত্ব দেন ইরানের আলেম সমাজ।

ইমামের ঐশী দর্শনের চোখে রাজতন্ত্রই ছিল সম্পূর্ণ অবৈধ ব্যবস্থা। তার উপর ইরানী জনগণের সমস্যাকে উপেক্ষা করে বিদেশী প্রভুদের মনোরঞ্জনের শাহী নীতি ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। কারণ শাহ ইরানের সাকুল্য সম্পদকে তাঁর পারিবারিক সম্পদ বলে মনে করতেন। পাহলভী রাজতন্ত্রের ৫০ তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে তিনি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের জন্য শুধু তেহরানেই ৮০ কোটি রিয়াল বরাদ্দ করেন। ইমাম জাতির এ অর্থ অপচয়ের তীব্র নিন্দা করে বলেন, 'বঞ্চিত জনগণ উপোস করছে অথচ শাহী শান-শওকত ও উৎসবের জন্য ৮০ কোটি রিয়াল বরাদ্দ করা হয়েছে, এটা কোন ধরনের প্রহসন? সরকার-তোমরা মৃতদের জন্য উৎসব কর আর জীবিতদেরকে অবজ্ঞা কর। তোমরা শাসকগোষ্ঠী জনগণের তহবিল লুটপাট করছ এবং জাতীয় সম্পদের উৎস বিদেশীদের ভোগ ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ করে দিচ্ছ। এ দেশের জনগণ কখনই তা বরদাশত করবে না।' এমনি আরো বহু উদাহরণ দিয়ে বলা যাবে যে ইমামের রাজনীতির মূলধারা ছিল ইরানী জাতির মুক্তির সাথে সম্পৃক্ত। ইমাম কেবলমাত্র জাগতিক স্বার্থকেই রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য ঠিক করেননি এর সাথে মূলতঃ সংযুক্ত হয়েছে মুসলিম জনতার পারলৌকিক মুক্তির প্রশ্ন। কাজেই এক্ষেত্রে তাঁর রাজনীতি দু'টি ধারায় সমভাবে এগিয়ে গেছে। এ অভিনব রাজনীতির দীক্ষা তিনি নিয়েছেন স্বয়ং মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদর্শ থেকে। তাই তিনি জীবনের সর্বাধিক সময় ব্যয় করেছেন এমন কিছু অনুসারী তৈরীর পিছনে যাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া দায়িত্ব (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ) দেশজুড়ে যথাযথভাবে পালন করতে পারে। এ রাজনীতি ছিল এক নীরব রাজনীতি যা দেশের প্রতিটি এলাকায় জুমা

মসজিদের ইমাম, মুবাল্লিগ, ধর্মতত্ত্ববিদদের নিরলস পরিশ্রম দ্বারা জনতার মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি করেছিল। এ নীরব রাজনীতিই যখন সরব হয়ে উঠেছে তখন দেখা গেছে যে, স্বৈরাচারী শাহের সেনাবাহিনীর মেশিনগানের মুখে অকাতরে জীবন দানের মত লোকের কোনই অভাব হচ্ছে না।

কেন ইমামকে ইরানী জনতা এত সহযোগিতা দিল? তিনি ঘুমে অচেতন জাতিকে তাদের স্বরূপ বুঝাতে, অধিকার চিনাতে এবং অধিকার আদায়ের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের প্রতি সচেতন করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর নিরলস কর্মতৎপরতা, ক্ষুরধার লেখনী এবং বাস্তবতাপূর্ণ বক্তব্য যখন ইরানী জনতার হৃদয় জয় করেছে তখন ইরানী জনতা তাঁকে শুধু আধ্যাত্মিক নেতাই মনে করেনি একই সাথে রাজনৈতিক মুক্তিদাতা বলেও মেনে নিয়েছে। তার প্রমাণ–১৯৭৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারী যখন তিনি পালিয়ে যাওয়া শাহের নির্বাচিত শাসক শাপুর বখতিয়ারের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে ফ্রান্সের নির্বাসন থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন তখন আনন্দে আত্মহারা ইরানী ৬০ লাখ আবাল–বৃদ্ধবনিতা তাদের প্রিয় নেতাকে যে বীরোচিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে সে দৃশ্য পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটিও ঘটেনি। অনুরূপভাবে ১৯৮৯ সালের ৬ জুন ইমামের জানাজায় বিলাপরত ইরানের লাখ লাখ জনতা যে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা করেছিল, নেতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও নেতা হারাবার বেদনার প্রকাশ এর চেয়ে গভীরভাবে হওয়া পৃথিবী আর কোনদিন অবলোকন করেনি।

ইমামের রাজনীতি শুধুমাত্র নিজ দেশের পরিমন্ডলে আবদ্ধ ছিল না। তিনি বিশ্বজুড়ে শোষিত বঞ্চিতের মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন। বিশ্বজুড়ে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য–সম্প্রীতির আশা করতেন। বিশ্বজুড়ে ইসলামী হুকুমতের আকাঙ্খা করতেন। কাজেই বিভিন্ন পরিসরে তার ভূমিকাগুলো ছিল স্মরণীয়। ইমামের নেতৃত্বে ইরানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র সৃষ্টি হলেও মার্কিন সরকার ও তার সহযোগিরা কোন মতেই তা মেনে নিতে পারেনি। এ বিপ্লবকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করার জন্য বিপ্লবের নেতৃবৃন্দকে গোপনে হত্যা থেকে শুরু করে সব কিছুই করেছে। ইরাককে দিয়ে ১০টি বৎসর অহেতুক আরোপিত যুদ্ধ লাগিয়ে রেখেছে। তাতে বিপ্লবের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দসহ লাখ লাখ বিপ্লবের রক্ষী প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু সব ধরনের ষড়যন্ত্রেই ইমাম তার জনগণকে স্থির ধীর ও শান্তভাবে সকল অবস্থা মোকাবিলার পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। বিশ্ব রাজনীতিতে তাঁর অন্যতম ভূমিকা হলো মুসলিম বিশ্বের সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে এক পতাকাতলে সমবেত করা। একথা আজ নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক হানাহানি, মারামারি এবং পারস্পরিক ক্ষতি করার যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় অন্য কোন জাতির ক্ষেত্রে তেমনটি নেই। অনৈক্যের মোক্ষম সুযোগটিকেই খোদাদ্রোহী বিশ্ব মুসলমানদেরকে পৃথক পৃথক রেখে সময়

সুযোগ মত ক্রমান্বয়ে সকলের ধ্বংস নিশ্চিত করছে। ইমাম ইসলামের দুশমন শক্তির এ ঘৃণ্য প্রচেষ্টা সম্পর্কে বিশ্ব মুসলিমকে সচেতন করার প্রচেষ্টা চালান। মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উপাদানগুলো সম্পর্কে সতর্ক করেন। তাঁর এ মহান উদ্যোগের কিছু পরিচয় মিলে তাঁর কিছু বাণীতে "আমি সবাইকে বলছি–একটা ইসলামী প্রজাতন্ত্রে ধনী–দরিদ্র, সাদা–কালো, সুন্নী–শিয়া, আরব–অনারব, তুর্কী–অতুর্কী কেউ কারো উপর প্রাধান্য পাবে না। পবিত্র কোরআন কাউকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে শুধুমাত্র তার খোদাভীতি ও পরহেজগারীর ভিত্তিতে। খোদাভীরু ও সৎ স্বভাবসম্পন্ন লোকেরা রাষ্ট্র ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকলে সকল সুবিধাবাদ ও কায়েমী স্বার্থবাদ নির্মূল হতে বাধ্য। এখানে কেউ কারোর চেয়ে বড় নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এখানে সবাই সম্মানী ও সম অধিকারী। (ইরানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বাণী ৩–৪–৭৯ ইং) 'ইরানে ইসলামের বিজয়ে ভীতসন্ত্রস্ত ইসলামের শত্রুরা মুসলমানের শিয়া–সুন্নীর বিরোধকে চাঙ্গা করার প্রয়াস চালাচ্ছে। আমাদের জনগণকে হুশিয়ার থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে বিশ্বের মুসলমানগণ ফিকাহ অনুসরণের দিক থেকে কেউ হানাফী, কেউ শাফেয়ী, কেউ হাম্বলী বা কেও জাফরী মাযহাবভুক্ত হয়েছেন। মাযহাবের এ বিভাজন কোন মৌলিক বিভাজন নয় এবং ঐ সকল স্বীকৃত মাযহাবের অনুসরণ সম্পূর্ণ বৈধ। এসব কিছু আসলে কোন বিরোধের প্রমাণ নয়। আমরা প্রত্যেকেই একে অপরের ভাই। শিয়া ও সুন্নী ভাইদেরকে অবশ্যই তাদের মতদ্বৈততা পরিহার করতে হবে। যারা এ বিরোধকে কাজে লাগিয়ে স্বার্থ উদ্ধারে লিপ্ত, খোঁজ নিয়ে দেখুন তারা শিয়াও নয় সুন্নীও নয়। মূলতঃ তারা ইসলামের সঠিক অনুসারীই নয়। আমাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির পিছনে তাদের স্বার্থ নিহিত রয়েছে। তাদের থেকে সাবধান থাকতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই আল–কোরআন ও তাওহীদের অনুসারী হতে হবে।" (কুর্দীস্থানের নওশাদ থেকে আগত মুসলিম প্রতিনিধিদের প্রতি বাণী)।

"ঐক্য হচ্ছে এমন একটি আদর্শ যার দিককে পবিত্র কোরআন মানুষকে নির্দেশনা দিয়েছে। মূলতঃ ইসলামের প্রতি আহবান মানেই হচ্ছে ঐক্যের প্রতি আহবান, জনগণকে ইসলামের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান। আপনারা জানেন যে, ইসলামের শত্রুরা এ ধরনের ঐক্যকে বাস্তবায়িত হতে দেয়নি। বিশেষ করে সাম্প্রতিক শতাব্দীগুলোতে তারা কঠোরভাবে চেষ্টা করছে যাতে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও বিরোধের আগুন প্রজ্জ্বলিত থাকে। কেননা, তাদের বিশেষজ্ঞগণ বুঝতে পেরেছে যে, যদি বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ সংহত ও ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, তাহলে কোন শক্তিই তাদের মোকাবিলা করতে ও তাদের উপর শাসন চালাতে পারবে না। তাই তাদের লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য তাদের সামনে একমাত্র বিকল্প হচ্ছে বিভিন্ন ইসলামী দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপন করা।" (জুমা ইমামদের প্রতি ইমাম খোমেনীর বাণী)।

"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিশ্ব শোষকদের জন্য প্রধান ভীতির কারণ হচ্ছে ইসলাম। কেননা, ইসলামই হচ্ছে এমন শক্তি যা দুনিয়ার মুসলমানদেরকে তওহীদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম। ইসলামই পারে মুসলিম দেশসমূহ ও দুনিয়ার বঞ্চিত মানুষের উপর থেকে বিশ্ব অপরাধীদের হস্তকে ধ্বংস করতে। ইসলামই পারে বর্তমান পৃথিবীর সামনে এক ঐশী প্রগতিশীল ও উচ্চতর চিন্তাধারা ও ব্যবস্থা উপস্থাপন করতে।" (হজ্জযাত্রীদের প্রতি ইমামের বাণী – ৬–৯–৮)।

"– বিশ্বজোড়া জালেম সম্প্রদায় চায় ইসলামকে ধ্বংস করতে যাতে আমাদের ইসলামী গুণাবলী বিনষ্ট হয়ে যায়। এখন আমাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করা উচিত নয়। যেখানে মুসলমানদেরকে কাফের, মুশরেক ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হচ্ছে। যদি একশ' কোটি মুসলমান তাদের বিরাট এলাকাসহ রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয় এবং এই ফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে উপনিবেশবাদের দোসর কিছুসংখ্যক ইহুদী তো দূরের কথা, বিশাল ক্ষমতাধর উপনিবেশবাদীর পক্ষেও নিশ্চিতভাবে কোন মুসলিম দেশ আক্রমণ করা সম্ভব নয়।"

(বাংলাদেশী কতিপয় নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে ইমামের বাণী – ১–৯–৮২)

এ ধরনের আরো অসংখ্য উদাহরণ থেকে বুঝা যাবে যে, ইমামের বিশ্ব রাজনীতির মূল লক্ষ্যই হলো বিশ্ব মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং লাঞ্ছনা ও নির্যাতন থেকে তাদেরকে রক্ষা করা। একই সাথে নির্যাতিত অমুসলিম সম্প্রদায়সমূহকেও মুক্তির পথ প্রদর্শন করা। ইমামের এ প্রচেষ্টার আশু ফল হলো ইসলাম ও তার নবী (সাঃ)–এর বিরুদ্ধে বিষোদগারকারী বৃটিশ লেখক সালমান রুশদীর মৃত্যুদণ্ডের ফতোয়া। এ ফতোয়ার প্রতি বিশ্বের শতকোটি মুসলমানের সক্রিয় সমর্থন ঐ নচ্ছারকে বছরের পর বছর চোরের মত পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য করছে। বিশ্বের তাবত সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিগুলোও তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ইমাম জানতেন, বিশ্ব তাগুতী শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামকে দুনিয়া থেকে উৎখাতের নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সে প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বাহ্যিকভাবে তাদের সাহায্য–সহযোগিতার অভিনয় মূলতঃ ইসলামকে মুসলমানের কাছেই অপাংক্তেয়, অগ্রহণযোগ্য ও পরিত্যাজ্য বিষয়ে পরিণত করার প্রচেষ্টামাত্র। বিশ্বজুড়ে মুসলিম নিধন ও নির্যাতনের অগণিত মর্মন্তুদ ঘটনা এর প্রমাণ বহন করছে। এ চরম সত্যটি মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করেন না এমন নয়। কিন্তু তাদের প্রভাব বলয় থেকে বের হয়ে অনাবিল স্বাধীনতা ভোগের উপায় জানা থাকলেও সে সাহস তাদের নেই। কিন্তু ইমামের ঐশী রাজনীতি ইমামের ইরানকে সে দুর্লভ স্বাধীনতার স্বাদ পাইয়ে দিয়েছে। আজ ইরানী জনতা গলা ফাটিয়ে বলতে পারে –

আমরা আমেরিকা বা রাশিয়ার গোলাম নই, নই মোরা ইসরাইলের দাস। আমরা স্বাধীন মুসলমান। আমরাই তাগুতী খোদাদ্রোহী বিশ্বের মোকাবিলায় খোদার বিধানের একমাত্র উচ্চকণ্ঠী ঘোষক।

ইমাম চাইতেন বিশ্বের তাবৎ নির্যাতিত মুস্তাদয়াফ শোষকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াক। সে লক্ষ্যেই তিনি বিশ্ববাসীর দরবারে শোষকদের চেহারা উন্মোচিত করে দিয়েছেন। তাঁর এ বিশ্ব রাজনীতির প্রতিক্রিয়া সারা বিশ্বেই আজ পরিলক্ষিত হচ্ছে। যাকে আমরা মুসলিম পুনর্জাগরণের আভাস বলে মনে করছি।

ইমাম খোমেনী প্রচলিত রাজনীতি না করেও এমন এক রাজনীতি করেছেন যার ভিত্তি গড়ে উঠেছে লক্ষ কোটি জনতার অন্তর থেকে। যার রাজনৈতিক আদর্শকে বিশ্বের সকল শোষিত নির্যাতিতরা মুক্তির আলোকবর্তিকা বলে সাদরে গ্রহণ করেছে। প্রচলিত রাজনীতির বাইরের বলেই এ রাজনীতি এত অপ্রতিরোধ্য এবং বিশ্বের সকল সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদী গোষ্ঠী এর ভয়ে এত ভীত।

ইসলামী বিপ্লবের সফল বিজয়ের পর সে দেশটির উপর ইসলাম বিরোধী শক্তিসমূহের পক্ষ থেকে একাধারে যে সব বৃহৎ বৃহৎ সমস্যার সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে মনে হয়েছে যে, এ বিপ্লব অংকুরেই মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু ইমামের অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বিশ্বকে হতভম্ব করে দিয়ে তার বাস্তবতার স্বাক্ষর রেখেছে। এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইমামের রাজনৈতিক অভিমত ও মূল্যায়ন বাস্তবে রূপ নিয়ে ইমামের শ্রেষ্ঠত্বেরই প্রমাণ বহন করছে। এ প্রসঙ্গে মহাপরাক্রমশালী সমাজতান্ত্রিক পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের মহা প্রতাপশালী প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের কাছে ইমামের ঐতিহাসিক পত্রটি প্রণিধানযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ এ দীর্ঘ চিঠির অংশবিশেষ উল্লেখ করা যায় – যেমন – ইমাম লিখেন –'জনাব গর্বাচেভ; সত্যের দিকে সবারই প্রত্যাবর্তন করা উচিত। ব্যক্তি মালিকানা, অর্থনৈতিক সমস্যা ও স্বাধীনতাহীনতা আপনাদের প্রধান সমস্যা নয়। এটি হচ্ছে সত্যিকারের খোদা বিশ্বাসের অনুপস্থিতি। সেটি এমন এক সমস্যা যা পাশ্চাত্যকে অশ্লীলতা ও সামাজিক অচলাবস্থার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে বা ভবিষ্যতে সে পথে ঠেলে দিবে। সকল সত্তা ও সৃষ্টির উৎস যে খোদা তার বিরুদ্ধে দীর্ঘ ও অর্থহীন সংগ্রামই আপনাদের প্রধান সমস্যা। – জনাব গর্বাচেভ – এটা আজ সবার নিকট সুস্পষ্ট যে, এখন থেকে কম্যুনিজমকে বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসের যাদুঘরগুলোতে খোঁজ করতে হবে। কেননা, মানুষের সত্যিকার প্রয়োজনের ব্যাপারে কোন সদুত্তর মার্কসবাদে নেই – । কিন্তু আমি আপনাকে গুরুত্ব সহকারে বলতে চাই যে, মার্কসবাদী কুহেলিকার প্রাচীর ভাঙতে গিয়ে পাশ্চাত্য ও বড় শয়তানের (আমেরিকা) জিন্দানখানায় ধরা দেবেন না। –'

এ পত্রে প্রতিটি ছত্রে আছে এক অসাধারণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিকের বাস্তব বিশ্লেষণ যার নতিজা অচিরেই বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করছে। এর মধ্যে আছে বস্তুবাদী ও নাস্তিক্য বিশ্বের আস্ফালনকারীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব এবং সঠিক পথ নির্দেশনা। কাজেই এ ধরনের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয় যা একটি পূর্ণাঙ্গ বৃহৎ গ্রন্থের দাবী রাখে।

আধ্যাত্মিকতার আলোকে ইমাম খোমেনী (রঃ)

ইমাম খোমেনী বিংশ শতাব্দীর সর্বাধিক আলোচিত একটি নাম। তিনি ছিলেন ইরানসহ বিশ্বের শোষিত, নির্যাতিত ও মুক্তিকামী মানুষের প্রাতঃস্মরণীয় পথ নির্দেশক, আর তাঁর বিরোধী শক্তি বিশেষতঃ পাশ্চাত্য ও সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া তাঁকে চিত্রিত করেছে এবং অপপ্রচার চালিয়েছে আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিক্রিয়াশীল, প্রগতি বিরোধী মৌলবাদী ও নির্মম হিসাবে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে এ মানুষটি কি?

প্রথমতঃ ইমামের জীবনী থেকে দেখা যায় যে, তিনি একজন অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন আলেম। ইরানী জনতার মধ্যে যিনি ইমাম বা সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতৃত্বের অধিকারী হন তিনি বাস্তবিকভাবেই জ্ঞানে গরিমায়, সততা ও নিষ্ঠায় সর্বোপরি আধ্যাত্মিক সাধনায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেই সে পদ পান। এসব ব্যক্তির আচার-আচরণ, ক্রিয়াকলাপ, মোরাকাবা-মুসাহাদা এবং আল্লাহর বান্দাকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা হাজার হাজার আলেম ও কোটি কোটি দেশবাসীর দৃষ্টি পরীক্ষায় এমনভাবে উত্তীর্ণ করে দেয় যে, একপর্যায়ে দেশবাসী তাঁদেরকে ইমামে মাসুম বা নিষ্পাপ ইমাম বলতে দ্বিধা করে না। ইমাম খোমেনী (রঃ) এ পর্যায়ের একজন ব্যক্তিত্ব। ইমামের কর্মময় জীবন শুরু হয়েছে দ্বীনী শিক্ষা বিস্তারের মধ্য দিয়ে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি একটি দিনের জন্যও ঐ লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে হাজারো ইতিহাসের জন্ম হয়েছে, এ ইতিহাস গ্রন্থ তাঁর উপদেশ মালায় ভরপুর। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তাঁর এমন একটি বাণীও খুঁজে পাওয়া যায় না যার সাথে আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক নেই। মূলতঃ তাঁর জীবনের দর্শনটাই হলো "আমর বিল মা'রুফ, সৎ কাজের আদেশ এবং নেহি আনিল মুনকার-অসৎ কাজে নিষেধ" এর উপর জীবনের প্রতিষ্ঠা। এ দর্শন খোদাপ্রদত্ত দর্শন। এ দর্শন প্রিয়নবী (সাঃ) এর দর্শন। এ দর্শনের আলোকেই পরিচালিত হয়েছে তাঁর জীবনের কর্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, সমরনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নীতি। কাজেই তাঁর কর্মময় জীবনে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও লক্ষণীয় বস্তুটিই হলো আধ্যাত্মিকতা।

বিভিন্ন পর্যায়ে তার আচরণ বিশ্লেষণ করলেই এর সত্যতা প্রমাণিত হবে। উদাহরণের দীর্ঘ পথ না ঘুরে দেখা যাক বিশ্ব মুসলিম নেতৃবৃন্দ তাঁর সম্পর্কে কি ধারণা

রাখেন –

ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, ইসলামী পুনর্জাগরণের নকীব ইমাম খোমেনী (রঃ) ১৯৮৯ সালের ৩ জুন দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে বেদনার অনুরনন তুলে মৃত্যুবরণ করেন। মহান এ নেতার মৃত্যুতে মুসলিম–অমুসলিম নির্বিশেষে গোটা বিশ্ব শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাঁদের মূল্যায়নসহ শোকপত্র পাঠাতে থাকেন। নিম্নে তারই কয়েকটি অংশ বিশেষ উল্লেখ করছি –

– বেনজীর ভুট্টোঃ–গভীর দুঃখ ও মর্মবেদনার সাথে আমরা হযরত ইমাম খোমেনী (রঃ)–এর তিরোধানের নিদারুণ দুঃসংবাদ অবগত হয়েছি। তাঁর তিরোধানে ইরানী জনগণ হারাল এক খোদায়ী রাহ্‌বার এবং মুসলিম বিশ্ব হারাল অসামান্য গুণাবলী ও অনন্য সাধারণ প্রতিভার অধিকারী এক আধ্যাত্মিক নেতাকে। ইমাম খোমেনী পরিচালিত ইসলামী বিপ্লব শুধু ইরানী সমাজ ব্যবস্থায় নয় বরং গোটা মুসলিম বিশ্বেই এনেছে একটা মৌলিক পরিবর্তন এবং ইসলামের চিরন্তন আদর্শে মুসলিম উম্মাহর বিশ্বাসকে করেছে পুনরুজ্জীবিত।

– ভারতীয় মুসলিম নেতা ও দিল্লীর জামে মসজিদের ইমাম আব্দুল্লাহ বুখারী – "ইমাম খোমেনীর ইন্তেকালের দুঃসংবাদে আমি মর্মাহত হয়েছি। এ দুর্ভাগ্যজনক খবরের পর মানসিক অবস্থা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। তিনি এমন এক মুজতাহিদ ও ঈমানদার ব্যক্তি ছিলেন যিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মত সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব গোটা এক শতকে দেখা যায়নি।"

– ফিলিস্তিন সংগঠনের শীর্ষ কর্মকর্তা ডঃ ফাহ্‌মী বলেন–"ইমাম খোমেনী ছিলেন ফিলিস্তিনী জাতির পিতা, নেতা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষক। তাঁর ইন্তিকালে আমরা এমন একজন ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছি যিনি ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত এবং মুসলমানদের সঠিক পরিচয় পুনরুদ্ধার করেছেন।"

– লেবাননের উপ–প্রধানমন্ত্রী আব্দুল্লাহ্ রাসি – "ইমাম মানব জাতিকে মানবতার মহান নিদর্শন ও গুপ্ত রহস্য শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি সকল ধর্মের লোকের জন্য ইনসাফ ও সমতার ভিত্তি স্থাপন করেছেন।"

– তানজানিয়ার প্রেসিডেন্ট – "ইমামের মৃত্যুতে বিশ্ব ইসলামী বিপ্লবের স্থপতি, জালেমদের উৎখাতকারী ও মজলুমদের অন্যতম সাহায্যকারী একজন নেতাকে হারিয়েছে।"

– উগান্ডার প্রেসিডেন্ট – "ইমাম খোমেনী ছিলেন এক মহান ধর্মীয় নেতা। শুধু ইরানী মুসলমানদের জন্যই নয়, সমগ্র বিশ্বের নিকটই তিনি ছিলেন এক প্রেরণার উৎস।"

কন্যা প্রফেসর ডঃ জাহ্‌রা মুসতাফাভী ও নাতির সাথে ইমাম

– ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলাম বিষয়ক প্রফেসর হামিদ আলগার – "ইমাম খোমেনী ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী মুসলমান, তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল আল্লাহর নিদর্শন এবং পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ব। তিনি ছিলেন কঠোর সংযমের মধ্যে জীবন যাপনকারী এমন একজন ব্যক্তি যাঁর জীবনে প্রশান্তি বিরাজমান ছিল। যথার্থ চিন্তা–চেতনা ও রাজনৈতিক বিবেচনার সমুদ্রে তিনি অবগাহন করেছিলেন। এ ধরনের বৈশিষ্ট্য অন্য কোন বিপ্লবী ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় না।"

ইমামের মৃত্যুতে এদেশের সরকার প্রধান থেকে শুরু করে প্রধান প্রধান সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং ধর্মীয় নেতাগণ পৃথক পৃথক বিবৃতি প্রদান করেন। সকলের বিবৃতিতেই একই সুর লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন ধারায় বলতে গিয়ে সবাই একই কথাই বলেছেন যে, ইমাম খোমেনীর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের চেয়ে আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের বিকাশটিই সুপ্রকট। তাঁর এ ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর বিপ্লবের সফলতা বিশ্ব মুসলমানদের জন্য একটি প্রেরণার উৎস এবং পথ নির্দেশিকা। এ মহান ব্যক্তিত্বের কাছে সবাই শ্রদ্ধাবনত।

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের প্রবক্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার দালালরা যদিও মিথ্যা প্রচার–প্রপাগাণ্ডার মাধ্যমে মহান ইমামকে ভিন্নরূপে চিত্রায়িত করতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছে কিন্তু ইমামের বিভিন্নমুখী ব্যক্তিত্বের পরিধি এত বেশী ছিল যে, তারা সাধ্যাতীত চেষ্টা করেও ইমামকে বিশ্ববাসীর কাছে খাটো করতে বা তাদের অন্তরের শ্রদ্ধার আসন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। বরং নিজেরাই মিথ্যুক, প্রবঞ্চক এবং জালেম হিসাবে নিন্দিত হয়েছে।

যুগশ্রেষ্ঠ একজন আলেম, ফকিহ্ ও মুজতাহীদ হিসাবে ইমাম খোমেনী ছিলেন অনন্য। তাঁর প্রতিটি কাজে আল্লাহর বিধান ও রাসূল (সাঃ)–এর আদর্শ প্রধান উৎস হিসাবে বিবেচিত হতো। দৈনন্দিন জীবনের সকল কাজকে সংক্ষিপ্ত করে তিনি নিয়মিত আধ্যাত্মিক সাধনায় মগ্ন হতেন। অত্যন্ত স্বল্পভাষী এ মানুষটির গতিবিধি–কার্যকলাপ মানুষকে আল্লাহর জিকিরে উদ্বুদ্ধ করতো। তিনি সবসময় উপদেশ দিতেন, "যখনই জ্ঞানার্জনের জন্য দু'কদম অগ্রসর হবে তখনই তাযকিয়ায়ে নফস্ (আত্মশুদ্ধির) এর দিকেও দু'কদম এগুবে। তিনি নিজে সর্বদা ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন, গোটা রমজান মাস এতেকাফ করতেন। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও তাহাজ্জুদের নামাজ বাদ দেননি। এমনকি যে রাত্রে তিনি প্যারিস থেকে দেশে ফিরেন, সে রাত্রেও বিমানে তাহাজ্জুদ আদায় করেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত ইমাম – তখনও নামাজকে ভুলেননি। অতি কষ্টে দেহের বিভিন্ন স্থানে বিদ্ধ সূঁচগুলো (স্যালাইন, রক্ত, অক্সিজেন সরবরাহকারী) নিয়েও ঠিকই শেষ ওয়াক্তের নামাজটি আদায় করেন।

পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মিতব্যয়ী। কঠোরভাবে তিনি বায়তুল মালের হিফাজত করতেন এবং সকল বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করার জন্য পরিবারের সদস্যদেরকে এবং অন্যান্য অনুসারীদেরকে সর্বদা নছিহত করতেন। তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য আর একটি পৃথক গ্রন্থের দাবী রাখে। সংক্ষিপ্ত রচনার কলেবরের প্রতি লক্ষ্য করে এ দেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলেম, আল্লাহর ওলি মরহুম হযরত হাফেজ্জী হুজুরের একটি মন্তব্যের মাধ্যমে এ অধ্যায়ের সমাপ্তি টানতে চাই। মধ্যপ্রাচ্য সফরশেষে দেশে ফিরে হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রঃ) বলেন, "ইমামকে একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে দেখেছি। তাঁর চেহারায় ঐশী নূর বিদ্যমান। তাঁর অল্পক্ষণের সান্নিধ্যে যে কোন দুনিয়াদার গাফেল মুসলমানকে সাময়িকভাবে হলেও পরকালমুখী করে তোলে এবং আল্লাহর স্মরণে উদ্বুদ্ধ করে।"

গ্রন্থ সহায়িকা ঃ

১) আলোর স্মারক – ইতিহাসে চির ভাস্বর অবয়ব খোমেনী

২) মাসিক নিউজ লেটার

৩) শ্রেষ্ঠ জিহাদ – ইমাম খোমেনী (রঃ)

৪) হাজার বছরের বিস্ময় – এ, এন, সালামত উল্লাহ্

৫) শিয়া–সুন্নী বিরোধ ভুলে যেতে হবে – ইমাম খোমেনী (রঃ)

৬) মিখাইল গর্বাচেভের প্রতি ইমামের দাওয়াত

৭) সাপ্তাহিক বিক্রম ইত্যাদি।

ইমাম খোমেনী (রহঃ) ছিলেন যোগ্য ওয়ারিশে নবী

এ কে এম মাহবুবুর রহমান

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হওয়ার পেছনে যে শক্তি কাজ করছে তা হল তার জ্ঞান বা ইলম (علم)। হযরত আদম (আঃ) মাটির মানুষ হয়েও সকল ফেরেশতার সিজদা পাওয়ার কারণও ছিল আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান। যেমন ঘোষিত হয়েছে ঃ

وعلّم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئونى باسماء هولاء ان كنتم صادقين- قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم- (بقرة-٣١-٣٢)

"তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, এরপর এসব (বস্তু) ফেরেশতাদের সামনে পেশ করলেন এবং বললেন এসব বস্তুর নাম আমাকে বলে দাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তারা বলল, আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নেই। বস্তুত আপনি মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরা-বাকারা ঃ ৩১-৩২)

বাবা আদম থেকে শুরু করে অদ্যাবধি জ্ঞানের যে বিকাশ লাভ করেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত করবে তার মাধ্যম তিনটি।

১। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান (حواس خمسه)

২। বিবেক বুদ্ধির জ্ঞান (عقل)

৩। ওহী বা ঐশীজ্ঞান (وحى)

চোখ, কান, নাক, জিহবা ও ত্বকের সাহায্যে দেখে, শোনে, উপলব্ধি, স্বাদ এবং অনুভবের মাধ্যমে যে জ্ঞান আহরণ করা যায় তাতে সকল প্রাণী সমান। প্রতিটি প্রাণী তার ইন্দ্রিয় ক্ষমতা মোতাবেক জ্ঞান অর্জন করেই তার জীবনকে পরিচালনা করে। পঞ্চ

লেখক ঃ পরিচালক, আল-ফাতিহা গবেষণা পরিষদ, ঢাকা।

ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্র খুবই সীমিত। যার বেশীর ভাগই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। যে স্তরে এসে এ জ্ঞানের সীমা শেষ হয় সেখান থেকে শুরু হয়- দ্বিতীয় মাধ্যম তথা বিবেক বুদ্ধি বা আকল (عقل) এর জ্ঞান। এ বিবেক বুদ্ধি ও বস্তুর ব্যবহার এবং সৃষ্টির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জ্ঞানেরও সীমা এ বস্তু জগতের মধ্যেই সীমিত। তবে এর পরিধি প্রথম স্তর থেকে লাখ কোটি গুণ বড় ও ব্যাপক। এ স্তরের জ্ঞানের অধিকারী শুধুমাত্র মানুষ সর্বতোভাবে আর জ্বীন জাতি আংশিকভাবে। সৃষ্টির শুরু থেকে আধুনিক সুপারসনিকের যুগ পর্যন্ত যা কিছু আবিষ্কার মানুষ করেছে তা বিবেক বুদ্ধির গুণেই সম্ভব হয়েছে। তবে এ বিবেক বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান চিরন্তন এবং সন্দেহাতীত নয়। যত বড় জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, দার্শনিকই জগতজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন তাদের জ্ঞান নির্ভুল এবং চিরন্তন সত্য এ নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম হননি। তাদের একজনের সূত্র অপরজনের কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য হয়নি। পূর্বেকার সূত্রকে ভুল প্রমাণ করে নিজস্ব সূত্র অধিকতর সঠিক বলে প্রমাণ করার প্রতিযোগিতা ছিল তাদের মধ্যে প্রবল। আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও যতটা প্রগতির পথে অগ্রসর হয়েছেন তার চেয়ে দুর্গতিই অধিক ডেকে এনেছেন। তবে সবার মধ্যে একটি আশা ও চাওয়া-পাওয়া ছিল আর তা হল শান্তি নামের সঠিক, নির্ভুল ও সর্বজনগ্রাহ্য পায়রা। কিন্তু আকলের জ্ঞান দিয়ে সৃষ্টির ইতিহাসে কেউ এ শান্তির পায়রা লাভ করা তো দূরের কথা তার ছায়াও দেখতে পায়নি। তাই প্রমাণ হয়েছে- বিবেক বুদ্ধির জ্ঞান অতি সামান্য, অতি ক্ষুদ্র, অপরিপক্ক ও ভুলের সমাহার মাত্র। এ বিবেক বুদ্ধির স্তরের যেখানে এসে পরিসমাপ্তি ঘটেছে সেখান থেকে যে জ্ঞানের স্তর ও মাধ্যম শুরু হয় তা হল ওহী বা ঐশী (وحى) জ্ঞান যার মধ্যে নেই সন্দেহের অবকাশ, যা বাস্তব, যুগোপযোগী, চিরন্তন সত্য, যে জ্ঞানই শান্তি নামক কাংখিত বস্তু উপহার দিতে পারে। প্রাণী জগতের পঞ্চ ইন্দ্রিয় জ্ঞান তার সাথে সাধারণ মানুষের বিবেক বুদ্ধির জ্ঞান এবং নির্ভুল ঐশী জ্ঞান এ তিন স্তরের সমন্বিত জ্ঞানের ধারক বাহক ছিলেন বাবা আদম থেকে মহানবী (সাঃ) পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী-রাসূল। শুরু থেকে শেষ নবী পর্যন্ত যাদের তত্ত্ব ও তথ্যে এবং অকাট্যতা, বাস্তবতা, চিরন্তন ও গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র গরমিল পরিলক্ষিত হয়নি। নবী-রাসূলগণের কাছে পাওয়া ঐশী জ্ঞানের অধিকারী মানব গোষ্ঠীই ছিলেন প্রকৃত নির্ভেজাল জ্ঞানের অধিকারী। তারাই এ বিশ্বলোককে দেখাতে পেরেছেন শান্তি ও প্রগতির পথ। মানব জাতির দিশারী মুক্তির দূত মহানবী (সাঃ)-এর মাধ্যমে নবুয়ত ধারার পরিসমাপ্তি ঘটার পর নবী নন কিন্তু নবুয়তের তথা ঐশী জ্ঞানের ধারক বাহক, খোদাপ্রদত্ত বিধান বাস্তবায়নের যোগ্যতাসম্পন্ন, নবী-রাসূলগণের চরিত্রের প্রতীক ব্যক্তিগণই হলেন ওয়ারিশে নবী বা নবীর উত্তরাধিকারী। যাদেরকে সাধারণ অর্থে বলা

হয় নায়েবে নবী। মুসলিম জাতির খলিফা ইমাম, রাহবার, আদর্শ নেতা।

নবীগণের উত্তরাধিকার বৈষয়িক বিষয়ে হয় না–এ উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে। যেমন খাতামুন্ নাবিয়্যিন মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

"وان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر– (احمد، ترمذى، ابوداؤد، ابن ماجه، دارمى)

"আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) আর নবীগণ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) বা দেরহামের (রৌপ্য মুদ্রা) ওয়ারিশ রেখে যান না – তাদের উত্তরাধিকার হয় ইলমের ক্ষেত্রে। যে ব্যক্তি এ (জ্ঞানের) উত্তরাধিকার হয় সে পূর্ণাঙ্গ উত্তরাধিকারী। (মুসনাদে আহমদ, তিরমিজী, আবু দাউদ, ইবনু মাযা, দারুমী মেশকাত)

আল্লাহতায়ালা যেরূপ অসীম, তার জ্ঞান যেভাবে অফুরন্ত – তাঁর প্রেরিত নবুয়তী জ্ঞানও তদ্রুপ অসীম ও অফুরন্ত। এ জ্ঞানের দিক, স্তর, পর্যায় সবই অসীম। তাই নবুয়তের পরিসমাপ্তির পর এ জ্ঞান থেকে যে যতটুকু আহরণ ও নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন তার উত্তরাধিকারও ততটুকু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে চৌদ্দশত বছরের ইতিহাসে যে সব ওয়ারিশে নবী ইন্দ্রিয়, বিবেক–বুদ্ধি ও ঐশী জ্ঞানের ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত মানে উন্নীত হয়ে ব্যক্তি, সমাজ, দেশ তথা মানব জাতির জন্য নমুনা, আদর্শ ও উদাহরণ হিসেবে প্রতিভাত হয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান তাপস যোগ্য ওয়ারিশে নবী ইমাম খোমেনী (রহঃ) ছিলেন তাদের অন্যতম।

আমরা যদি মহাগ্রন্থ আল কুরআনের গূঢ়রহস্য, তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে ইমামের জ্ঞানের গভীরতা যাচাই করতে চাই তাহলে তার তাফসীরে সূরায়ে হামদ (تفسير سورة حمد) নামক সূরা আল ফাতিহার তাফসীর গ্রন্থখানিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাঁর সারা জীবনের জ্ঞান সাধনা, শিক্ষকতা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিক নির্দেশনার মূলসূত্রই যে ছিল আল কুরআন এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এরপরও একজন কুরআন বিশারদ হিসেবে লওহেমাহফুজের এ নূরানী কুরআনের মহাসত্য উদ্‌ঘাটনে তাঁর জ্ঞানের স্তর যে কত উর্ধ্বে এ গ্রন্থ গভীরভাবে অধ্যয়নে তা সহজেই অনুমেয়। আল কুরআনকে বুঝার জন্য কমপক্ষে যে তের প্রকার জ্ঞানের গভীর পাণ্ডিত্য প্রয়োজন তার বাস্তব ও সফল প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় ইমামের এ গ্রন্থে। আল্লাহর নাম, তার হামদ, এ সৃষ্টির রহস্য, এর মাঝে আল্লাহ তায়ালার নূরের বিকাশ, ঈমানের মূলসূত্র, মানুষের অস্তিত্বের মূলের সন্ধান, স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে সম্পর্ক জ্ঞানের স্তর,

উপকারী ও অপকারী দিক, আল্লাহর দিকে ভ্রমণের (سیر الی الله) এর পথ ও পদ্ধতি, আত্মগঠন, আল্লাহর কাছে দোয়া করার দর্শন ও তাৎপর্য, কুরআনের মাহাত্ম্য, ভাষাগত মান, আধ্যাত্মিক সুউচ্চ স্তর ইত্যাদি এ গ্রন্থের অনন্যতা, অনস্বীকার্যতা, জ্ঞানগত মানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। কুরআন তিলাওয়াত, কুরআন নিয়েগবেষণা ছিল ইমামের দৈনন্দিন কাজের গুরুত্বপূর্ণ দিক। জীবন সায়াহ্নে হাসপাতালে অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতেও একদিকে সে লাইন চলছে অপরদিকে ইমাম কুরআন তিলাওয়াত করছেন। ইমামের কন্যা ফাতেমা তাবাতাবাই বর্ণনা করেন ঃ

یك دفعه نجف که بودم آقاچشمشان نا راحت شده بود
دکتر آمد چشمشان رادید وگفت که شما چند روز قرآن
نخوانید واستراحت کنید امام یکدفعه خندید وگفتند-
"دکتر من چشمم را برای قرآن خواندن می خواهم چه
فایده ای دارد اگر چشم داشته باشم وقران نخوانم ؟
شمایك کاری بکنید که من قرآن را بخوانم-
خانم فاطمه طباطبائی
حضور شماره ۳، صفحه- ۸٤

"নাজাফে অবস্থানকালে একবার ইমামের চোখে অসুখ দেখা দেয়। ডাক্তার এসে চোখ দেখলেন এবং বললেন, আপনি কয়েকদিন কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ রেখে বিশ্রাম করুন। ইমাম হেসে বললেন, ডাক্তার সাহেব আমি কুরআন তিলাওয়াত করার জন্যই চোখের আরোগ্য চাচ্ছি। চোখ আছে অথচ কুরআন তিলাওয়াত করতে পারব না এটা হতেই পারে না। আপনি এমন ব্যবস্থা নিন যাতে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারি। (হুজুর ম্যাগাজিন (৩), পৃষ্ঠা-৮৪)

ইলমে হাদিস (علم حدیث) এর ক্ষেত্রে ইমামের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের গভীরতা পরিদৃষ্ট হয় তার বিরচিত চেহেল হাদিস (چهل حدیث) গ্রন্থে। ১৩৫৮ হিজরীতে ইমাম এ গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। বিষয়বস্তু চয়ন, দর্শন, মানতিক (যুক্তিবিদ্যা) হেকমত (প্রায়োগিক জ্ঞান), এরফান (আধ্যাত্মিক) ব্যাখ্যা প্রদানে এ গ্রন্থের জুড়ি নেই। এ চল্লিশটি হাদিসের মাধ্যমে ঈমান - আত্মিক জিহাদ (جهاد نفس) লোক দেখানো ইবাদত (ریا) আত্মম্ভরিতা (عجب) গর্ব (کبر) হিংসা (حسد) দুনিয়াপ্রীতি

(حب الدنیا) রাগ (غضب) অন্ধবিশ্বাস (عصبیت محبوب) কপটতা (نفاق) প্রবৃত্তির দাসত্ব এবং অবাঞ্ছিত লোভের (هوای نفس وطول الامل) কুফল, প্রকৃতির (فطرت) উপর চলা, চিন্তা গবেষণা (تفکّر) আল্লাহর উপর নির্ভরতা (توکّل) আল্লাহর ভয় ও রহমতের আশার (خوف ورجا) সুফল মু'মিনদের পরীক্ষার ধরন (امتحان وازمائش مؤمنن) ধৈর্য (صبر) তওবা (توبه) আল্লাহর জিকিরের (ذکر خدا) শ্রেণী বিভাগ ও প্রয়োজনীয়তা, পরনিন্দার (غیبت) পরিণাম, নিষ্ঠা (اخلاص) কৃতজ্ঞতার (شکر) আবশ্যকতা, মৃত্যু থেকে পলায়নের পরিণতি (کراهت ازمرگ), জ্ঞান অন্বেষণকারীদের প্রকারভেদ (اصناف طالبان علم) জ্ঞানের প্রকারভেদ (اقسام علم) এক্ষেত্রে মানব ও জ্বীন শয়তানের কুমন্ত্রণা (وسواس) জ্ঞানের মাহাত্ম্য (فضیلت علم) ইবাদতে একাগ্রতার উপায়-উপকরণ

(عبادت وحضور قلب) ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর দিদারের পথ ও পন্থা (لقاءالله) হযরত আলী (রাঃ) প্রতি মহানবী (সঃ)-এর মানব চরিত্র গঠন সম্পর্কীয় একটি অনন্য অসিয়ত (وصیت حضرت رسول به حضرت امیر علیه السلام) কলবের প্রকারভেদ, (اقسام القلوب) রাসূল ও ইমামগণের মর্যাদা না বুঝার কুফল, লোভ-লালসার কুফল ইয়াকিন (یقین) ও রেজা (رضا) আল্লাহর সন্তুষ্টির সুউচ্চ মকাম, ওয়ারিশে নবী তথা বেলায়েতে ফকিহর নেতৃত্বের অনস্বীকার্যতা, আল্লাহর নিকট মু'মিনের স্থান, আল্লাহর মা'রেফত (معرفت حق تعالی) ভাল-মন্দের প্রকারভেদ এবং তৌহিদের হাকিকতের (حقیقت توحید) মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির দার্শনিক, যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। হাদিসের সনদের প্রতি ইমামের দৃষ্টি যে কত তীক্ষ্ণ ছিল তা চল্লিশটি হাদিসের গোটা সনদ বর্ণনার ধরন থেকে সহজেই অনুমেয়। এছাড়াও শরহে হাদিসে রাসূল জালুত, (شرح حدیث راس الجالوت) তার রচিত গ্রন্থাবলী ও বক্তৃতামালার সংকলন নিয়ে প্রকাশিত ৮৫টির অধিক গ্রন্থের বিভিন্ন বিষয়ে আলকাফী, বেহারুল আনওয়ার, সিহাহ সিত্তার উদ্ধৃতি ইলমে হাদিসে তার পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য বহন করে।

কুরআন ও হাদিসকে মন্থন করে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে যুগোপযোগী সমাধান পেশ করার ক্ষমতা অর্জন ওয়ারিশে নবীর

অন্যতম গুণ। স্থান, কাল, পাত্র, পরিবেশ, পরিস্থিতির আলোকে যিনি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমাধান পেশ করতে পারেন না – তার পক্ষে সব কিছু হওয়া সম্ভব কিন্তু ওয়ারিশে নবী হিসেবে পরিচয় দেয়া বা ইসলামী নেতৃত্ব গ্রহণ করা অসম্ভব। ইমাম খোমেনী (রহঃ) এক্ষেত্রে ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। ইরানের বিশ্ববিখ্যাত ফকিহ বা ধর্মতাত্ত্বিকগণ তাকে শুধু আয়াতুল্লাহ হিসেবেই গ্রহণ করেননি বরং ইলমে ফিকহের ক্ষেত্রে আয়াতুল্লাহ আল ওজমা বা গ্র্যাণ্ড আয়াতুল্লাহ হিসেবে মেনে নিয়েছেন।

এ বিষয়ে ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি বিষয় থেকে নিয়ে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তার ফতোয়া ছিল নবুয়তী ধারার ইসলামী বিপ্লব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম মোক্ষম হাতিয়ার।

ইসলামী নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তার ولايت فقيه গ্রন্থ, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ইবাদতের ক্ষেত্রে কিতাবুত তাহারাত (كتاب الطهارة) আল মাকাসিবুল মোহারিমা (المكاسب المحرمه) ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে কিতাবুল বাইয়ে (كتاب البيع) তাকালিদের গুরুত্ব সম্পর্কীয় (رسالة الاجتهاد والتقليد) রিসালাতুল ইজতিহাদ ওয়াত্ তাকলিদ, উছুলে ফিকহের ক্ষেত্রে তা'লিকাহ আলা কিফায়াতুল উসুল (تعليقه على كفاية الاصول) রেসালে দার মাওজায়ে ইলমে উসুল ر) (ساله در موضع علم اصول উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কীয় হাসিয়ে রেসালেয়ে এরছ, হজ্ব সম্পর্কীয় "মানাসিক ইয়া দাস্তুরে হজ্জ" (مناسك يا دستور حج) ফতোয়া সংকলন (استفتائات) তাউজিহুল মাসায়েল (توضيح المسائل) তাহরিরুল ওসিলা (تحرير الوسيله), যুবদাতুল আহকাম (زبدة الاحكام) নাইলুল আওতার ফি বয়ানে কায়েদায়ে লা দারারা ওয়া লা দেরারসহ

(نيل الاوطار فى بيان قاعدة لاضرر ولاضرر)

বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার লিখিত তাহজীবুল উসুল (تهذيب الاصول) গ্রন্থটি ইসলামী আইন শাস্ত্রের ক্ষেত্রে এক অনবদ্য গ্রন্থ। একজন মুফতির জন্য যেসব শর্ত অত্যাবশ্যকীয় যেমন ঃ

لا يحل له ان يفتى حتى يعرف احكام الكتاب والسنة والناسخ والمنسوخ

واقاويل العلماء والمتشابه ووجوه الاحكام، المفتى هو الماهر الذى اخذ العلم عن اهله وصارت له ملكة نفسانية ويميز الصحيح من غيره ويعلم المسائل وما يتعلق بها عل الوجه المعتمد- وينبغى ان يكون المفتى عدلاً موثوقا به فى عفافه وعقله وصلاحه-

قواعد الفقه-ادب المفتى-صفحه-٥٦٥، مفتى عميم الاحسان رح)

ফতোয়া দেয়া ঐ লোকের জন্যই বৈধ যিনি আল্লাহর কিতাব ও সুন্নতের আহকাম, নাসেখ, মানসুখ, আলেমদের বক্তব্য, মুতাশাবাহা (অস্পষ্ট বিষয়াদির জ্ঞান) আহকামের দিক-বিদিকের জ্ঞান রাখেন। মুফতী সে বিজ্ঞ ব্যক্তি যিনি বাঞ্ছিতমানের শিক্ষকের কাছে ইলম অর্জন করেছেন তার মধ্যে এক আত্মিক শক্তি সৃষ্টি হয়েছে যিনি সঠিক কোনটি তা নির্ণয় করতে সক্ষম, সমস্যাবলী জানেন, বুঝেন, সমস্যা সম্পর্কীয় আনুসাংগিক বিষয়াদি নির্ভরযোগ্য সূত্রে ও পর্যায়ে অবগত আছেন। মুফতী হবেন ন্যায়নিষ্ঠ, পুত্র পবিত্রতা, বিবেক-বুদ্ধির পরিপক্কতা ও যোগ্যতার ক্ষেত্রে সুদৃঢ়।

(মুফতী আমিনুল ইহছান বিরচিত
কাওয়ায়েদুলাফিকহ ও আদবুল মুফতী
গ্রন্থ - পৃষ্ঠ - ৫৬৫)

উল্লেখিত যোগ্যতার সাথে সাথে স্থান, কাল, পাত্র বুঝে সমস্যার সমাধান পেশ করা একজন মুফতীর কাজ। ইমাম খোমেনী (রহঃ) ছিলেন সমকালীন বিশ্বে সর্বজনগ্রাহ্য মুফতী, ফকিহ, জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তার ফতোয়া বিশেষ করে মুরতাদ সালমান রুশদীর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা এবং বিশ্ব মুসলিমের একচেটিয়া সমর্থন তারই প্রমাণ বহন করে। ইলমে ফিক্‌হ ছিল ইমামের কাছে অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

মাছিহ বরুজার্দী বর্ণনা করেন ঃ

يك بار از امام پر سيدم آقا شما كدام علم را بيشتر دوست داريد!
فرمودند من فقه را بيشتر دوست دارم- يكى از نزديكان گفت : آقا علم فقه كه چيزى ندارد! امام فرمودند- نخوانده اى تو!
او اظهار داشت نه ، آقا خوانده ا يم، امام فرمودند، پس نفهميده اى

একবার ইমামকে জিজ্ঞেস করলাম জনাব আপনি কোন ইলমকে ভালবাসেন? বললেন- আমি ফিক্‌হকে অধিকতর পছন্দ করি তার একজন সহচর বললেন ঃ জনাব

ইলমে ফিক্‌হে তেমন কিছু তো নেই। ইমাম বললেন- তুমি পড়নি। সে বলল, না জনাব পড়েছি। ইমাম বললেন- তাহলে বুঝনি।

হুজুর ম্যাগাজিন - ১ম খণ্ড

পৃষ্ঠা-৩৭

ইলমে ফিক্‌হ শুধু অতীতের ফতোয়া বা ইসলামী আইনসমূহের ধারা বর্ণনার মধ্যে সীমিত থাকলে সমকালীন পরিস্থিতিতে তার আবেদন কার্যকরি হয় না। এ জন্য ওয়ারিশে নবীর দায়িত্ব হল যেসব বিষয় ইসলামের মূল বুনিয়াদকে নড়বড়ে করে দেয় বা আল কুরআনের আইন বাস্তবায়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে তার যুগপোযোগী সমাধান পেশ করা। সাথে সাথে ওয়ারিশে নবীর সাইনবোর্ড লাগিয়ে যারা জালিম ও খোদাদ্রোহী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা বা সমর্থন অব্যাহত রেখেছে তাদের স্বরূপ উন্মোচন করা।

ইমাম খোমেনী (হরঃ) এ ক্ষেত্রে ছিলেন আপোষহীন ফকিহ। যার ফতোয়াসমূহ সত্যান্বেষী ওয়ারিশে নবীদের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। আর দালাল ও স্বার্থান্বেষী ফকিহ নামধারীদেরমুখে চুনকালি লেপন করেছ।

উদাহরণ স্বরূপ দুইটি ফতোয়ার প্রতি নজর দেয়া যাক ঃ-

اگر سکوت علماء اعلام موجب تقویت ظالم شود یاموجب

تایید او گردد یا موجب جرئت او شود برسا یر محرمات

واجب است اظهار حق وانکار باطل، اگرچه تأثیر فعلی نداشته باشد-

নেতৃস্থানীয় আলমদের নিরবতা যদি জালেমকে শক্তিশালী করে অথবা তার সমর্থনের কারণ হয় অথবা তার নিষিদ্ধ কাজ করতে স্পর্দা বেড়ে যায়- সে সময় সত্য প্রকাশ করা আর বাতিলকে অস্বীকার করা (আলেম সমাজের উপর) ওয়াজিব। যদিও এতে তক্ষণাৎ কোন প্রভাব না পড়ে।

তাফসীরে আফতাব- পৃষ্ঠা-১৫৩

মাসআলা নম্বর-২৭৯৫

জালেম সরকারের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী আলেমদের সম্পূর্ণ ত্যাগ করা ওয়াজিব। যেমন- ইমাম ফতোয়া দেন।-

اگر ارتباط علماء اعلام با ظلمه موجب تقویت انها شود، یا موجب

تبرئه انها پیش افرادبی اطلاع شود، یاموجب جرئت انها گردد یا موجب

هتك مقام علم شود- واجب است ترك ان- تفسير آفتاب - صفـ ١٥٤

জুলুমের সাথে নেতৃস্থানীয় আলেমদের সম্পর্ক যদি তাদের হাতকে শক্ত করে অথবা অজ্ঞ মানুষের সামনে (আলেমদের সম্পর্কের কারণে) জালেম শাহীর জুলুম বৈধ হয়ে যায় অথবা তাদের সাহস যোগায় অথবা ইলমের বেইজ্জতী হয় তাহলে এসব আলেমদের পরিহার করা ওয়াজিব।

ফতোয়া নম্বর-২৮১১

তাফসীরে আফতাব-পৃষ্ঠা-১৫৪

একটি জাতির দর্শন কি হবে এ মূলসূত্র ঠিক না হলে সে জাতি তার মূল ভিত্তিতে টিকে থাকতে পারে না। দর্শনের সূত্র জাতিসমূহের উত্থান-পতনের মূল চালিকাশক্তি। ইমাম খোমেনী (রহঃ) কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহের ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনের সাথে সাথে দর্শনের রাজপথে বিচরণ করেছেন। মোল্লা সাদরার "আসফার" (اسفار) গ্রন্থের সফল ব্যাখ্যাতা হিসেবে ইমাম খোমেনী কোমের সম্মানিত শিক্ষকদের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তার ব্যাখ্যা গ্রন্থ আল হাসিয়াতু আলাল আসফার (الحا شية على الاسفار) গ্রন্থ তারই সাক্ষ্য বহন করছে। রিসালাতু ফিত্তালাবে ওয়াল ইরাদা (رسالة فى الطلب والاراده) গ্রন্থে সমানভাবে দর্শন ও এরফানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করেছেন। বিশ্ববিখ্যাত আরেফ দার্শনিক হযরত মুহীউদ্দিন ইবনে আরাবির অন্যবদ্য গ্রন্থ ফুসসুল হেকাম (فصوص الحكم) ইসলামী দর্শনের ক্ষেত্রে এক অনন্য অবদান। এ গ্রন্থ বুঝার জন্য বহুমুখী জ্ঞানের প্রয়োজন। ইমাম খোমেনী এ গ্রন্থের টীকা লিখে দর্শনের ক্ষেত্রে তার জ্ঞানের গভীরতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তার এ টীকা গ্রন্থ আরবীতে লেখা এবং তালিকা আলা শরহে ফসুসিল হিকাম (تعليقه على شرح فصوص الحكم) নামে প্রকাশিত হয়েছে।

নবী রাসুলগণের গুণ ও দায়িত্বের চারটি অংশ। এর একটিও অনুপস্থিত থাকলে নবুয়তের দায়িত্ব পালন হয় না। যেমন ঘোষিত হয়েছে

هو الذى بعث فى الامّيين رسولا منهم يتلو عليهم ايته ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة - وان كانوا من قبل لف ضلال مبين-

তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাদের একজনকে রাসুলরূপে পাঠিয়েছেন যিনি তাদের নিকট তিলাওয়াত করে তার আয়াত তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব

ও হিকমত। ইতিপূর্বেতো এরা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে। (সূরা জুমু' আ-২)

ওয়ারিশে নবীর এ চারটি দায়িত্ব পালনের জন্য প্রথমে এ চারটিতে নিজেকে যোগ্য বলে প্রমাণ করতে হবে। তিলাওয়াতে কিতাব, তালিমে কিতাব ও তালিমে হিকমতের পর ওয়ারিশে নবীর অন্যতম গুণ হল নিজে তাযকিয়া অর্জন করা এবং অপরকেও পরিশুদ্ধ করা। কুরআনে বর্ণিত "ويزكيهم" তাদের পরিশুদ্ধ করে "নবুয়তের এ দায়িত্ব পালনের জন্য যে বিশাল জ্ঞানসমুদ্র ও কঠিন রিয়াজত সাধনার প্রয়োজন তাকেই বলা হয় ইরফান (عرفان) বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান। আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও ক্ষমতা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত নবীর ওয়ারিশ হওয়ার দাবি করার কোন সুযোগ নেই। এ জ্ঞানের বেশীর ভাগই গোপন এবং ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ক্রমধারা মোতাবেক এ পর্যন্ত চলে এসেছে। এ আধ্যাত্মিক শক্তি মানুষের ঈমান, ইয়াকিনকে করে সুদৃঢ়, আত্মিক প্রতিরোধ ক্ষমতা, নফস, শয়তান, মুনাফিক, কাফির, মুশারিকদের মোকাবিলায় জেহাদের ময়দানে মূল চালিকা শক্তিরূপে কাজ করে। ইমাম খোমেনী (রহঃ) শরীয়তের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, প্রশাসনিক অনন্য যোগ্যতার সাথে সাথে আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও সাধনায় ছিলেন বিরল ব্যক্তিত্ব।

তার লেখা লেকাউল্লাহ (لقاء الله) (আল্লাহর সাথে দিদার, সিররুস্‌সালাত নামাযের গূঢ়রহস্য, আল্লামা সদরুদ্দিন কৌণাভীর মিছবাহুল উন্‌স গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ- তা'লিকা আলা মিছবাহুল উন্‌স (تعليقه على مصباح الانس)

, দোয়াউস্‌সাহার (دعا السّحر) বা সেহরীর সময়কার দোয়া, বাদায়ে এশক (باده عشق) এশকের সুরা, রাহে এশক (راه عشق) এশকের পথ নামক আধ্যাত্মিক গজলসমূহ তাযকিয়ায়ে নফসের ক্ষেত্রে যোগ্য ওয়ারিশে নবী হিসেবে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

ইমাম খোমেনী (রহঃ) আলেম সমাজের নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, "বিপদগামী আলেম গোটা উম্মাতকেই গুমরাহ করতে পারে। আর সুদৃঢ় সুপথগামী উম্মতমানের চরিত্র সম্বলিত, নফস পরিশুদ্ধকারী ইসলামী নিয়মাবলী বাধ্যতামূলকভাবে পালনকারী আলেম গোটা উম্মাতকে সংশোধন করতে কল্যাণমুখী করতে ও পরিশুদ্ধ করতে সক্ষম হতে পারে।" (শিক্ষাংগনে নৈতিকতা পৃঃ ১৬)

অন্যত্র তিনি বলেনঃ

"বস্তুত" দীন নিয়ে ব্যবসা করা ও আমলহীন ইল্‌মই ঠিক সেই দুর্গন্ধ যার কারণে

জাহান্নামী লোকেরাও কষ্ট পাবে বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। আলেমে সূ অর্থাৎ খারাপ চরিত্রের আলেমগণ দুনিয়ায় যে সব খারাপ আমল করে তাই পরকালে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও কষ্টদায়ক দুর্গন্ধে পরিণত হবে। ব্যাপারটা এই নয় যে, সেখানে বাড়তি দুর্গন্ধ যোগ করার কারণে তা এমন দুঃসহ দুর্গন্ধে পরিণত হবে। সে কারণে জাহান্নামে অগ্নিদগ্ধ লোকগুলোও অধিক কষ্ট পেতে পারে না। তা কখনই হবে না। বে-আমল ও চরিত্রহীন আলেমের দুর্গন্ধ এই দুনিয়ায়ই তাদের সংগে যুক্ত হয়ে আছে। কিন্তু দুনিয়াবাসীদের ঘ্রাণ শক্তি তা অনুভব করতে পারে না।

আলেম যখন দুশ্চরিত্র হয় দিন-রাত শরীয়ত বিরোধী কাজের চিন্তায় মগ্ন থাকে তখন তার বিপদটা অত্যন্ত সাংঘাতিক হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষ সে রকমটা হয় না।" (শিক্ষাংগনে নৈতিকতা পৃঃ ১৮)

আলেম সমাজের উদ্দেশ্যে ইমাম বলেন, "হে পাগড়ীধারী ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত প্রশিক্ষিত ব্যক্তিগণ। মুসলিম জনতা তোমাদের প্রতি এই আশা পোষণ করে যে, তোমরা হিযবুল্লাহ-আল্লাহর দল হয়ে গড়ে উঠবে তোমরা দুনিয়ার চাকচিক্যে মত্ত হবে না। দুনিয়ার আনন্দ-ফূর্তির দিকে কিছুমাত্র আকৃষ্ট হবে না। তোমরা আল্লাহর কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর ব্যাপক প্রচার সাধনে তোমাদের পক্ষে যা কিছু এবং যত কিছু সম্ভব তা করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করবে না। তোমাদের লক্ষ্য নিবদ্ধ হবে একমাত্র আল্লাহর দিকে। তারই রেজামন্দী হাসিলের দিকে। তোমরা দুনিয়ার কোন মানুষের সন্তুষ্ট পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হবে না। সে যা-ই হোক না কেন এবং তার পরিণতি যা-ই হোক না কেন? [শিক্ষাংগনে নৈতিকতা-পৃষ্ঠা (৩৫)]

ইমাম খোমেনী (রহঃ) আলেম সমাজকে শুধুমাত্র নছিহতেই করেননি। বাস্তবজীবনে তার প্রজ্ঞা, আমল ও বাস্তব পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রকৃত আলেমে দ্বীনের দায়িত্ব কর্তব্য কি তার উদাহরণ রেখে গেছেন। এসব মৌলিক জ্ঞানের সাথে সাথে আনুষঙ্গিক জ্ঞানও ছিল তার প্রচুর।

চারিত্রিক বিজ্ঞান (علم الاخلاق) রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সমরবিদ্যা, ইবাদত সমূহের মূল দর্শন, ইসলামের ইতিহাসের সঠিক মূল্যায়ন, কুরআনে বর্ণিত হিকমত বা প্রায়োগিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একক সত্তা। সহিফায়ে নূর নামক (صحيفه نور) বিশ খন্ডে প্রকাশিত তার বক্তৃতা, বিবৃতি এবং রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ওসিয়তনামা (وصيت نامه) তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা, শিল্প নৈপুণ্য, ভাষা, সাহিত্য, দক্ষতা, বিচক্ষণতা নির্ভীকতার জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করছে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিপক্কতা, আমলের ক্ষেত্রে পূর্ণতা, সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অবিচল

থাকার শক্তি সাহস উপরন্তু শত্রু ও মিত্রের সঠিক পরিচয় তুলে ধরার অনন্য ক্ষমতা তাকে ইতিহাসের এক যুগান্তকারী বিপ্লবী ইমামের পদে আসীন করেছে যিনি জাতির ইমাম তার নেতৃত্ব দীন ও দুনিয়ার উভয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন ইমাম কাকে বলে তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মুফতী আমিমুল এহসান (রহঃ) লিখেছেন–

هو الذى له الرياسة العامة فى الدين والدنيا جميعًا–

'দীন ও দুনিয়ার সার্বিক গণ নেতৃত্বে যিনি থাকেন তিনিই ইমাম।' (কাওয়ায়েদুল ফিকহ–১৯০)

ইমাম খোমেনী (রহঃ) দীনি ও জাগতিক উভয় ক্ষেত্রে ছিলেন সফল ইমাম বা দীনি নেতা।

তার এ ব্যক্তিত্ব দেখেই মরহুম হাফেজ্জী হুজুর (রহঃ) ১৯৮২ সালের ইরান সফরে ইমামের সাথে সাক্ষাতের পর ১৪ই সেপ্টেম্বর কায়হান ইন্টারন্যাশনালের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন–"ইমাম খোমেনীকে আধ্যাত্মিক ধ্যান–নিমগ্ন অত্যন্ত পন্ডিত ব্যক্তি হিসেবে দেখেছি, যা আমাকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ঐতিহ্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।"

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত শিক্ষক অধ্যাপক হামিদ আলগার তাইতো বলেছিলেন–

"ইমাম খোমেনী ছিলেন কঠোর সংযমের মধ্যে জীবন যাপনকারী ব্যক্তি এবং তার জীবনে প্রশান্তি বিরাজমান ছিল। যথার্থ চিন্তা–চেতনা ও রাজনৈতিক বিবেচনার সমুদ্রে তিনি অবগাহন করছিলেন। এ ধরনের বৈশিষ্ট্য অন্য কোন বিপ্লবী ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায় না।"

কোমের প্রখ্যাত লেখক জাওয়াদ মোহদাসী ইমাম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন–

همچو تیغ می برید – همچون باران سیراب می کرد

همچو خو رشید گرمامی بخشید – همچو دریا ژرف بود وموّاج

همچو آئینه تصویر گر حقیقت بود –

তিনি ছিলেন ব্লেডের মত তীক্ষ্ণধার, বৃষ্টির মত তৃষ্ণা মিটাতেন, রবির মত উষ্ণতা দান করতেন। সমুদ্রের মত ছিলেন গভীর ও উত্তাল তরঙ্গের অধিকারী, দর্পণের মত যিনি ছিলেন মূল হাকিকতের রূপক। তাইতো ইরানের সমকালীন কবি আহমদ শরীয়তী লিখেছেন ঃ

انکه ز نجیر غلا مان بشکند از ره رسید

مرد حق بر خاست اری اینك از ایران ما

رهبری از نسل پاك سرور آزادگان

با مهابت پر صلابت نوح کشتیبان ما

انقلابی راکه در دل پرورندی سالها

اینك آ مد بارور در حیطه امکان ما-

দাসত্বের শৃংখল যিনি ভাঙবেন, পৌঁছে গেছেন

সত্যের পতাকাবাহী পুরুষ আগমন করেছেন

আমাদের ইরান ভূমি থেকে

পবিত্র বংশের একজন নেতা

মুক্তিকামীদের সরদার

তিনিতো ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠ নূহ

আমাদের জাহাজের নাবিক যে বিপ্লবকে বহুদিন ধরে লালন করছেন

তার হৃদয়ে

এখনই তার ফল ভোগ করার সময় এসেছে।

আল্লাহ আমাদের এদেশেও ইমামের মত নেতার আবির্ভাব ঘটিয়ে কুরআনের রাজ কায়েম করার সংগ্রামে শরীক হওয়ার তাওফিক দিন। আমিন।

গ্রন্থসূত্র

১। কুরআনুল কারীম

২। মুসনাদে ইমাম আহমদ (আরবী)

৩। তিরমিযী শরীফ (আরবী)

৪। মেশকাত শরীফ (আরবী)

৫। তাফসীরে সূরায়ে হামদ (ফার্সী)

৬। চেহেল হাদিস (ফার্সী)

৭। তাহরিরুল উসিলা (আরবী)

৮। বেলায়েতে ফকিহ (ফার্সী)

৯। আইনে সা'আদাত (ফার্সী)

১০। যিন্দিগীয়ে ইমাম খোমেনী (ফার্সী)

১১। দোয়াউস্ সাহার (ফার্সী)

১২। তাফসীরে আফতাব (ফার্সী)

১৩। হুজুর ম্যাগাজিন–১ম খন্ড (ফার্সী)

১৪। হুজুর ম্যাগাজিন–২য় খন্ড (ফার্সী)

১৫। হুজুর ম্যাগাজিন–৩য় খন্ড (ফার্সী)

১৬। ইমাম ও রুহানীয়ত (ফার্সী)

১৭। আলোর স্মারক (বাংলা)

১৮। হাজার বছরের বিস্ময় (বাংলা)

১৯। প্রেম ও প্রতিরোধের বাণী (বাংলা)

২০। কাওয়ায়েদুল ফিকহ (আরবী)

২১। আদবুল মুফতী (আরবী)

২২। শিক্ষাঙ্গনে নৈতিকতা (বাংলা)

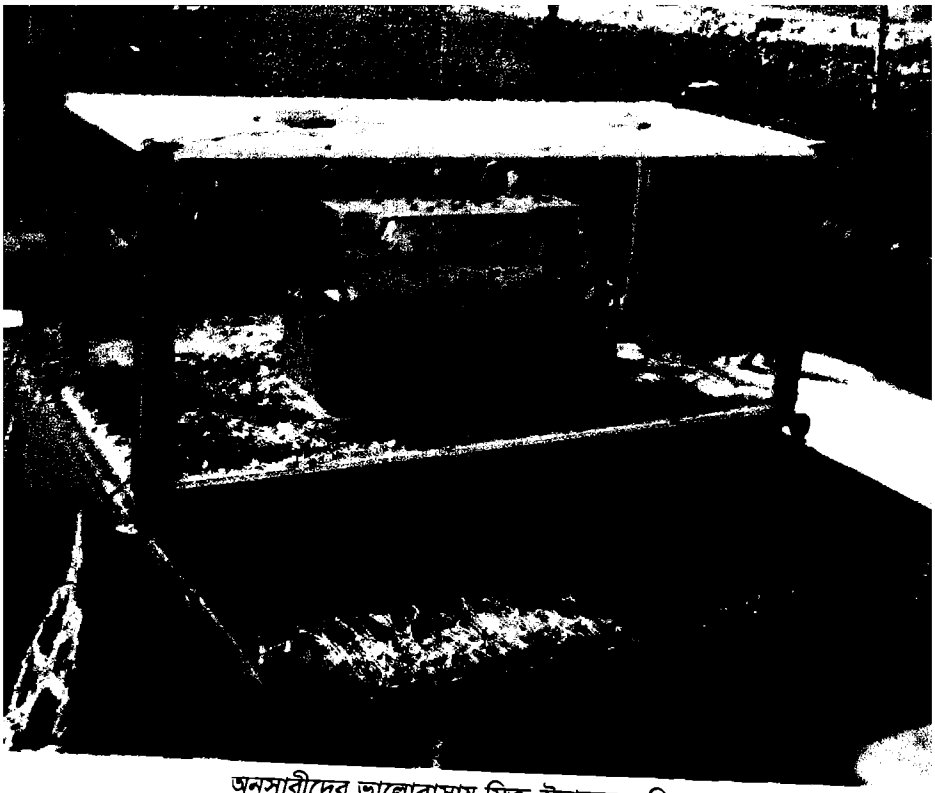

অনুসারীদের ভালোবাসায় সিক্ত ইমামের কফিন

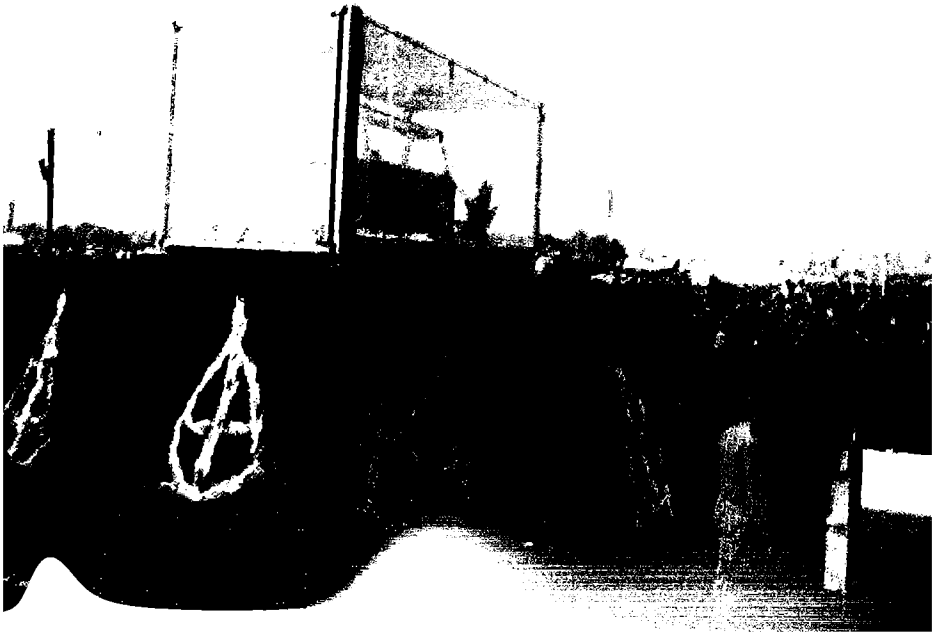

ইমাম খোমেনী (রহঃ) এবং নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা

সাজ্জাদ পারভেজ

যুগে যুগে বিশ্বের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ক্ষমতায় পরিবর্তন ও বিবর্তন এসেছে। সে পরিবর্তন কেবল ক্ষমতার হাত বদল নয় বরং সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক গতিধারা, অর্থনৈতিক পদ্ধতি, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ইত্যাদি সকল কিছুতে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দর্শন বা মতবাদ বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। একেক সভ্যতা বা সিস্টেম একেক সময়ে বিশ্বে তার আধিপত্য বজায় রেখেছে অর্থাৎ সময় ও সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে দুনিয়ার চিন্তা ও ক্ষমতার কর্তৃত্ব কেন্দ্র বদলে গেছে। যখন যে সভ্যতা বা যে অঞ্চলের মতবাদ বিশ্ব ইতিহাসের প্রবাহে নিয়ামক ভূমিকা পালনকারী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, তখনকার জন্যে সেই সভ্যতা বা মতবাদ বা সিস্টেমকে বিশ্ব ব্যবস্থা বা World Order বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে যুগে যে সিস্টেম বিশ্বের অধিকাংশ দেশ বা জনপদে চিন্তা, দর্শন বা শক্তিবলে ক্রিয়াশীল থেকেছে এবং বিশ্ববাসীকে কোন না কোনভাবে তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতির প্রভাবে প্রভাবিত করেছে, সাংস্কৃতিক চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের অনুগত করেছে সে যুগে সেই সিস্টেমই বিশ্ব ব্যবস্থার স্বীকৃতি বা মর্যাদা অর্জন করেছে। যেমন মহানবী (সাঃ) কর্তৃক ইসলামকে বিজয়ী সভ্যতা ও আদর্শ হিসাবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করে যাবার আগে রোমান, পারস্য ও গ্রীক সভ্যতা বিশ্ব রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাদের চিন্তা ও দখলদারিত্বের কর্তৃত্ব প্রায় সমগ্র বিশ্বকে তখন তাদের পদানত করে রেখেছে।

তারপর তাদের পতন ঘটিয়ে বিশ্বে ইসলাম আবির্ভূত হয়েছে খোদায়ী ব্যবস্থা হিসাবে। মহানবী (সাঃ)-এর নেতৃত্বে মরু আরবের বুক থেকে উৎসারিত হয়েছে ইসলামের বিশ্বজয়ী ব্যবস্থা। মহান স্রষ্টাপ্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাত্মক এ ব্যবস্থা মানবতাকে পুরনো সকল জুলুম, নির্যাতন এবং মিথ্যার কূপমণ্ডুকতা থেকে মুক্তি প্রদান করে। বিশ্ববাসী পরিচ্ছন্ন ও শাশ্বত এক জীবনব্যবস্থার সন্ধানপ্রাপ্ত হয়। মানবসভ্যতার ইতিহাস নতুন এক যুগে প্রবেশ করে। এ জীবন ব্যবস্থার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নিয়ে উনিশ শতক পর্যন্ত তেরশত বছর বিশ্বকে তথা বিশ্ব রাজনীতিকে স্বীয় বলয়ে ধরে রেখেছে।

লেখক ঃ প্রাবন্ধিক, কলামিষ্ট

কিন্তু মুসলিম রাজশক্তির আদর্শিক বিচ্যুতি ও বিকৃতি এবং নেতৃত্বের দুর্নীতি ও নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের রাজনৈতিক বিপর্যয় একসময় সমগ্র উম্মাহ্‌কে সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির অধীন করে ফেলে।

ইসলাম যখন বিশ্বব্যবস্থার নিয়ামক আদর্শ হিসাবে বিকশিত হয় তখনও আজকের ইউরোপ অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের যুগ পার হয়নি। তারপর ক্রুসেডের যুদ্ধে ইউরোপের সম্মিলিত খ্রীস্টান বাহিনী গাজী সালাউদ্দিনের হাতে পরাজয় বরণ করার পর থেকে পাশ্চাত্যের কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মুসলমান এবং ইসলামই হচ্ছে সমগ্র বিশ্বে ইউরোপীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। এ প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্যে তাদের সর্বাত্মক চেষ্টা ক্রমেই জোরদার করতে থাকে। তারপর মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃত্বের দেউলেপনা যখন চরম সংকটজনক পর্যায়ে উপনীত হয় তখন। উনিশ শতকের ১ম বিশ্বযুদ্ধে তুর্কী খেলাফতের পরাজয় পাশ্চাত্যকে বিশ্ব রাজনীতির নিয়ন্ত্রক ভূমিকায় সমাসীন করে। অবশ্য তার আগে ইউরোপে ঘটে যায় শিল্প বিপ্লব। পৃথিবী প্রত্যক্ষ করে ফরাসী বিপ্লব এবং রুশ বিপ্লব। পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদ দ্বিমাত্রিক বিশ্বব্যবস্থা হিসেবে উন্মেষ লাভ করে। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ মতাদর্শ হিসাবে দুনিয়ায় আধিপত্য অর্জন করে। শিল্প বিপ্লব ও ১ম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপের ধর্মহীন জাতীয়তাবাদী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনালগ্নেই পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ মুসলমানদেরকে চিরতরে হীনবল করে দেবার উদ্দেশ্যে সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়।

মুসলমানদেরকে তাদের ঐতিহ্যসূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। সেখানে পাশ্চাত্য চিন্তা ও মননে শিক্ষা-দীক্ষার পদ্ধতি চালু করে। ইসলামী সংস্কৃতির সফল মূল্যবোধের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করে। এমন ধ্যান-ধারণা উপস্থাপন করে যে, ইসলামও ধীরে ধীরে দশটি ধর্মের মত নিছক স্তব-স্তোত্র সম্বলিত একটি আচারসর্বস্ব ধর্ম। ধর্ম থেকে রাজনৈতিক চিন্তা ও মননকে সম্পূর্ণভাবে বিযুক্ত করে ফেলার চেষ্টা করা হতে থাকে। ধর্মীয় নেতৃত্বকে সর্বত্র সুকৌশলে পরজীবী বা নির্ভরশীল শ্রেণীতে রূপান্তরের চেষ্টা চলতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র দুনিয়ার সম্পদ লুট ও শোষণের জন্য সূক্ষ্ম কৌশল ও প্রক্রিয়া গড়ে তোলে। এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলিম জনপদগুলো চরম শোষণ ও লাঞ্ছনার মুখোমুখি হয়। পশ্চাদপদতা ও দারিদ্র্য তাদেরকে চরমভাবে গ্রাস করে।

পাশ্চাত্যের কর্তৃত্বে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে গোড়াতে সংস্থাপিত হয় বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, জার্মানী ও রাশিয়া। কিন্তু বর্ণবাদ, ইহুদীবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সায় পাশ্চাত্য নিজেই সংকটের ঘূর্ণাবর্তে জড়িয়ে পড়লো। হিটলার-কেন্দ্রিক ২য় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর মানচিত্র আবারো বদলে দিল। তারপর শক্তিকেন্দ্রের দ্বিকেন্দ্রিক বিকাশ বিশ শতকের কয়েকটি দশক বিশ্বব্যবস্থাকে

স্নায়ুযুদ্ধের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বে জড়িয়ে রাখে। প্রায় শতাব্দীকালের পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কর্তৃত্বে সমাজতন্ত্রবাদের চ্যালেঞ্জে বিশ্বকে দুটি শিবিরে বিভক্ত করে ফেলে।

অন্যদিকে উপনিবেশ কবলিত মুসলিম জনপদগুলো পাশ্চাত্যের ছত্রছায়ায় সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ধারায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মহীন জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে স্বাধীনতা অর্জনে ব্রতী হয়। পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও মননে লালিত নব্য এলিট শ্রেণীর একাংশ এই আদর্শ বিবর্জিত সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত এক ধরনের দুর্বল রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের কাজে নেতৃত্ব প্রদান করে।

কোথাও রাজা বাদশার নেতৃত্বে, কোথাও সেনানায়কদের কর্তৃত্বে, কোথাও স্বৈরতন্ত্র আর পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মিশ্রিত অবয়বে ধর্মহীন জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত জনপদগুলোর। এখান থেকে দুটি সত্য খুব সহজে বেরিয়ে আসে। প্রথমতঃ মুসলিম রাষ্ট্রগুলো ইসলামবিহীনভাবে স্বীয় আদর্শ ও ঐতিহ্য বিস্মৃত হয়ে নামকাওয়াস্তে স্বাধীনতা গ্রহণ করে। বৈশ্বিক রাজনীতিতে তাদের অবস্থান ছিল নেহায়েতই আনুগত্যের এবং আত্মসমর্পণমুখী। পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদ ইত্যাদি কোন এক পক্ষ অবলম্বনের তাৎপর্যহীন মেরুকরণে যেতে সময় অতিক্রম করেছে তারা। ইসলামী আদর্শবাদকে বাস্তবায়নের কোন শিক্ষা বা চেতনায় তারা সম্পৃক্ত হতে পারেনি। বরং ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে উপনিবেশ যুগ হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত আলেম সমাজ ও ধর্মীয় শ্রেণী যে যেখানে যতটুকু উদ্যোগ নিয়েছে সেখানেই তাদের উপর চড়াও হয়েছে ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং নব্য জাহেলী মুসলিম শাসকগোষ্ঠী। ঔপনিবেশিক জুলুম ও শাসনের বিপর্যস্ততায় শতধা বিভক্ত মুসলিম উম্মাহ ও আদর্শচ্যুত মুসলিম নেতৃত্বের পক্ষে সমন্বিতভাবে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগ আর হয়নি বলতে হয়। তাদের জাতীয়তাবাদী উত্থান প্রকৃত আদর্শবাদের পুনঃজাগরণকে বরং ব্যাহতই করে। ইখওয়ান ও জামায়াতের নেতৃত্বে আদর্শভিত্তিক বৈপ্লবিক উত্থান প্রয়াস নানা সীমাবদ্ধতায় দুর্বল হয়ে যায়। এমনি প্রেক্ষাপটে ইরানে আয়াতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ্ আল মুসাভী আল খোমেনী শাহের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি বিশাল গণক্ষোভকে পুঁজি করে সেখানে একটি বিপ্লব সংঘটিত করেন এবং বিশ শতকে সর্বপ্রথম কোন একটি জনপদে একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার দিগ্বিজয়ী কৃতিত্ব অর্জন করেন। ইসলামকে অবলম্বন করে একটি সফল সর্বাত্মক বিপ্লব কার্যকর করার মহান সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে তিনি বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন।

ভাগ্যাহত নিপীড়িত মুসলিম জনপদগুলোতে যখন কোন সুষ্ঠু আইন বিধানের

অনুসরণ বা জনমতের ভিত্তি ছাড়াই শাসন ক্ষমতার দাপট চলছিল, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও আদর্শিক সংহতির সম্ভাবনা ছিল যখন সুদূর পরাহত, ওআইসি, জাতিসংঘ, আরবলীগসহ কেউই যখন মুসলিম তথা মজলুম মানুষের পাশে কাতারবন্দী হবার সামর্থ্য খুঁজে পায়নি, ইসলামী পুনঃজাগরণ সম্পর্কে কোন আশাবাদ যখন পর্যন্ত উচ্চকিত হতে পারছিল না, তেমনি এক গাঢ় অন্ধকার সময়ে ইমাম খোমেনী গোটা বিশ্বকে ধূমকেতুর মত করে চমকে দিয়ে ইরানে কায়েম করেছেন একটি ইসলামী সরকার। তিনশত বছরের পাহলভী শাসন এবং প্রাচীন রাজতন্ত্রের শেকড় উপড়ে সেখানে তিনি রাসুল (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদা অনুসৃত ইসলামের নীতিমালা ও বিধি-বিধানের আলোকে যুগোপযোগী একটি কাঠামোতে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সংস্থাপিত করেছেন।

ইমাম খোমেনীর এ বৈপ্লবিক সাফল্যের মধ্য দিয়ে কয়েকটি বিশাল লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। তাই যুগান্তকারী এই বিপ্লবকে গভীরভাবে অধ্যয়ন ও অনুধাবনের আবশ্যকতা রয়েছে।

ইমাম খোমেনীর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ধর্মকে ভিত্তি করে আন্দোলন, রাষ্ট্র কাঠামো, সরকার পদ্ধতি, সমাজ প্রবণতা, সবই দাঁড়াতে পারে। ইসলাম একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে পুনঃ আত্মপ্রকাশের মত যথেষ্ট শক্তিশালী একটি আদর্শ ও সিস্টেম। ইসলামের প্রায়োগিক উপযোগিতা ফুরিয়ে যায়নি বা সেকেলে হয়ে যায়নি। বরং আদর্শগতভাবে ইসলামের অভ্যন্তরীণ নৈতিক শক্তির মান যথেষ্ট উন্নত এবং উপযুক্ত নেতৃত্ব ও পারিপার্শ্বিক আনুকূল্য পেলেই ইসলাম পুনশ্চ বিজয়ী ও গ্রহণযোগ্য আদর্শ হিসাবে স্বীকৃতি অর্জনে সক্ষম।

ইরানে ইসলামী বিপ্লব পৃথিবীতে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার সন্ধান দিয়েছে। দুনিয়ার নির্যাতিত নিপীড়িত জনপদগুলোকে এই বিপ্লব একটি নিখাদ সত্য পৌঁছিয়ে দিয়েছে। তাহ'ল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা। ইরানের বিপ্লবের ফলে সেদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই আমেরিকাকে বিশ্বের নির্যাতিত মজলুম মানুষের শত্রু বলে জেনেছে। মজলুম দুনিয়ার আন্দোলনগুলোকে সাফল্য পেতে হলে সাম্রাজ্যবাদকে প্রকৃত ও প্রধান শত্রু হিসাবে প্রতিপন্ন করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। বুঝতে হবে যে, সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা বন্ধুবেশে মানবতার ও উন্নতির গালগল্প শোনালেও সার্বভৌমত্বের প্রকৃত লুণ্ঠনকারী হচ্ছে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ। সাহায্যের গমের বিনিময়ে সে দরিদ্র জনপদের মানুষকে নিজের বাজার বানায়। তাদের উপর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সকল উপায়েই খবরদারী চালায়। গরীব দেশগুলো স্বীয় জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে স্বীয় সম্পদ ও মেধার স্বাধীন ও কার্যকর ব্যবহার করতে সাহসী হতে পারে না। তাদেরকে কোন না কোনভাবে আমেরিকার তাঁবেদারী ও আনুগত্য করেই

চলতে হয়। বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, ছোট ছোট দেশগুলোকে স্বাধীন কোন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যেতে হলে আমেরিকা বা রাশিয়ার তাঁবেদারীর শৃংখল ভেঙেই অগ্রসর হতে হবে। আর এই শৃংখলকে অস্বীকার করে এগুনো খুবই দুরূহ। খোমেনীর নেতৃত্বে বিপ্লব আরও যে সব শিক্ষাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করে সেগুলো হ'ল, মুসলিম দেশ ও জনপদসমূহে সম্পদ এবং গণ-আকাংখার অতুলনীয় সম্ভাবনা রয়েছে। গণশক্তিকে যথার্থ রাস্তায় উদ্দীপ্ত করা গেলে অস্ত্রের শক্তির চাইতে অনেক বেশী মহীয়ান শক্তি হিসাবে তা বিস্ফোরিত হতে পারে। সব কিছুকে লণ্ড ভণ্ড করে নতুন কিছু গড়ার শক্তিও তার আছে। প্রয়োজন কেবল বলিষ্ঠ ও আপোষহীন নেতৃত্ব এবং সর্বোত্তম ত্যাগ স্বীকারের যথার্থ মানসিকতা। একই সাথে এও প্রণিধানযোগ্য যে, ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ কাঠামো পুনর্বিন্যাস করতে হলে উন্নত নৈতিকমান ও আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণ ঘটানো আবশ্যক।

অর্থাৎ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, উন্নত নৈতিক মান ও আধ্যাত্মিকচেতনা সমৃদ্ধ শিক্ষা, গণভিত্তি, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা, ত্যাগী কর্মীবাহিনী প্রভৃতির যথাযথ সমন্বয় ঘটলে মুসলিম উম্মাহ্‌র পক্ষে ঐক্য ও আদর্শের পথে অভিযাত্রায় কামিয়াব হওয়া অসম্ভব নয়।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ক্ষোভকে জোরদার এবং সক্রিয় করার পাশাপাশি ইমাম খোমেনী স্বীয় জাতিকে শিখিয়েছেন, "পূর্ব নয় পশ্চিম নয় ইসলামই উৎকৃষ্ট" "শিয়া নই, সুন্নী নই, আমরা সবাই মুসলমান।" সকল কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে খোদার বিধানের আনুগত্য এবং ঈমান ও আদর্শের ভিত্তিতে মানুষদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে যে সমাজ ও জীবন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে সেটাই হচ্ছে উন্নত এবং শ্রেষ্ঠ। ইমাম খোমেনী এই বোধ এবং চেতনার স্পন্দন জাগিয়েছেন উম্মাহ্‌র মধ্যে। আগামী দিনের বিশ্ব সভ্যতার বিনির্মাণে ইসলামের রাজনৈতিক উত্থান সম্ভাবনাকে তিনি এইভাবে বলিষ্ঠ করেছেন।

ইরানে শাহ্‌কে উৎখাত করে ইমাম খোমেনী সেখানে খোদার বিধান ইসলামকে রূপায়ণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে জনগণের ভোটাধিকার, নেতৃত্ব বাছাই-এ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ইত্যাদি অনুসরণ করেছেন। স্বীয় ঘোষণায় ইরানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র বানাননি। গণভোটের মাধ্যমে ইসলামের পক্ষে জনগণের রায় নিয়েছেন। জাতিকে ইসলামের নীতিমালার আলোকে একটি অভূতপূর্ব সংবিধান উপহার দিয়েছেন। জনগণের ইচ্ছা ও পছন্দের গুরুত্বকে মেনে নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি ইসলামের যথার্থ অনুসৃতির স্বার্থে অভিভাবক পরিষদ, বিশেষজ্ঞ পরিষদ, প্রভৃতির প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দিয়ে ক্ষমতার বিভাজন ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থাকে একটি অনুপম অনুসরণীয় স্ট্যান্ডার্ডে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস করা, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মানুষের সকল মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা, ঐশী বিধানের আলোকে বিচার ফায়ছালার ব্যবস্থা করা, স্বৈরতন্ত্রের উত্তরাধিকার হিসাবে প্রাপ্ত সকল আইন সংশোধন ও সংস্কার করা, শরীয়তের দণ্ডবিধি চালু করা এবং সর্বোপরি সুদ, ঘুষ, জুয়া, মদ, ব্যাভিচার প্রভৃতি জুলুম ও শোষণের সকল পথ চিরতরে বন্ধ ঘোষণার মাধ্যমে সমাজে সাম্য ও ন্যায় বিচার কায়েম করার ব্যবস্থা করেছেন খোমেনী। ইসলামী আদর্শের আদলে শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ঢেলে সাজানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইমাম খোমেনীর এ সকল সংস্কারমূলক পদক্ষেপ ও ভূমিকা বিশ্ববাসীকে ইসলামী মডেলের একটি সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আগ্রহান্বিত করেছে।

এমন একটি রাজনৈতিক সিস্টেমের তিনি উদ্ভাবন করেছেন যেখানে নিজে সরকার প্রধান হননি অথচ ধর্মীয় নেতৃত্বের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা সংস্থাপিত হয়েছে। সমগ্র জাতিকে সার্বক্ষণিকভাবে আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের প্রেরণা ও বন্ধনে আদর্শিকভাবে সংহত শৃংখলায় উদ্বুদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

খোমেনী (রহঃ) ইসলামী ইরানের নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর ইরানের সরকার ও ধর্মীয় সংস্থা উভয় মাধ্যমে দেশে দেশে ইসলাম, কোরআন এবং ইসলামী বিপ্লবের বার্তা পৌছিয়ে দেবার কার্যক্রম শুরু করেন। মুসলমানদের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যার ওপর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনার আয়োজন করা, ইসলামী বিপ্লবের ভাবধারাপুষ্ট বই-পুস্তক পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা, ফিলিস্তিন, লেবানন প্রভৃতি বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা নিরসনে ইসলামী সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরা, জাতিসংঘসহ সকল আন্তর্জাতিক ফোরামে মুসলিম দেশ ও জনপদসমূহের স্বার্থকে তুলে ধরে বক্তব্য উপস্থাপন করা, ইরানের ধর্মীয় নেতাদের বিভিন্ন দেশ সফর করা প্রভৃতি মাধ্যমে বিপ্লবের চেতনাকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেবার জন্যে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেবার দিকনির্দেশনা রেখে গেছেন ইমাম খোমেনী। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে তিনি ইরানের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রচারকেন্দ্র খোলার নির্দেশ দেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে ইরান সফরের সুযোগ করে দেবার ব্যবস্থা করেন।

ইমাম খোমেনী তার বিস্ময়কর বিপ্লবী সাফল্য অর্জনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে যখন আগামী দিনের পৃথিবী বিনির্মাণে নতুন স্পৃহা ও প্রেরণার সঞ্জিবনী প্রদান করছিলেন তখন দুনিয়ায় ঘটে গেছে আর এক মহাপ্রলয়। সমাজতন্ত্রবাদ তার অভ্যন্তরীণ সংকটাবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে তাসের ঘরের মত উড়ে গেছে। কোন প্রকার সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রতিরোধ ছাড়াই সমগ্র বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করে মাত্র এক বছরের ব্যবধানে চৌচির হয়ে ভেঙে পড়েছে সমাজতান্ত্রিক পরাশক্তি রাশিয়া এবং তার অনুগত সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব। ফলে বিশ্ব এখন স্নায়ুযুদ্ধের দ্বিমাত্রিক টানা-পোড়েন থেকে

অধিকতর ভারসাম্যহীন এক টালমাটাল অবস্থায় আপতিত। সমগ্র বিশ্বে এখন আমেরিকার একক পরাক্রম। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, জাতিসংঘ, ন্যাটো ইত্যাদি সব সংস্থাই এখন আমেরিকার ইচ্ছা, পছন্দ ও পরিকল্পনার ছকে বাঁধা। বিশ্ব রাজনীতি, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রবাহ, যুদ্ধ বিগ্রহ, মীমাংসা নিষ্পত্তি সবই এখন সর্বাত্মকভাবে আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে। একক নিয়ন্ত্রণের এই ক্ষমতা আমেরিকাকে করে তুলেছে বেশী মাত্রায় অহংকারী এবং দুর্বিনীত। জাতিসংঘ কোন্ প্রস্তাব পাশ করবে, কোন্ বিষয় আলোচনা করবে, কোথায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠাবে, কোথায় জাতিসংঘ সাহায্য বন্ধ রাখবে, কাদের পারমাণবিক স্থাপনা থাকতে পারবে, কাদের আণবিক কর্মসূচী থাকতে পারবে না, কারা সাহায্য পাবে, কে সাহায্য পাবে না, কারা কতটুকু ব্যবসা করতে পারবে, কারা ব্যবসা পাবে না, কারা কোন্ অস্ত্র কিনতে পারবে, কাদের সরকার কোন্ নীতি অবলম্বন করবে, বিশ্বের কোথায় কি ঘাঁটি থাকবে, যুদ্ধ চলবে অথবা বন্ধ হবে, চুক্তি স্বাক্ষর হবে অথবা আলোচনা অব্যাহত থাকবে ইত্যাদি সকল রকম ক্রিয়াকর্ম ও সিদ্ধান্ত এখন আমেরিকার মর্জির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ফলে বিদ্যমান বৈশ্বিক রাজনীতিকে আমেরিকার একক পরাক্রমের বিশ্ব ব্যবস্থা বললে মোটেই অত্যুক্তি হয় না। একক আধিপত্য ও মর্জির রাজত্বের কারণে শান্তি ও স্থিতিশীলতায় এখন কাঠামোগতভাবে ভারসাম্যহীনতা ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে। একক শক্তির পরাক্রমকে চ্যালেঞ্জ করবার, প্রতিবাদ করবার বা অস্বীকার করবার এখন কেউ নেই। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই অন্তর্নিহিত দুর্বলতা দুটি সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে। সেই দ্বৈত সম্ভাবনার প্রথমটি হচ্ছে, শূন্যতা পূরণে বিশ্ব রাজনীতির নাট্যমঞ্চে নতুন কোন শক্তির আবির্ভাব হওয়ার সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনাটি অত্যন্ত বেশী ঘনীভূত হয়েছে দুটিভাবে। বাস্তবতা হচ্ছে যে, দীর্ঘদিন পৃথিবীতে ভারসাম্যহীন নৈরাজ্য জারী থাকতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে নতুন কোন আদর্শ বিশ্ব সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুতে সমাসীন হবার চ্যালেঞ্জ নিয়ে আবির্ভূত হবেই। কেননা, পুঁজিবাদ তার বিকাশের এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, এর পতনেরও আর বাকী নেই। যে কোন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব কোন দৃপ্তশক্তি নিয়ে আবির্ভূত হলেই বিশ্ববাসী তাকে লুফে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। ইমাম খোমেনী (রহঃ) বিশ্ববাসীকে নতুন করে আগামী সভ্যতার নিয়ামক সেই আদর্শের সন্ধান দিয়ে গেছেন। মুসলিম জাতিসমূহ ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে উম্মাহ্‌কে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে এগিয়ে এলেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে দেউলিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার দেয়ালে ধস্ নামতে বাধ্য। নিছক বস্তুগত উৎকর্ষ তাদেরকে আর নেতৃত্বের আসনে সমাসীন রাখতে পারবে না। কেননা তাদের ভোগবাদী খেয়াল তাদের অকর্মণ্য করে তুলছে। এশিয়া ও আফ্রিকার অর্থনৈতিক চেহারা দ্রুতই বদলাতে থাকবে এবং মুসলিম বিশ্বের আদর্শিক পুনর্জাগরণ

সমগ্র দুনিয়ার কর্তৃত্ব ভারকেন্দ্রে একটি দর্শনীয় প্রতিস্থাপন সংগঠিত হওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যাবে। ইসলামই যে, বিদ্যমান শূন্যতা পূরণের একমাত্র বিকল্প ইমাম খোমেনী তা স্পষ্ট করে গেছেন। মিশর, আলজেরিয়া, মালয়েশিয়া, কাশ্মীর, সুদান প্রভৃতি দেশে ইসলামের পক্ষে জনগণের ঐতিহাসিক সমর্থন ও সক্রিয়তা থেকে বিশ্বব্যাপী ইসলামের পক্ষে গণজাগরণকে অবশ্যম্ভাবী বলে ধারণার প্রতীতি জন্মে। কেননা, ইমাম খোমেনী খুবই উপযুক্ত সময়ে ইতিহাসের একটি মূল্যবান মুহূর্তে বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছেন যে, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের বলিষ্ঠ আওয়াজ কিভাবে সফল হতে পারে। নৈতিক দেউলিয়াত্ব নিরসন, মানবাধিকারের যথাযথ স্বীকৃতি এবং বিশ্বব্যাপী জুলুম প্রতিরোধে ইসলামের চাইতে ঋজু ও শাণিত বক্তব্য উপস্থাপনে আর কেউ পারঙ্গম নয়।

ইমাম খোমেনী আল কুদস দিবস পালনের ঘোষণা দিয়ে, ইনতিফাদার পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে, হজ্জের অনষ্ঠানকে বিশ্ব মুসলিম সংহতির চেতনা সংগঠনে কাজে লাগানোর কর্মকৌশল উদ্ভাবন করে, ঘৃণ্য সালমান রুশদীর মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে খোদায়ী সংস্কৃতির বিরোধিতাকারীদের মুখোশ উন্মোচনের দ্বারা; সর্বোপরি, বিশ্ব মুসলিমকে ইসলামী বিপ্লবের আহবান জানিয়ে নিজেকে আগামী ইতিহাসের রূপকারের পর্যায়ে অধিষ্ঠিত করে গেছেন। ইমাম খোমেনীর কাছে সর্বাত্মকভাবে পরাস্ত হবার পর ইউরোপ এবং আমেরিকা এখন দুনিয়ার সর্বত্র ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর চড়াও হয়েছে। যে কারণে আজ সমগ্র দুনিয়ার দিকে তাকালে দেখা যাবে যে খ্রীস্টান ও ইয়াহুদী শক্তি সর্বত্র মুসলিম শক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য স্ব স্ব শক্তি ও সম্পদ পূর্ণাঙ্গভাবে নিয়োজিত করেছে। সারা পৃথিবীর যেখানেই এখন জীবন ও রক্তক্ষয় হচ্ছে সেই জীবননাশ ও রক্তক্ষয় অভিযান চলছে মুসলমানের বিরুদ্ধে। বসনিয়া, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, সোমালিয়া, রুয়ান্ডা, আফগানিস্তান, ইয়েমেন, ইরাক সর্বত্রই এটা সত্য। একইভাবে বাস্তবতা এই সত্যই ঘোষণা করছে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তরে আজকে যারা উদ্বাস্তু বা শরণার্থী তারা হচ্ছে মুসলমান। আবার দারিদ্র, জুলুম ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আজ পৃথিবীর কন্দরে কন্দরে যে লড়াই, সেই লড়াইতে জালিমের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে সংগ্রামে নিয়োজিত জনপদগুলোর অধিকাংশই মুসলিম অধ্যুষিত। অর্থাৎ আজকের ভারসাম্যহীন ভোগবাদী বিশ্বব্যবস্থার স্থলে আদর্শবাদী নতুন ইসলামী বিশ্বব্যবস্থার জন্যে বিশ্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। ইমাম খোমেনী বিশ্বকে এই প্রস্তুতির পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি বিশ্ববাসীকে বলেছেন যে, ইন্‌সাফপূর্ণ একটি বিশ্বব্যবস্থা গড়তে হলে আমেরিকার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই করতে হবে। তিনি বিশ্ববাসীকে এও জানান দিয়েছেন যে, ইন্‌সাফ কায়েমের লড়াইতে মজলুমকে ইসলাম অবলম্বন করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের ঠিক পূর্বে

গরবাচেভকে ইসলামের দাওয়াত দেবার মাধ্যমে ইমাম খোমেনী পতিত দুনিয়াকে মুক্তির রাজপথের সন্ধান দিয়েছেন। একদিকে পতনোন্মুখ পুঁজিবাদী আমেরিকার সাথে লড়াই করে এগুবার আবশ্যকতাকে তিনি তুলে ধরেছেন। আবার অপরদিকে মজলুম দুনিয়া কোন্ আদর্শকে আঁকড়ে ধরলে প্রকৃত মুক্তির পথ পাবে তাও তিনি দেখিয়েছেন। সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহকে যথার্থ কার্যধারা অবলম্বনেরও দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন।

বৈশ্বিক রাজনীতির বর্তমান প্রবণতা দ্বিতীয় যে সম্ভাবনাকে তুলে ধরে তা হচ্ছে পুঁজিবাদী বিশ্বের জনগণ কর্তৃক ইসলামকে বরণ করে নেয়ার সম্ভাবনা। ইরানে অতি সংক্ষিপ্ত সময়ে ইসলামের বিস্ময়কর বিজয়, আলজেরিয়ায় ইসলামের বিজয় প্রতিরোধে সাম্রাজ্যবাদী মদদে সামরিকজান্তার আগ্রাসন, রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের বিদায়, ইসরাইলে ইনতিফাদা উত্থানের কাছে ইয়াহুদী বর্ণবাদীদের নৈতিক আত্মসমর্পণ, মিশরে ইসলামপন্থীদের উপর সীমাহীন নির্যাতন, সোমালিয়ায় মার্কিনীদের অপমানজনক পিছু হটা এবং বসনিয়া, কাশ্মীর প্রভৃতি নিয়ে ইউরোপ, আমেরিকার প্রতারণামূলক আচরণ ও শতাব্দীর জঘন্যতম ঘৃণ্য আগ্রাসন সত্ত্বেও প্রতিরোধের ব্যূহ ক্রমেই দৃঢ়তর হওয়া ইত্যাদি থেকে এটা ভাবতে কোনই কষ্ট হয় না যে, পাশ্চাত্য ও আমেরিকার শাসককুলের প্রতি তাদের জনগোষ্ঠীর আস্থা নিঃশেষ হতে শুরু করেছে। বিশ্বব্যাপী চেতনার মিনারে পরিবর্তনের আবাহন সূচিত হয়েছে।

ইসলাম হবে আগামী বিশ্ব সভ্যতার নিয়ামক অবলম্বন। মানুষের উপর মানুষের কোন আধিপত্য থাকবে না। মানবীয় কর্তৃত্বের ধারণার পরিবর্তে খোদার সার্বভৌমত্ব এবং মানুষের প্রতিনিধিত্বের ধারণা হবে মানুষের বিশ্বাস ও বোধ। সম্পদের সুষম বন্টন ও মৌলিক মানবীয় অধিকারের গ্যারান্টি দেবে সরকার এবং সমাজ। সালাত ও জাকাত ভিত্তিক পরিবার আশ্রয়ী সাম্য ও মর্যাদার চেতনা হবে সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জাতিসংঘ তখন আর ভেটোওয়ালাদের ক্লাব বা সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক থাকবে না। বরং তা হবে নির্যাতিত বিশ্ববাসীর প্লাটফরম। অসম্ভব নয় যে, আমেরিকার দাপট রাশিয়ার মতই দ্রুত ভেঙে পড়বে আর তখন বিশ্ব রাজনীতিতে ক্ষমতার পরিবর্তে আদর্শিক মেরুকরণ পৃথিবীর সভ্যতায় নতুন মাত্রা যোগ করবে। গড়ে উঠবে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা। সেই বিশ্ব ব্যবস্থা হবে খোদায়ী বিধানের আলোকে ইসলামী আদর্শবাদকে অবলম্বন করে পরিচালিত। আদর্শভিত্তিক কল্যাণ রাষ্ট্রগুলোর গণচেতনা থাকবে সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ বিরোধী। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক শক্তির সমন্বয়ে গড়ে উঠবে সমাজ ও নেতৃত্ব কাঠামো। নির্যাতিত মজলুম মানুষের ঐক্য ও প্রতিরোধ স্বৈরতন্ত্র ও জালেমের ভিত্‌কে কাঁপিয়ে দেবে। যেমন করে খোমেনীর আহবানে খান খান হয়ে ভেঙ্গে গেছে শাহের স্বৈরতন্ত্র এবং কায়েম হয়েছে গণ মানুষের

পছন্দ ভিত্তিক সরকার ও শাসন ব্যবস্থা।

বস্তুতঃ ইমাম খোমেনীই হচ্ছেন ইতিহাসের সেই মহানায়ক যিনি ভবিষ্যত দুনিয়ার জন্যে ইসলামকে নতুন করে সংস্থাপন করে গেছেন যেই বীজ মহীরুহে পরিণত হতে আর বেশী বাকী নেই।

বিশ শতকের পৃথিবী পুঁজিবাদী সভ্যতাকে পতনের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে হাজির করেছে প্রায়। পরিবার প্রথা ধ্বংস করে, সমাজের যৌন শৃংখলাকে ভেঙে দিয়ে, ধর্ম বিবর্জিত ভোগবাদী উল্লাসে মত্ত হয়ে মাদক, এইড্‌স আর অস্ত্রের যূপকাষ্ঠে আত্মাহুতি দেবার যজ্ঞে মেতেছে ওরা। ঐ ধ্বংসযজ্ঞ শেষে একুশ শতকের পৃথিবী ইসলামকে বরণ করবে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা হিসাবে। বিশ শতকের মহা আলোড়ন সৃষ্টিকারী নেতৃত্ব ইমাম খোমেনী বিশ্বমানবতাকে সেই নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা–ইসলামের শান্তি ও মুক্তির বার্তা পৌঁছে দিয়ে গেছেন, দিয়ে গেছেন বিপ্লবের সঞ্জীবনী মন্ত্র।

ইমাম খোমেনী (রহঃ)—এর সফলতার কারণ

জহির উদ্দিন মাহমুদ

ইতিহাসের এক চরম সন্ধিক্ষণে আইয়ামে জাহেলিয়াতের শত দেবতার নিষ্পেষন থেকে মহানবী (সাঃ) পবিত্র ইসলামের মাধ্যমে নিপীড়িত মানবতাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। মানবজাতি প্রত্যক্ষ করেছিল এক অকৃত্তিম শাশ্বত ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় ইসলামের সেই অবিকৃত রূপ থেকে মানুষ অনেক দূরে সরে এসেছে। নৈতিক চরিত্রের চরম অধঃপতন, বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের অন্তরালে সাম্রাজ্যবাদী শোষক শ্রেণীর হিংস্র পারমাণবিক আগ্রাসন, দেশে দেশে মুক্তিকামী মজলুম জনতার করুন আহাজারি পৃথিবীর আবহাওয়াকে যখন বিষাক্ত করে তুলছিল, পারস্যের শাহী লৌহপ্রাচীর ভেদ করে মহান নেতা ইমাম খোমেনীর (রহঃ) নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লব তখন আবারও ঘোষণা করলো– "সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যাতো বিলুপ্ত হওয়ারই।" (সূরা বনী ইসরাইল ঃ ৮১) বিশ্ব ইহুদী চক্রের হাতে বন্দী পৃথিবীর মানুষগুলো আবার নুতন করে ভাবতে শিখল। আভ্যন্তরীণ শত্রুতার অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা বহিঃশত্রুর কুটনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক আগ্রাসন আর অব্যাহত অপ্রপ্রচারের প্রবল লড়াই মোকাবেলা করে ইসলামী বিপ্লব বিশ্ব মুসলমানের জন্য এক অনুকরণীয় আদর্শরূপে আজও অটল রয়েছে।

১৯৭৯ সালে ইরানের বুকে ইমাম খোমেনীর (রহঃ) নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লবের সাফল্যের পর থেকে গত ১৫ বছর বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এ বিপ্লবের সাফল্যের পেছনে অনেক অন্তর্নিহিত ও বাহ্যিক কারণ উপস্থাপন করা হয়েছে। কেহ রাজনৈতিকভাবে, কেউবা শ্রেণী সংগ্রামের দৃষ্টিতে এ বিপ্লবকে মূল্যায়ন করেছেন। বক্ষমান নিবন্ধে ইমাম খোমেনীর সাফল্যের কয়েকটি অন্তর্নিহিত কারণকে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করবো।

১। ফকিহ– মুজতাহিদ কেন্দ্রিক গতিশীল ইজতিহাদ ঃ

ইসলামী বিপ্লবের মহান নেতা হযরত আয়াতুল্লাহ রুহুল্লা খোমেনী (রহঃ)ইসলামের শাশত আদর্শে যে গতিশীলতায় জনতার উত্থানের এ বিপ্লবকে ধাপে

লেখকঃপ্রাবন্ধিক।

ধাপে যৌক্তিক পরিণতিতে রূপদান করেছেন তার পেছনে রয়েছে আলেম সমাজের সময়োচিত ও চলমান ইজতিহাদ (Dynamic Ijtihad)

প্রকৃতপক্ষে সমসাময়িক সমস্যা মোকাবেলা ও মানব সমাজের যুগোপযুগী চাহিদা মেটাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলামের চলমান ইজতিহাদের দরজা বন্ধ থাকায় পৃথিবীর দিকে দিকে মুসলমানরা একটি স্থবির জাতিতে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মুঃ ইব্রাহীম জান্নাতী বলেনঃ

"The issue of closing the gates of Ijtihad emerged during the reign of 'Abbasids,' and undoubtedly the enemies of Islam played an effective part in raising it. this was because the giving up of Ijtihad meant blocking the source of dynamism and perpetual vitality of Islam and its law, which in turn implied the expulsion of Islam from the arena of temporal affairs and, following it, its elimination from the intellectual and spiritual spheres. Evidently, this was what the enemies of Islam aimed at. . . . . .

Ijtihad, on the one hand gives vigour and viability to legal thought and, on the other, does not allow the ahkam to remain in the outdated moulds of absolute expressions and terms, by expounding them in the language of every age and in accordance with its needs . . . . . .

Since the sacred lawgiver know that various aspects of human life are subject to change and its multiferious needs are open to variation, He recognized the role of Ijtihad as a force which should emerge with the energence of fiqh and remain in its service throughout the course of history in order to enable fiqh to fulfil the human need for law."

(Al Tawhid, Sep-Nov, 1988).

ফকিহ মুজতাহিদগণ যে কোন পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে মুসলিম উম্মাহর জন্য গতিশীল দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম উম্মাহ সর্বদা সঠিক পথে থাকার জন্য কুরআনের সে বাণী অনুসরন অপরিহার্য , যেখানে ইরশাদ হচ্ছেঃ

"আল্লাহর আনুগত্য কর। রাসুলের আনুগত্য কর। আর তোমাদের মধ্যে উলিল আমরের।" (নিসা–৫৯)

উলিল আমর বলতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ

"তোমাদের মধ্যকার উলিল আমর বলতে দ্বীনদার ফিকাহ্‌বিদগণকে বুঝান হয়েছে। এমন মত পোষণ করেন মুজাহিদ, হাসান বছরী ও তাফসীরকার আবুল আলিয়া।" (ইবনে কাছীর ঃ ৫১৮/১)

মুসলমানদের ধর্মীয় দিক নির্দেশনা লাভের জন্য বিশেষজ্ঞ আলেমগনের অনুসরণের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশিষ্ট তাফসীরকার মুফতি মোহাম্মদ শফি তাফসীরে মা'রেফুল কোরআনে বলেন ঃ

"রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের বর্ণিত ব্যাখ্যা ও তাফসীর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হওয়া সত্ত্বেও, শুধু কয়েকখানি অনুবাদপুস্তক পাঠ করেই নিজেকে কুরআনের সমঝদার মনে করে বসেছে। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর প্রত্যক্ষ সাগরেদ অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যা ও তাফসীরের তোয়াক্কা না করে নিজের কল্পনা–প্রসূত মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছে। অথচ তারা চিন্তা করে না যে ওস্তাদ ছাড়া শুধু কিতাবই যদি যথেষ্ট হতো, তবে আল্লাহতাআলা পবিত্র কোরআনের লিখিত কপি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌছে দিতে সক্ষম ছিলেন– রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে ওস্তাদরূপে প্রেরণের আবশ্যক হতো না। একথা শুধু আল্লাহর কিতাবের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং দুনিয়ার যে কোন বিষয় বা শাস্ত্রের বই পুস্তক বা অনুবাদ পাঠ করেই কেউ উক্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হতে পারে না। শুধু ডাক্তারী বই পড়েই আজ পর্যন্ত কেউ বড় ডাক্তার হতে পারে নাই। প্রকৌশল বিদ্যার বই অধ্যয়ন করেই কোন পারদর্শী প্রকৌশলী হয়েছে বলে শুনা যায় না। এমনকি দর্জি বিদ্যার বা পাক– প্রণালীর শুধু বই পড়ে কোন সুদক্ষ দর্জী বা বাবুর্চী হতেও দেখা যায় না। বরং এসব ক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃত। অথচ তারা কোরআন হাদীসকে এত হাল্‌কা মনে করেছে যে, এগুলো বুঝার জন্য কোন ওস্তাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। এটা সত্যি পরিতাপের বিষয়।

(তাফসীরে মা'রেফুল কোরআন, ২য় খন্ড ৭১২ পৃঃ)

"এ জাতীয় ইজতিহাদী মাসআলায় সাধারণ আলেমদের পক্ষেও কোন না কোন একজন মুজতাহিদ ইমামের তাকলিদ করা অপরিহার্য। মুজতাহিদ ইমামগণের মতের বিরুদ্ধে কোন নতুন মত অবলম্বন করা ভুল।

এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায়ের আলেম, মুহাদ্দিস ও ফিকাহবিদগণ, ইমাম গাজ্জালী, রাযী, তিরমিযী, তাহাভী, মুয়ানী, ইবনে হুসাম, ইবনে কুদামা এবং এই শ্রেণীর আরও লক্ষ লক্ষ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেম আরবী ভাষা ও শরীয়ত সম্পর্কে গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইজতিহাদী মাসআলাসমূহে সর্বদা

মুজতাহিদ ইমামদের তাকলিদ করে গেছেন।"

(তাফসিরে মা'রেফুল কোরআন ৫ম খন্ড পৃঃ ৩৮৫)।

ইরানে ইসলামী বিপ্লবের সাফল্যের পেছনে একটি প্রধান কারণ ছিল সেখানকার সাধারণ আলেম, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সবাইই মুজতাহিদ ফকীহগণের আনুগত্য করতেন। প্রত্যেকেই যোগ্যতার বিকাশ ও অন্যায়ের মোকাবেলায় এগিয়ে যেতেন। কিন্তু চূড়ান্ত নেতৃত্ব তারা ফকিহদের থেকেই পেয়ে থাকতেন। এ ছাড়া ইসলামী বিপ্লব সফল হতো না। ইসলামী বিপ্লবের অন্যতম দার্শনিক, সংগঠক শহীদ মুর্তাজা মুতাহহারী ইসলামে নেতৃত্ব প্রসংগে বলেন ঃ

"পরিষ্কার কথা হল, শুধু সেসব লোকেরাই নেতৃত্ব করতে পারেন যারা ইসলামের সনাতন সংস্কৃতির পরিবেশে মানুষ হয়েছেন এবং ধর্মীয় শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান, কুরআন পাক, হাদীস শরীফ, ফিকাহ শাস্ত্র প্রভৃতিতে বুৎপত্তি অর্জন করেছেন। অতএব শুধু দ্বীনি আলেম সম্প্রদায় ভুক্তগণই এইরূপ আন্দোলনে নেতৃত্বের যোগ্য হতে পারেন।"

(চলতি শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলন, পৃঃ ৪৭-৪৮)।

যেসব বুদ্ধিজীবীরা নিছক আলেমদের নেতৃত্ব সম্পর্কে দ্বিধান্বিত ও ইসলামকে শুধু একটি তত্ত্ব বা সমাজ প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করেন তাদের প্রতি উল্লেখ করে তিনি বলেন ঃ

"এ সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আমার বক্তব্য হচ্ছে যে সর্বপ্রথম, ইসলাম একটা সাধারণ তত্ত্বমাত্র নয়, এটা এক বাস্তব সত্য। এটা কোন উপকরণ নয় বরং এটাই অভীষ্ট। · · · · · ·

যদি ধরে নেয়া হয় যে ইসলাম একটা হাতিয়ার এবং একটা উপযোগী ও কার্যকর উপকরণ, তাহলে অবশ্য (বুদ্ধিজীবীরা যে ইসলামের কথা বলছেন) এটাই সঠিক ইসলাম এবং এটাকে আর ইসলামী লেবেল ব্যবহারকারী বলা যাবে না। যে কোন হাতিয়ার বা উপকরণ ব্যবহার করে কল্যাণ পেতে হলে যদি বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়; তাহলে ইসলামকে যারা একটা হাতিয়ার বা উপকরণ বিবেচনা করেন তারা ইসলামের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করবেন না? আপনারা কি ভাবতে পারেন যে একজন তথাকথিত বুদ্ধিজীবী জনৈক উস্তাদের সংগে নাশতার টেবিলে খানিকটা সময় কাটানোর মাধ্যমেই বিকৃত ইসলাম থেকে সঠিক ইসলাম আলাদা করে নেবার এবং অতঃপর একে সমাজের কল্যাণের কাজে প্রয়োগ করার জ্ঞানটুকু অর্জন করেছেন? · ·

সুতরাং, প্রিয় বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আমার পরামর্শ যে আপনারা 'ক্ষমতা হস্তান্তর' এবং আলেম সমাজকে 'ক্ষমতাহীন' করার স্বপ্ন ত্যাগ করে মানবতার অন্যান্য বৃহত্তর

সেবায় আত্মনিয়োগ করুন। ইসলাম, ইসলামী সংস্কৃতি এবং ইসলামের গতিশীলতা ও শক্তির উৎসগুলোকে ইসলামের যথার্থ প্রতিনিধিদের হাতেই থাকতে দিন যারা ঐ

পরিবেশের মধ্যে লালিত হয়েছেন এবং সাধারন মানুষের মধ্যে যাদের কন্ঠ ধর্মীয় কন্ঠ বলে সুপরিচিত।"

(চলতি শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলন- পৃঃ ৫৫-৫৬)

সুপ্রাচীনকাল থেকেই ইরানের ঐতিহ্যবাহী আলেমগণ জনগণের বাস্তব সমস্যায় সর্বদাই ভূমিকা রাখতেন। জনগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতেন। অবশ্য রাজনৈতিক ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে ইরানে "আকবরী' আলেমগণের মত হল (গায়েবী) ইমামের অনুপস্থিতিতে নিজস্ব যুক্তি খাটিয়ে কোন মতামত কার্যকর করতে আলেমগণের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু 'উসুলী' ফকিহগণের মত হল ইমামের অনুপস্থিতিতে সমগ্র উম্মাহ দু'ভাগে বিভক্তঃ 'মুজতাহিদ' ও 'অ-মুজতাহিদ'। যারা মুজতাহিদ নন, আইনের অনুধাবনের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা এবং এ পর্যায়ে পৌছার মত স্বাধীন যুক্তি প্রয়োগ ক্ষমতা যাদের নেই তাদেরকে অবশ্যই কোন না কোন মুজতাহিদের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণের ব্যাপক রাজনৈতিক ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। কাজার আমলেই ইরানে একদল শক্তিশালী মুজতাহিদের আবির্ভাব ঘটে। এভাবে আমরা দেখতে পাই ১৮২৬ সালে মুজতাহিদগণ রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রাজতান্ত্রিক সরকারকে নির্দেশ দেন। ১৮৯২ সালে তামাক ব্যবসার উপর বৃটিশদের একচেটিয়া আধিপত্যের জন্য তৎকালীন প্রধান মুজতাহিদ মীর্যা হাসান সিরাজী তামাক ব্যবহারের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিলে তা সারাদেশে কার্যকরী হয়। তার একদশক পর ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনেও আলেম সম্প্রদায়কে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকায় দেখা যায়। তাদের মধ্যে প্রধান হলেন মুজতাহিদ সাইয়্যেদ মুহম্মাদ বিহবাহানী ও সাইয়্যেদ মুহাম্মদ তাবাতাবাঈ।

ইসলামী বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেনী (রহঃ) সেই সংগ্রামী ঐতিহ্যকে লাভ করেছেন। ইমামের পিতা আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ মুস্তফা খোমেইন শহরে জমিদার খানদের কর্তৃক জনগণের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদ করায় খান বাহিনীর হাতে খোমেইন-আরাক সড়কে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন। সুদীর্ঘকাল ধরে আলেমদের যোগ্য ভূমিকার পাশাপাশি ইসলামী বিপ্লবের যে কেন্দ্রটি ইসলামী বিপ্লবের প্রধান দূর্গ হিসেবে কাজ করে তা হল কোমের হাওযায়ে এলমিয়া (দ্বীনী শিক্ষা কেন্দ্র)। ১৯২২ সালে দর্শন ও আধ্যাত্মবাদের সাথে গতানুগতিক ধর্মীয় শিক্ষার নবতর বিন্যাস করে আয়াতুল্লাহ আবুদ আল করিম হায়েরী কোমের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড় করান। অন্যদিকে তৎকালীন প্রধান মুজতাহিদ (১৮৭৫-১৯৬১) আয়াতুল্লাহ বুরুজারদি যিনি সারা দেশে খুমস ও অন্যান্য ধর্মীয় ট্যাক্স

আদায়ের সংগঠনের মাধ্যমে মাদ্রাসা ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের অর্থনৈতিক সংস্থানকে দৃঢ়তর করেন। এ দুই মহান শিক্ষক ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লবের পেছনে শক্তিশালী ভিত্তি (কোমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) হিসেবে কাজ করেন।

অবশ্য নিঃসন্দেহে ইমাম খোমেনী যোগ্যতা ও ভূমিকার দিক থেকে উপরোক্ত সকল মুজতাহিদকে ছাড়িয়ে যান। ইসলামী বিপ্লবের সাফল্যের পেছনে ঐতিহাসিক মুজতাহিদগণের সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে। ইমাম খোমেনীর নেতৃত্ব প্রসঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ হামিদ আলগার বলেন ঃ

"আয়াতুল্লাহ খোমেনীর কাছে যাওয়ার যাদের সুযোগ হয়েছে তারা জানেন যে, তিনি মানবাদর্শের এক মূর্ত প্রতীক। তিনি কেবল নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক যোগ্যতার এক অপূর্ব সমন্বয়ের মাধ্যমে ইরানে এরূপ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি প্রচলিত মারজা-ই-তাকলিদ (অনুসরণযোগ্য মারজা)-এর সীমা অতিক্রম করে গেছেন।"----একজন মুসলমানকে দেখতে হবে ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বের ধরনের প্রতি যার মাধ্যমে তিনি বিপ্লবে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গতি প্রদান করেছেন। .....

এটা এখন উল্লেখযোগ্য একটা দৃষ্টান্ত যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লব পরিচালনায় তিনি যে অবদান রেখেছেন তা সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে অতুলনীয় এবং সে ভূমিকা পণ্ডিত, দার্শনিক ও আধ্যাত্মবাদী হিসেবে তার পরিচিতিকে ছাড়িয়ে গেছে। আধুনিক মুসলিম মানষিকতা সম্পন্ন লোকেরা মনে করেন, দর্শন ও আধ্যাত্মবাদ বাস্তবতা বহির্ভূত, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকায় অপ্রযোজ্য এবং তা এমনি এক অবাস্তব জিনিস যার সাথে মুসলিম ও ইসলামী বিশ্বের বিরাজমান সমস্যার কোন সম্পর্ক নেই। আয়াতুল্লাহ খোমেনী এ ধারনার বিরুদ্ধে এক জীবন্ত উদাহরণ। তাঁর কর্ম এ দুটো ধারণার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়েছে। তিনি যে বিপ্লব করেছেন তা শুধু যে রাজনৈতিক ও কৌশলগত ব্যাপার ছিল তা নয়, আধ্যাত্মবাদের এক অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারাও তা নিখুঁতভাবে নির্ভুলভাবে পরিচালিত হয়েছে। ..... ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে তিনি দেশে ফিরে আসলেন। কিন্তু তিনি সাথে করে কোন সম্পদ নিয়ে এলেন না। কোন রাজনৈতিক দলও তিনি গঠন করেননি। কোন গেরিলা যুদ্ধও পরিচালনা করেননি। কোন বিদেশী শক্তির সাহায্যও তিনি নিলেন না। অথচ এর মধ্যেই তিনি ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলনের তর্কাতীত নেতৃত্বে সমাসীন হলেন।"

(ইসলামী বিপ্লব ইরান দেশে ঃ ডঃ হামিদ আলগার)

ইমাম খোমেনী ইসলামী বিপ্লবে সংগ্রাম, নির্দেশনা ও নেতৃত্বের উপযোগী করে

একদল নওজোয়ান ফকীহ আলেম গড়ে তোলেন। বিপ্লবে শহীদ আলেমদের ও বর্তমান নেতৃত্বে আসীন অধিকাংশই ছিলেন ইমাম খোমেনীর ছাত্র। ইমাম খোমেনী শিক্ষার পদ্ধতিতে (Methodology) সংস্কার সাধন করেন। তিনি যে সমস্ত বিষয় পড়াতেন সেগুলোর সাথে দৈনন্দিন সমস্যাবলীর একটা বাস্তব যোগসূত্র সৃষ্টি করেন। আর এ কারণেই কোমের অন্যান্য শিক্ষকের চেয়ে তাঁর ক্লাসে অধিক ছাত্রের সমাগম হতো।

নেতৃত্বের উপযোগী করে আলেমদের গড়ে তোলার ব্যাপারে ইমাম খোমেনীর সুযোগ্য ছাত্র শহীদ মুতাহ্হারী বলেন– "নেতৃত্বের কাজ সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে আমি জোড় দিয়ে একথা বলেছিলাম যে, আজকের যুগেও খাজা নাসিরুদ্দীন তুসি, আবু আলী সিনা, মুল্লাহ সদর, শায়খ আনসারী, মোহাক্কেক হিল্লি প্রমুখের মত প্রখ্যাত পণ্ডিতদের প্রয়োজন। কিন্তু আমি একথাও উল্লেখ করেছিলাম যে, আমরা ঐসব পণ্ডিতদের চাই সেই অতীত যুগের হিসেবে নয়, বরং আধুনিক ও বর্তমান সময়ের হিসেবে তাঁদের অতীতের সকল যোগ্যতা ও সাংস্কৃতিক গুণাবলী সহকারে।"

(চলতি শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলন, পৃঃ ৫০)

বিলায়াতে ফকীহ (ফকীহদের অভিভাবকত্ব) শীর্ষক বক্তৃতামালায় ইমাম খোমেনী আলেম সমাজের দায়িত্বের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এমনি এক বক্তৃতায় তিনি বলেন– "আমি বলেছি, ফিকাহবিদরাই ইসলামের দুর্গ। তাদের কর্তব্য প্রকৃত সত্য, আকীদার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা জনগণের সম্মুখে। ইসলামের সাংগঠনিকতাকে রূপায়ন করা দ্বন্দ্ব ও জিহাদের পথকে উন্মুক্ত ও উদ্ভাষিত করা, এক কথায় জনগণকে নেতৃত্ব দান। কেননা তাঁদের মধ্যে ঐকান্তিকতা, স্বার্থহীনতা, যোগ্যতা ও আত্মত্যাগ প্রত্যাশা করবে, তখন তারা স্বতস্ফূর্তভাবেই তাদের নেতৃত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করে নেবে।" (বিলায়াতে ফকীহ, পৃঃ ১৩৯)

আলেমগণের ইজতিহাদভিত্তিক গতিশীল ভূমিকা রাখার আবশ্যকতা সম্পর্কে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা নূর মুহাম্মদ আ'যমী (রহঃ) বলেন ঃ

"প্রত্যেক কালেই ইজতিহাদের আবশ্যকতা রয়েছে। ইজাতিহাদ হল ইসলামের জীবনী শক্তি। পর্বতগাত্র থেকে পানি নির্গমন বন্ধ হলে যেমন নদী মজে যেতে বাধ্য, ইজতিহাদের প্রবাহ বন্ধ হলেও তেমন ইসলাম মরে যেতে বাধ্য। এ কারণেই শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ সাহেব প্রত্যেক যুগে ইজতিহাদ ফরজ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন– 'আমি যে বলেছি, প্রত্যেক যুগেই ইজতিহাদ ফরজ, তার কারণ এই যে, ঘটনাবলী অন্তহীন অথচ সে সকল ঘটনা সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কি, তা জানা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষেই ফরজ। অপরপক্ষে পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক যা লিপিবদ্ধ হয়েছে তা সব যুগের জন্য যথেষ্ট নয় (সুতরাং প্রত্যেক যুগেই ইজতিহাদ ফরজ)।' তিনি আরও

বলেছেন, 'যারা এ ধারণা পোষণ করেন যে, এ কালে মুজতাহিদ পাওয়া যায় না বা পাওয়া যেতে পারে না তারা ভুল করেছেন।' মোট কথা এই যে যারা পরবর্তীকালের জন্য ইজতিহাদের অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করেছেন তারা পক্ষান্তরে ইসলামের আবাদীয়ত বা চিরস্থায়িত্বকেই অস্বীকার করেছেন অথবা অজ্ঞাতসারে তারা মুস্তফার (সাঃ) পর অন্য নবী আগমনের আবশ্যকতাকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। ..... পূর্ববর্তী প্রত্যেক যুগের আলেমগণ পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপন আপন যুগের সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান দিয়েছেন। সুতরাং এ যুগের আলেম সমাজেরও কর্তব্য এ যুগের সমস্যাবলীর সমাধান এ যুগের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেয়া।"

(দৈনিক সংগ্রাম, ২৪ শে আশ্বিন, ১৩৯৪)

ইরানে ইসলামী বিপ্লবে আলেমগণ ইজতিহাদের এই প্রাণসত্তাকেই জাগিয়ে তুলেছেন যা ব্যক্তি ও সমাজের একটি গতিশীল পরিবর্তনের মাধ্যমে ইসলামী বিপ্লবকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়।

২। উপনিবেশবাদী সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মোকাবেলায় ইসলামী বিপ্লবের সংগঠন প্রক্রিয়া ঃ

কারবালায় ইমাম হোসাইনের (আঃ) শাহাদাতের পর থেকে মুসলমানদের মাঝে ইসলামের সাম্য–ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজটি বাস্তবে সামন্তবাদী ও রাজতান্ত্রিক রূপে পরিবর্তিত হয়। ভোগবাদী বাদশাহীতন্ত্রের তত্ত্বাবধানে মুসলমানদের উত্তম আখলাক, আখেরাত ভিত্তিক ঈমানী চেতনার স্থলে বস্তুবাদী চিন্তাধারা ক্রমেই প্রসার লাভ করে। সংখ্যালঘু সংশোধনকামীদের চরমভাবে কোণঠাসা করে দেয়া হয়। তারপর থেকে সুদীর্ঘকাল ধরে উপনিবেশবাদী ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের ফলে অবশেষে ১৯২৪ সালে উসমানীয়া খেলাফতের পতনের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের সর্বশেষ রাষ্ট্রীয় কাঠামোটিও ভেঙ্গে যায়।

উপনিবেশবাদের পদলেহী একদল তথাকথিত আধুনিকতাবাদী (Modernist) মুসলিম ইউরোপীয়দের সংস্কৃতি, দর্শন, বিশ্বদৃষ্টি, ভাষার বিস্তারের মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতিকে সমূলে উৎপাটনে ব্রতী হয়। ভৌগোলিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা, ধর্মহীন গণতন্ত্রের আলোকে তারা প্রশিক্ষিত হয়। মুসলমানদের বিধ্বস্ত রাজনৈতিক কাঠামোর স্থলে তারা ইউরোপীয় ধাঁচে রাষ্ট্র সংগঠনে আত্মনিয়োগ করে। ইসলামের ইতিহাস–ঐতিহ্য, দর্শন, সংস্কৃতির স্থলে এসব উপবিনেশিক তাবেদার মুসলিম এলিট শ্রেণী ইউরোপের মাপকাঠিতে সবকিছুকে মূল্যায়ন করতে শিখে আর এর মাধ্যমে তারা 'খান বাহাদুর', 'আধুনিক রাষ্ট্রের জন্মদাতা' ইত্যাদি খেতাব, পদ–পদবী, ইউরোপের পৃষ্ঠপোষকতা, আর্থিক সহায়তা ও সীমিত ক্ষমতা লাভ করে। মুসলমানদের মাঝে এসব বিশ্বাসঘাতকদের সম্পর্কে লন্ডন মুসলিম ইনস্টিটিউট প্রধান ডঃ কলিম সিদ্দিকী

বলেন– "For the muslim colonial elites everything changed, they had new rulers, new languages, new dresses, new books, new history, new philosophy, new political institutions and new personal, social, cultural, new political goals to pursue with new zest and vigour. Indeed, for them colonialism was a revolution!"

(Issues in the Islamic movement, 1985-86, Page-11)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপে কতগুলো আকর্ষণীয় শব্দে যেমন 'মুক্তি', 'সাম্য', 'ভ্রাতৃত্ব', 'প্রতিনিধিত্বশীল সরকার', 'ন্যায়বিচার', 'বাকস্বাধীনতা' 'সমঅধিকার' বিস্তার ঘটে। এসব মুসলিম এলিট ও কিছু আলেম এসব শ্লোগানের মাঝে কুরআনের কিছু আয়াত ও হাদীসের অনেক বাণীর প্রতিফলন দেখতে পান। গণতন্ত্রের অন্তরালে সাম্রাজ্যবাদী চক্র যখন তাদের অপকর্ম ও শোষণগুলোকে ঢাকতে চাচ্ছিল তখন এসব বিকৃত চিন্তার মুসলিমরা গণতন্ত্রকে ইসলামের 'শুরা'য়ী' পদ্ধতির সাথে তুলনা করেন।

এসব এলিটরা বলত যে ধর্মভিত্তিক জীবনই মুসলমানদের আধুনিক বিশ্বে পশ্চাৎপদতার কারণ। 'জাতীয়তাবাদ' ও 'সার্বভৌম গণতন্ত্রে'র শ্লোগানে ইউরোপীয় আদলে তারা মুসলিম বিশ্বকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং মুসলিম উম্মাহকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতপার্থক্য নিয়ে বিভিন্ন 'পার্টির' ছত্রছায়ায় বিভক্ত করে। যারা নিজেদের দুনিয়াবী প্রতিষ্ঠা, পদপদবী নিয়ে নিশ্চিন্তে পাশ্চাত্য পুঁজিবাদের হাতে মুসলিম উম্মাহর ভাগ্যকে তুলে দেয়। তাকওয়া পরহেজগারীর স্থলে ক্ষুদ্র স্বার্থ ও 'আধুনিক বিশ্ব' তথা উপনিবেশবাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নটিই বড় হয়ে দেখা দেয়। এ বিষয়টিই ডঃ কলিম সিদ্দিকী অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন ঃ

" The political party trapped Muslim polotical thought and behaviour in a framework from which they have yet to recover. It is beyond the scope of this paper to examine, step by step, the processes by which these political parties became 'national' parties of solidarity apparently fighting against the colonial powers. In the popular mythology ('history') of this period it is alleged that these parties and the leaders of these parties are legendary figures known as `Fathers of the nation'. The fact however, is that the colonial powers withdraw only when, in their judgement, their proteges were ready and willing to contime the work of modernization' begun under colonialism. The Ummah was divided into small nation states run by colonial elites and controlled and directed by the colonial powers, or such other proxy powers as the United States and the Soviet Union. The fact is that this is all that the fathers of Muslim political thought in the colonial period set out to achieve and they achieved it. The net result is permanent political

subservence and continued social, cultural and economic bondage to the western civilization. The inevitable and inescapable conclusion must be that we are still living in the colonial period. The so called `Independence' and the 'Transfer of power' that took place in the name of 'decolonization' were in fact only another and higher stage in the development and refinement of the colonial system."

(Issues in the Islamic movement, 1985-86, Page-15)

উপনিবেশবাদ ও তার দোসরদের কুটচক্রান্তে মুসলিম উম্মাহর উপর নেমে আসে চরম বঞ্চনা ও গ্লানি। আরব জাতীয়তাবাদের বিষাক্ত ছোবল আর তার অব্যবহিত পরেই ইসরাইলের মাধ্যমে ইহুদীদের ছুরিকাঘাতে উম্মাহ জর্জরিত হয়ে পড়ে। 'নব্য তুরস্কের জন্মদাতা' কামাল আতাতুর্ক বিশ্বস্ততার সাথে ধর্ম উচ্ছেদ ও প্রগতির বিজয় ঢংকা বাজাতে থাকেন।

অন্যদিকে রূঢ় বাস্তবতা এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র, গণতন্ত্র, পার্টির গন্ডি, পাশ্চাত্য প্রবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন পদ্ধতির বেড়াজালে মুসলিম উম্মাহ তাঁর স্বকীয় রূপ-প্রকৃতি হারিয়ে ফেলে। এ সময় ইসলামের এমন কিছু আনাড়ী পুনরুত্থানকামী-বিপ্লবী নেতারও উত্থান ঘটে যারা মনে প্রাণে ইসলামের পুনর্জাগরণের প্রত্যাশী ছিলেন এবং এ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু ইসলামের মৌল দর্শন, সাংগঠনিক রূপ, দ্বীন প্রতিষ্ঠার স্বকীয় পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ না হওয়ার কারণে বস্তুবাদী ও পাশ্চাত্য নীতি দর্শনের আলোকেই ইসলামী আন্দোলনকে বিকাশের চেষ্টা করেন। এ অবস্থাটির প্রতি আক্ষেপ করেই আয়াতুল্লাহ শহীদ মুতাহ্হারী বলেন- ইসলামের অন্তর্নিহিত মর্ম ও সহজাত রূপ নিয়ে পাশ্চাত্যের এই সর্বগ্রাসী থাবা থেকে বেরিয়ে আসার সকল পথই যেন রুদ্ধ হয়ে যায়। গত শতাব্দীতে সাইয়েদ জামাল উদ্দিন আফগানী ও এ শতাব্দীর বহু সংগ্রামী আলেম স্বকীয় ইসলামে প্রত্যাবর্তন ও সাম্রাজ্যবাদের লৌহ প্রাচীর ভেঙ্গে মুসলিম উম্মাহকে মুক্তির সংগ্রামে ব্রতী হন।

"বস্তুবাদী উপাদান নিয়ে যে ইসলাম নওজোয়ানদের মাথায় ঢোকে তাতো কৃত্তিম ইসলাম, সহজেই তার খোলস খসে পড়াইতো স্বাভাবিক। আরেকটা বড় মুছিবত সৃষ্টি করেছে সেই সকল মুসলমান যারা প্রকৃতপক্ষে আসল ইসলাম সম্পর্কে বেখবর এবং বিজাতীয় আদর্শে বিমোহিত ; কিন্তু তারাই আবার ইসলামী নৈতিকতার উপর লেখালেখি ও প্রচার প্রোপাগান্ডায় নেমেছে, অথচ তারা ভুলে যাচ্ছে যে, আসলে তারা যা প্রচার করছে তা নৈতিকতা সম্পর্কে আমদানীকৃত মতবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধুমাত্র নীতিদর্শনের ক্ষেত্রেই নয়, ব্যাপারটি ঘটেছে ইতিহাস জ্ঞানের ধর্মীয় দর্শন, নবুয়্যতের দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, আন্তর্জাতিকতা ইত্যাদি আরও বিভিন্ন জ্ঞানের শাখায়ও।

একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও খোদায়ী কর্তব্যের অধীন হিসেবে আমি আমার শ্রদ্ধাভাজন ইসলামী আন্দোলনের মহান নেতৃবৃন্দকে এ সম্পর্কে সচেতন করে তোলার প্রয়োজন মনে করছি যে, ইসলামী আদর্শের নামে বিদেশী মতবাদের অনুপ্রবেশ, উদ্দেশ্যমূলক বা অনিচ্ছাকৃত যেভাবেই ঘটানো হোক না কেন, তা ইসলামের অস্তিত্বের জন্য এক মারাত্মক হুমকি।

আমরা দায়িত্বশীল ব্যক্তি, কিন্তু প্রচলিত ভাষায় আমরা ইসলামের বিভিন্ন দিকের উপর যথেষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারিনি। আমরা যদি যথেষ্ট পরিমাণ বিশুদ্ধ মিঠা পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারতাম তাহলে মানুষ দূষিত পানি নিয়ে মাতামাতি করতো না। এ অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে প্রচলিত ভাষায় ইসলামের সঠিক মতাদর্শকে তুলে ধরা, প্রকাশ ও প্রসার ঘটানো।"

(চলতি শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলন পৃঃ ৬৩)

আর এ অভাবেই সম্ভবতঃ মুসলিম বিশ্বে ইসলামী জাগরণের নামে 'ইসলামী গণতন্ত্র', 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' ইত্যাদি মতাদর্শের বিকাশ লাভ করে।

সাইয়্যেদ জামাল উদ্দিন আফগানীর বিশাল আলোড়ন সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন করতে গিয়ে শহীদ মুতাহ্হারী বলেন ঃ

"একবাল, মিমার এ তাজদীদ-এ বানা-এ-ইসলাম" গ্রন্থটি সৈয়দ জামালের কার্যক্রমের একটা বিশ্লেষণ প্রদান করেছে। ইসলামী বিশ্বে একটা আলোড়ন সৃষ্টিতে এই একক ব্যক্তিটির শক্তি নিয়ে এতে বলা হয়েছে ঃ

"কি করে তিনি এতটা শক্তি ও প্রভাবের অধিকারী হলেন? হৃদয়ের অতল থেকে আর সীমান্তের ভূমি থেকে সোচ্চার কণ্ঠ জাগরণের পেছনে কোন্ কোন্ উপাদান সক্রিয় ছিল? এটা কি শুধু এ কারণে হয়নি যে মুসলিম জাতিগুলো অনুধাবন করেছিল যে, সাইয়্যেদের (জামাল উদ্দিন আফগানী) আহবান এক পরিচিত ব্যক্তির আহবান? এটা ছিল ঐ অনুভূতি যে এই কণ্ঠস্বর গৌরবময়, উদ্দীপনাময় এবং ঐতিহাসিক তাহজীব তমদ্দুনের গভীর থেকে উত্থিত। তারা প্রত্যক্ষ করল যে, এটা আগন্তুকের কণ্ঠস্বর নয় কিংবা সর্বাধুনিক কোন বৈদেশিক চিন্তাধারারও সংস্করণ নয়। এ ছিল হেরা, মক্কা, মদীনা, উহুদ, কাদেসিয়া, জেরুজালেম, জিব্রালটার প্রণালী ও ক্রুসেড উত্থিত এবং পুনরায় ধ্বনিত কণ্ঠস্বরেরই প্রতিধ্বনি। এটা ছিল ইসলামের গৌরবময় ইতিহাসের পাতায় দীর্ঘদিন ধরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত সেই একই আহবান- মুসলমানদের জেহাদে জীবন উৎসর্গ করার।"—

সাইয়্যেদ জামাল সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা সবই সঠিক, তার কণ্ঠধ্বনি নিঃসৃত হয়েছিল তার আত্মার গভীরতম প্রদেশ থেকে, কেননা সাইয়্যিদ নিজেই ছিলেন দেহ

মন ও মননের দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে এ তাহজীব-মতদ্দুনেরই সন্তান এবং এরই আবহাওয়ায় লালিত ও পরিপুষ্ট।"

(চলতি শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলন, পৃঃ ৫৬)

ইমাম খোমেনী (রহঃ) সেই একই ধারায় ইসলামের একজন যথার্থ প্রতিনিধি হিসেবে কথা বলতেন। তিনি কোন ক্ষুদ্র গ্রুপের এমনকি আলেম সমাজের প্রতিনিধি হিসেবেও কথা বলতেন না। বরং ইসলামের একজন আলেম হিসেবে ইরানের একজন নাগরিক হিসেবে যাবতীয় সমস্যার উপর কথা বলা দায়িত্ব মনে করতেন। তাঁর সকল ঘোষণার মাঝেই একটা স্থায়ী আবেদন লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলতেন, ইসলামে আলেমদের বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে। সুতরাং তাঁরা শুধু পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত কিতাবপত্র পড়বেন এবং পড়াবেন এ পর্যন্তই তাদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয়। নবীর (আঃ) হাদীসের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব আরও অনেক ব্যাপক ও মহান। তাঁরা নবীর উত্তরাধিকারী। সুতরাং মাদ্রাসার কোণায় বসে নিছক পাঠ্যসূচীর কিতাবাদী নিজে পড়া ও অন্যদের পড়ানো দ্বারা নবীর উত্তরাধিকারের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। লোকজদেরকে পথ দেখানোর (Guidance) ব্যাপারে তাদের দায়িত্বের পরিধি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। তিনি শুধু আলেম সমাজেরই প্রতিনিধিত্বমূলক কথা বলতেন না বরং সমগ্র মুসলিম জাতির উদ্দেশ্যেই তার বক্তব্য ছিল উচ্চকিত।

ইসলামী বিপ্লবের সাংগঠনিক কাঠামো ছিল খুবই সাধাসিধে। ইমান খোমেনীর নির্দেশাবলী ইরানে ঘরে ঘরে পৌঁছে যেত আর জনগণ তা মেনে চলত। এর ফলেই জনগণ এগিয়ে আসে। এরপর পরিকল্পিতভাবে বিরাট বিরাট বিক্ষোভ পরিচালিত হয়। আর তিনি যেহেতু কোন বিশেষ গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, পার্টির হয়ে কথা বলতেন না তাই তার কথার আবেদন ছিল খুবই ব্যাপক। কি জাতীয়তাবাদী, কি সমাজতন্ত্রী, উদারপন্থী বা চরমপন্থী, ইসলামের মৌল পুনরুজ্জীবনকামী সকলেই একস্রোতে এসে মিশে যায়। তিনি হয়ে পড়েন ঐক্যের মূর্ত প্রতীক। সাংগঠনিক কর্মকৌশলের কোন রহস্যও ছিল না। মসজিদ ছিল সংগঠনের প্রাথমিক ইউনিট। মসজিদকে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগানো হয়েছে। তাই বলে জনগণ সমাজ ছেড়ে মসজিদে গিয়ে ইবাদত করেছে, অজু করে নামায ও কোরআন তেলাওয়াত করেছে, দুনিয়া ত্যাগ করেছে তা নয় বরং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ মসজিদকে ইসলামের পুনরুত্থানের সংগ্রাম ও সাংগঠনিক কমান্ডের কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। আর মূলতঃ মহানবী (সাঃ)-এর আমলেও মসজিদের ভূমিকা তাই ছিল। অবশ্য সে রকম শক্তিশালী ফকীহ-আলেমদের অনুপস্থিতিতে শুধু সুরম্য মসজিদ সমাজ সংগঠনে কোন ভূমিকা রাখতে পারে না। এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হল অন্যান্য বহু দেশে ইসলামী আন্দোলনগুলোর পক্ষ থেকে কোন একটি কেন্দ্রীয় ক্ষমতাশীল সংগঠন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়, ইরানে ইসলামী বিপ্লবে ঘটেছে

তার উল্টোটা। সমগ্র ইরানে গ্রামে গ্রামে মসজিদ ও আলেমকেন্দ্রিক স্বায়ত্বশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এসব আলেমদের থেকেই পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ ও ইসলামী সরকার গঠিত হয়। তুরস্ক, পাকিস্তানসহ কোন কোন মুসলিম দেশে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সেকুলার ধরনের সরকারের অধীনে পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করেন। ইসলামের স্বার্থেই এসব নিষ্ঠাবান ব্যক্তি পার্লামেন্টে যান। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পার্লামেন্টে গিয়ে অন্যদের মতই পার্লামেন্টারী কূটবুদ্ধি চালাতে থাকেন। শুরুতেই তারা ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ গলদপূর্ণ কোন ব্যবস্থার অধীনে অংশগ্রহণ করে ঐ দলের পক্ষে তাদের স্বীকৃত ঐ পদ্ধতির আর বিরুদ্ধাচরণ সম্ভব হয়নি বরং দলীয় স্বার্থে ঐ পদ্ধতি টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে তাদের আংশিক ভূমিকা থেকেই যায়।

ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লবের প্রতিষ্ঠার ধাপগুলো ছিল এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। বস্তুতঃ সমগ্র মুসলিম বিশ্ব যখন পাশ্চাত্য নিয়ন্ত্রিত তাবেদার মুসলিম এলিট ও রাজা বাদশাহদের নেতৃত্বে পাশ্চাত্য পদ্ধতির বহুবিধ ফ্রেমে আটকে গিয়েছে তখনও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দুটো শ্রেণী এ থেকে ছিল অনেকাংশে মুক্ত। ইসলামের মহান হক্কানী ফকিহ্ আলেম সমাজ- যারা পাশ্চাত্যের পদপদবীর লোভে বাধা পড়েননি, কিংবা ক্ষমতার সিড়িতেও পা মাড়াননি। আর অন্যটি হল সাধারণ জনগণ। যারা অধিকাংশ সময়ই "সবুজ বিপ্লব", "শ্বেত বিপ্লব" আর "জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের" নামে ধোকা খেয়েছেন সত্যি কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তারা ছিলেন নির্যাতিত। তাই সময় সময় যখনই কোন সাম্রাজ্যবাদ ও শোষক শ্রেণী বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধেছে তখনই জনগণ তাতে কম বেশী সাড়া দিয়েছে। ইমাম খোমেনী এই দু শ্রেণীকেই পূর্ণমাত্রায় জাগিয়ে তুলেছেন। আলেম সমাজের গতিশীল সিদ্ধান্ত ও জনতার উত্থানের মুখে তাই পাশ্চাত্য প্রবর্তিত সাংগঠনিক কাঠামোগুলো অসহায় হয়ে পড়েছে, মুষ্টিমেয় এলিট গোষ্ঠী ও পুঁজিপতিদের পক্ষে এই সর্বপ্লাবী গণজাগৃতি প্রতিরোধ করা আদৌ সম্ভব ছিল না। ইমাম খোমেনী যথার্থভাবেই আলেম সমাজকে যোগ্যতর ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছেন ও জনগণকে ধোঁকাবাজ উপনিবেশবাদের দালাল মার্কিন সাম্রাজ্যের ক্রীড়নক শাহী শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি করেছেন। এখানেই ইমাম খোমেনীর সাফল্য।

উপনিবেশবাদী কাঠামোর বাইরে থেকেই ইমাম খোমেনী কিভাবে এই বিস্ময়কর গণজাগরণ সৃষ্টি করেছেন এবং বিপ্লবকে সুসংহত ও ভারসাম্যপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন তা লন্ডন মুসলিম ইনস্টিটিউট প্রধান ডঃ কলিম সিদ্দিকীর ভাষায় ঃ

Be that as it may, the overriding and all-important fact about the Islamic revolution in Iran is that its spiritual and

intellectual roots lie entirely withing Islam and entirely outside the influence of the colonial system and the body of ideas and institutions the represent Muslim political thought of the colonial period. Before the Islamic revolution in 1979 it was difficult to believe that there exists a source of Islamic leadership still not contaminated by the political ideas of the west. The separate and almost isolated development of shi'i theology, theologians, their institutions and the emergence of 'Usuli Ulama' actively engaged in Ijtihad on contemporary issues has clearly produced both the ideas and the leadership that were necessary to challenge the domination of Muslim Political thought of the colonial period and its Institutions. The second most important source of the power of Islam is the Muslim masses. The Muslim masses, too, were largely uncontaminated by the political thought of the colonial period. They responded to the emotions of nationalism On such occasions as the question of the ownership of the Anglo-Iranian oil Company is 1951. Nationalist leaders in other parts of the world have also succeded in temporarily mobilizing the masses against their patrons, the colonial powers, But at no time before had the Muslim masses in any part of the world been offered on Islamic Leadership that was independent of Muslim monarchies as well as outside the political thought of the colonial period. In the muslim masses of Iran the ulama also discovered a fathomless source of the power of Islam that had not been tapped by the Islamic movement before. This was in sharp contrast to the view Maulana Maudoodi took of the muslim masses, regarding them as 'Ignorant' and 'nominal muslims'. The fusion of the ulama and the Muslim masses in Iran has produced the unique and invincible power of Islam that defeated the established regime, defeated the internal sources of counter-revolution, defeated external military and economic intervention, and is fighting a prolonged war against a confederacy of global and regional enemies. This unique power of Islam has also created a new state with a new constitution and a whole range of new Islamic institutions outside the framework of the political thought of the colonial period. Within a short period the Islamic revolution has outdone the system of domination so Laboriously perfected by the colonial powers and their agents over three hundred years.

The critical breakthrough has been made. Two very rich sources of the power of Islam, the ulama and the masses, both outside the striaitjacket of colonial political thought, have been discovered and brought together in much the same relationship as existed between the 'muttaqi' leaders and the people in the Medina of the Prophet and the Khulafa-e-Rashidin. It was this political link of taqwa in the leadership and its reflection in the masses that had been fractured by the coming of monarchy to

the house of Islam from the begining of Umaiyad rule in Damscus. The gulf between the rulers and the Muslim masses widened progressively throughout history. But as Imam Khomeini pointed out in his comment on the passing of the Uthmaniyah state, while the origin of political power, however deviant, was within the house of Islam there was always the chance of closing the gap. With the coming of colonialism, especially of Muslim political thought born of colonialism, this gulf became unbridgeable. The Islamic parties' and other Islamic movements that tried to bridge the gulf failed and eventually ended up or the side of the ruling classes created by colonialism, with few or no links with the muslim masses.

The great contribution of Islamic revolution in Iran is that this ever-widening gulf between the rulers and the ruled has been irrevocably bridged. This has been achieved by creating new centres of stability, excellence, power and taqwa from among the ulama and the people on the mainland of Islam and by sinking the island of jahiliyyah that had become attached to it, like a parasite, under the influence of colonialism.

I venture to suggest that the Islamic revolution in Iran has followed an entirely new political concept and method in the history of Islamic movements. In Iran there is no assumption of at least partial excellence and 'Christian' affinity between the west and Islam: Instead there is total rejection and no compromise on the basic issues of state and politics in Islam and in a Muslim society. In Iran there was no arrogance based on the assumption of excellence and knowledge on the part of the leaders and contempt for the `ignorant' masses, other 'Islamic parties' and movements assumed that the Muslim colonial elites, insitutions and the 'democratic' political processes of the colonial period could be used or persuaded to become 'Islamic' no such assumptions were made in Iran. In Iran the colonial elite, its institutions and procedures were all confronted, defeated, abolished and punished.

The fallen giant of Islam has risen again at least in Iran and the fear that this has instilled in the hearts of the global power of kufr, and among the Muslim agents of kufr, can be seen and felt everywhere. The political pygmies of colonialsim are preparing to fight Islam yet again. Islam had to fight its way out of the Hijaz 1400 years ago and it will have to fight its way back on the stage of history now. The new political power of Islam that is the Islamic state of Iran, has to infuge its strength into the rest of the Ummah, bypassing the rulers and the colonial elites, and reaching The ulama and the muslim masses directly."

(Issues in the Islamic movement, 1985-86, Page. 30-32)

৩। কারবালায় ইমাম হোসাইনের মহান কোরবানীর দর্শন ও শিক্ষার পুনরুজ্জীবনঃ-

সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে এক চরম সন্ধিক্ষণে কারবালার মরু প্রান্তরে মহানবী (সাঃ) এর প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হোসাইন সত্যের পক্ষে মহান সাক্ষ্য বা শাহাদাতকে বরণ করে নেন। ইয়াজিদ যখন মুসলিম জনতার নেতৃত্বের আসনে বসে বস্তুগত শক্তিবলে সত্য ইসলামের মাঝে নানারূপ বিকৃতি আনার চেষ্টা করে ইমাম হোসাইন তখন তার প্রতিবাদ করেন,ইয়াজিদের অবৈধ নেতৃত্বকে তিনি অস্বীকার করে। সত্য ও মিথ্যা সম্পর্কে জনগণ যখন দ্বিধান্বিত ইমাম হুসাইন তখন বুকের তাজা রক্ত আখরে প্রিয় ইসলামকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করেন। তারপর রাজতান্ত্রিক যুগে কারবালার এই মহান ত্যাগকে বিকৃত ইতিহাসের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। বলা হয় এটি ছিল নিছক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, ভুল বুঝাবুঝি। ইয়াজিদের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয় ইমাম হোসাইন মুসলিম বিশ্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিলেন, ইসলামী রাষ্ট্রের বিদ্রোহী (বাগী) হয়েছিলেন এবং তিনি ছিলেন খারেজী (নাউযুবিল্লাহ)। জনতার রোষ থেকে বাঁচার জন্য প্রচার করা হয় যে, ইয়াজিদ ইমামকে হত্যা করতে চায়নি। তবে কুফার গভর্নর দুর্ধর্ষ ইবনে জিয়াদ ভুলক্রমে এ দুষ্কর্মটি করে ফেলেছে। ইয়াজিদ একথাও বলে যে ইমাম হোসাইন কারবালায় শহীদ হবেন এটি আল্লাহরই ইচ্ছা, আর ইয়াজিদ ক্ষমতাসীন থাকবে এটিও আল্লাহরই ইচ্ছা। অথচ এটি ছিল তাকদীরের সুস্পষ্ট অপব্যাখ্যা। তাছাড়া তার অনুগত প্রচারকরা সবর বা ধৈর্য্যের অপব্যাখ্যা করে প্রচার করে যে অন্যায় ও জুলুমের যুগে চুপ থেকে ধৈর্য্য ধরাই শ্রেয়। কেননা 'আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।'

পরবর্তীকালে ইয়াজিদপন্থী বাদশাহী স্বৈরশাসকরা একই পন্থায় জনতার আন্দোলনকে দাবিয়ে দেয় ও সঠিক ইমাম ও আলেমদের প্রতিরোধকে অপপ্রচার ও গুপ্তহত্যার মাধ্যমে মোকাবেলা করে। তাই ইমাম হোসাইনের শাহাদাত হয়ে পড়ে অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে জীবন্ত প্রতিবাদ। ইসলামী বিপ্লবে ইমাম খোমেনী ইরানে জনগণের কারবালার শহীদদের প্রতি সহস্রাধিক বছরের লালিত ভালোবাসা, শোক ও আবেগকে শক্তিতে পরিণত করেন। সংগ্রামী আলেমগণ সবসময়ই কারবালায় ইয়াজিদের ষড়যন্ত্র ও নৃশংসতা ও ইমাম হোসাইনের সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস ও তাঁর মহান ত্যাগের দর্শনকে ব্যাখ্যা করতেন ও শোকগাঁথা ও শোক-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ জুলুমবিরোধী চেতনাকে জাগ্রত রাখতেন। যেখানেই অন্যায় ও জুলুম সেখানেই কারবালার চেতনা। হোসাইনী মহব্বতে পাগলপারা জনগণ ইয়াজিদী শাসন শোষণের বিরুদ্ধে সদা জাগ্রত।

আশুরা উপলক্ষে ইমাম খোমেনী এক বক্তৃতায় বলেন "এ মাসে (মুহররম) ওলেমা এবং বক্তাদেরই বা দায়িত্ব কি? সমাজের অন্যান্য স্তরের লোকদের দায়িত্ব কি?

শহীদের নেতা এবং তার সহযোগীবৃন্দ এবং পরিবার আমাদেরকে 'কর্তব্য' শিখিয়েছেন। আর তা হল যুদ্ধ ক্ষেত্রে আত্মত্যাগ এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রের বাইরে প্রচারণা। ইমাম হোসাইন জানতেন কিছু সংখ্যক সহচর নিয়ে বস্তুগত দিক দিয়ে সবকিছুর অধিকারী একজন স্বৈরাচারের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি জানতেন তাদের শাহাদাত ইসলামকে পুনঃজাগরিত এবং বিজয়ী করে তুলবে। ইমাম সাজ্জাদ এবং হযরত জয়নাবের ভাষণও স্মরণীয়। হযরত জয়নাব ইয়াজিদের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি কুফা ও সিরিয়ায় তাঁর ভাষণে বনী উমাইয়াদের মুখোশ উন্মোচন করেদিয়েছিলেন।'

এভাবে ইসলামী ইরানে শত শত বছর ধরেই কারবালার শহীদদের স্মরণে শোক প্রকাশ সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে যায়। যা বিপ্লবের শক্তিশালী বাহন হিসেবে কাজ করে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ হামিদ আলগার বলেন–

"আর বছরের পর বছর ধরে এই ঘটনার স্মরণ নিছক কোন ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক স্মৃতিচারণই নয়, এটা মানবেতিহাসের কোন বিশেষ ঘটনার প্রতি স্মৃতি তর্পন করাও নয়, বরং এটা অন্ততঃপক্ষে ইমাম হোসাইনের মহান কোরবানীর সাথে স্বতঃস্ফূর্ত একাত্মতা ঘোষণা এবং ইমাম হোসাইনের সংগ্রাম, যেটা শিয়ারা গ্রহণ করেছিল সমস্ত নিপীড়নের বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতীক হিসেবে, তার সাথে হৃদয়ের আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে যোগ দেয়ার শপথ। ইরানে বিপ্লব চলাকালীন সময়ে হরহাশেমা যে চমকপ্রদ শ্লোগানটি দেয়া হত এবং যা সুস্পষ্টভাবে শুধু ধর্মীয় প্রয়োজনে নয়, শিয়াদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টির জন্যও ইমাম হোসাইনের গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে, তা হল 'হার্ রুয আশুরা, হার্ মেইদন কারবালা।'

অন্য কথায় যেখানেই মুসলমান আছে সেখানেই আছে স্বৈরাচারী শক্তির মোকাবেলায় সত্য ও ন্যায়ের পথে পতাকাবাহীদের লড়াইয়ের ময়দান।"

(ইসলামী বিপ্লব ইরান দেশে, পৃঃ ৪–৫)

তাই বিপ্লবের আগে ১৯৭৮ সালে সর্বশেষ যে আশুরা উৎযাপিত হয় সেবার শোকানুষ্ঠানগুলোতে শাহী সরকারের মেশিনগান সজ্জিত সৈন্যদের মুখে জনতা কাফনের কাপড় পড়ে মিছিল করে। তারা একের পর এক শাহাদাত বরণ করেন। কতলোক যে শহীদ হন তা বলা কঠিন। সম্ভবতঃ মহররমের প্রথম কদিনের শহীদের সংখ্যা কেবলমাত্র 'কাল শুক্রবারে' (Black friday) তথা ১৯৭৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তেহরানে যে হত্যাযজ্ঞ চলে সেটা ছাড়া বাকী যে কোন ঘটনার চাইতে বেশী।

ফকিহ মুজতাহিদদের গতিশীল সিদ্ধান্ত, ইসলামের সনাতন প্রতিনিধি আলেম

সমাজের বহুমাত্রিক যোগ্য নেতৃত্বে ইসলামের স্বকীয় অবিকৃত নিজস্ব আদলে আন্দোলন গড়ে তোলাকে যদি বিপ্লবের 'সাংগঠনিক ভিত্তি' বলা যায় তবে কারবালার মহান ত্যাগ থেকে চেতনার উজ্জীবনকে 'বিপ্লবের প্রাণ' বলতে হবে।

মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যখন জনতা কারবালার সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ এবং এ শাহাদাত উপলক্ষে শোকানুষ্ঠান করা উচিত কি অনুচিত এরূপ হিসেব নিকেশে দ্বিধাগ্রস্ত, সে সময় ইরানের জনগণ ও আলেমসমাজ শোকানুষ্ঠানকে অধিকতর বিকাশ করে এ অনুষ্ঠানকে চেতনার অগ্নিশপথে পরিণত করেছেন। ইমাম খোমেনীর সবচাইতে প্রিয় ছাত্র আয়াতুল্লাহ শহীদ মুর্তাজা মুতাহ্হারীর লেখনী থেকেই আমরা বুঝতে পারবো ইতিহাসের এ শ্রেষ্ঠ শাহাদাতের শিক্ষাকে তিনি কিভাবে উপস্থাপন করেছেন ঃ

"এ মাতম সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, এ উপলক্ষে যদি কেউ কাঁদে বা কাঁদায় এবং কান্নার মত মুখ করে তার জন্য বেহেশত নির্ধারিত। এর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই মাতমের পেছনে যে গভীর অন্তর্নিহিত দর্শন রয়েছে সেটা হচ্ছে ইয়াজিদ গোষ্ঠী ও ইবনে ইয়াজিদের বিরুদ্ধে এবং হোসাইনের পক্ষে হৃদয়ের তীব্র আবেগানুভূতির প্রকাশ করা। তাই হোসাইন হয়ে পড়েন একটা বিশেষ সময়ের একটা প্রতিষ্ঠান। তিনি হয়ে পড়েন একটা সুনির্দিষ্ট সমাজের প্রক্রিয়া ও ধাঁচের প্রতীক এবং একই সাথে আরেকটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও ধাঁচের প্রত্যাখ্যানকারী প্রতিবাদী হিসেবে তাঁর নামে এই সামান্য এক ফোঁটা অশ্রুও আসলে এক ধরনের আত্মবলীর শামিল। হোসাইনের দলে যোগদানের পথে ইয়াজিদ ও তার সৈন্যরা যে কঠোর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছিল সে কঠিন দুর্যোগময় অবস্থায় প্রকাশ্যভাবে 'শুহাদা' এর জন্য অশ্রুপাত করার মাধ্যমে 'হক' এর প্রতি আনুগত্য স্বীকার ও বাতিলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা নিঃসন্দেহে এক ধরনের আত্মত্যাগ। এ থেকে বুঝা যায় যে হযরত আলী (কাঃ) এর পুত্র হোসাইন এর জন্য শোক প্রকাশ করাটা বস্তুত একটি গতি, একটা আন্দোলন ও সামাজিক সংগ্রাম।'

(চলতি শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলন, পৃঃ ৫৩)

আধুনিক বিশ্বে ইসলামী বিপ্লবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম খোমেনী তাই তার অন্তিম অসিয়তনামায় আশু'রার স্মরণে শোকানুষ্ঠানগুলো জারী রাখতে জোর তাকিদ করেনঃ

"জনগণের স্মরণ রাখা উচিত, কারবালার প্রেরণাদায়ক ঐতিহাসিক মহাঘটনার স্মৃতিচারণের জন্য ইমামদের নির্দেশাবলী। নবী (সাঃ) এর আহলে বাইতের দুশমনদের উপর যেসব ধিক্কার ও অভিশাপ আপতিত হয়েছে তা আসলে যুগ যুগ ধরে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জাতিসমূহের বীরত্বপূর্ণ প্রতিবাদ। আপনাদের জানা উচিত, উমাইয়াদের (তাদের উপর আল্লাহর লা'নত) অত্যাচার আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধিক্কার,

নিন্দাবাদ ও অভিশাপের কথা। যদিও তারা এখন পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত, তথাপি এই ফরিয়াদ ইঙ্গিত বহন করে বর্তমান দুনিয়ার জালেমদের বিরুদ্ধে মজলুম জনতার আর্তচিৎকার। এ জুলুম বিধ্বংসী ফরিয়াদকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। ইমাম (আঃ)-দের স্মরণে শোকগাঁথা ও প্রশংসাসূচক বাক্যগুলোতে প্রতিটি যুগের জালেমদের দ্বারা সংগঠিত অত্যাচার ও দুঃখজনক ঘটনার জন্য জোড়ালোভাবে আলোচিত হওয়া উচিত। আর বর্তমান যুগেও যা হবে আমেরিকা, রাশিয়া ও তাদের দোসরদের বিশেষ করে আল্লাহপাকের পবিত্র হারামের প্রতি বিশ্বাসঘাতক সৌদী রাজবংশের (তাদের উপর আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশ্‌তা ও রাসূলগণের লা'নত বর্ষিত হোক) হাতে মুসলিম বিশ্বের নির্যাতিত-হওয়ার যুগ-জোড়ালোভাবে (আহলে বায়তের স্মরণে ঐ সমস্ত শোকগাঁথা ও প্রশংসাসূচক কাজগুলোতে) আলোচনা করা, অভিশাপ ও ধিক্কার দেয়া উচিত।''

(ইমাম খোমেনীর অসিয়তনামা-পৃঃ ৩১-৩২)

প্রকৃতপক্ষে ইসলামী বিপ্লবের জন্য যত বড় বড় তাত্ত্বিক ভিত্তিই উপস্থাপন করা হোক না কেন, আজকের সমাজের মানুষকে এ ডাকে উজ্জিবীত করা ও গণঅভ্যুত্থানে রূপদানের জন্য প্রয়োজন জ্বলন্ত উদাহরণের, জীবন্ত আদর্শের। ইমাম খোমেনী ইসলামী বিপ্লবে তেরশত বছর আগে ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের জ্বলন্ত মডেল ধরেই তারা ক্ষান্ত হননি বরং সাভাকের গুপ্তচরদের হাতে অসংখ্য আলেমের "Death cell" এ চরম নির্যাতন ভোগ ও শাহাদাতবরণ এ বিপ্লবকে বাস্তব গতি দান করেছে। তত্ত্বকে বাস্তবতায় রূপ দিয়েছে। আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস, প্রিয় নবী (সাঃ) এবং এর মহান সঙ্গীগণ ও পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা, ইসলামের প্রতি অন্তরের আকুতি যথার্থভাবেই শাহাদাতের (সাক্ষ্যদানের) মাধ্যমে প্রকাশ ঘটেছে। এরই বাস্তব ফসল ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লবের সফলতা। শুধু ইসলামী বিপ্লব সংগঠনের সময়ই নয় বরং বিপ্লব সুসংহত করার সময় ইসলামী বিপ্লবের মহান আলেমগণ জনগণের শ্রদ্ধাভাজন আয়াতুল্লাহ বেহেসতী, আয়াতুল্লাহ মুতাহ্‌হারী, আয়াতুল্লাহ সাদুকী, ইসফাহানী, দাস্তগায়েব, প্রেসিডেন্ট রাজাই, প্রধানমন্ত্রী বাহোনার, ডঃ মুফাতেহ, ডঃ মুস্তফা চামরানসহ অসংখ্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আল্লাহর পথে শহীদ হন, শহীদ হন সাম্রাজ্যবাদের পুতুল ইরাকী বাহিনী ও মুনাফিকিন খালকের হাতে অসংখ্য জনতা। এ হোসাইনী শাহাদাতই ছিল ইসলামী বিপ্লবের প্রাণ। কারবালার আদর্শের উজ্জীবন ছাড়া আমরা আধুনিক মুসলিম বাদশাহ রেজা শাহ কিংবা মুসলিম নামধারী বীর বর্বর সাদ্দামের বিরুদ্ধে কোন ইসলামী বিপ্লবের সংগঠন বা সংহতি কি কল্পনা

করতে পারি?

পরিশেষে একথা নিঃসন্দেহ বলা যায়, নবী-রাসূলগণের (সাঃ) সুযোগ্য উত্তরাধীকারী মহান মুজতাহিদ হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) এর নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লবের সফলতার মৌলিক কারণগুলো হলো-ফকিহ মুজতাহিদদের গতিশীল ইজতিহাদ, ইসলামী আদর্শের অবিকৃত সাংগঠনিক রূপ যা বহুমাত্রিক যোগ্যতাসম্পন্ন আলেমদের নেতৃত্বে সংগঠিত এবং সর্বোপরি কারবালায় প্রকৃত ইসলামের জন্যে প্রাণ উৎসর্গকারী শহীদদের নেতা হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ) এর শাহাদাতের প্রতি ইরানী জনগণের শোক-ভালোবাসাকে শক্তিতে পরিণত করে বিপ্লবকে প্রাণ সঞ্চার করা হয়েছিলো। এ তিনটি মৌলিক কারণকে সমন্বিত করে ইমাম খোমেনী (রহঃ) ইসলামী বিপ্লবকে যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছিয়েছেন। এটিই তাঁর বড় সাফল্য।

ইমাম খোমেনী (রহঃ)—এর জীবন ও চিন্তাধারা

মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ

আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ আল-মুসাভী আল খোমেনী বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় নেতা এবং ইরানের ইসলামী বিপ্লবের সফল রূপকার। তাঁর মত সুযোগ্য আলেম-এ-দীন এবং রাজনীতি সচেতন ধর্মীয় নেতা সমসাময়িক ইসলামের ইতিহাসে বিরল। মানুষের পারিবারিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের আমূল পরিবর্তন ও সংশোধনে একজন সফল নেতা হিসাবে তিনি বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন।

তারুণ্যের সজীব সচেতন জীবন প্রবাহ থেকে শুরু করে ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি "জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্‌র" উপর দৃঢ় চিত্তে অবিচল ছিলেন। সুদীর্ঘ আড়াই হাজার বছরের পাহলভী রাজতান্ত্রিক শাসনের বধ্যভূমিতে জমে থাকা পাহাড়সম আবর্জনা সাফ করে তার উপর পুতঃপবিত্র ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েম করতে যেয়ে তাঁকে একদিকে আভ্যন্তরীণ চরম বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে; অন্যদিকে দুই পরাশক্তির বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন আপোষহীন। এছাড়া তাঁকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তল্পীবাহক মুসলিম দেশসমূহের অপরিণামদর্শী শাসকবর্গ এবং তথাকথিত সরকারী আলেমদের চরম বিরোধিতারও সম্মুখীন হতে হয়েছে।

তৃণমূল থেকে মানুষের আত্মসংশোধন ও গণজাগরণে ইমাম খোমেনী (রহঃ) ছিলেন একজন সফল বিপ্লবী। দুনিয়ার চাকচিক্য ও বিলাসিতার গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাওয়া ভোগবাদী একটি জাতিকে কাবাকেন্দ্রিক সহজ-সরল জীবন গঠনে তিনি অনুপ্রাণিত করেছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আত্মনিবেদিত সাহাবীদের মত তাগুতি শক্তির চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন কায়েমের দীক্ষায় তিনি সুনিপুণভাবে তাঁর অনুসারীদের উদ্বুদ্ধ করেন। যার ফলশ্রুতিতে শুধুমাত্র দুনিয়া কাঁপানো "আল্লাহু আকবর" শ্লোগানে বলীয়ান ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের জনগণ "তলোয়ারের বিরুদ্ধে রক্তের বিজয়" অর্জনে সক্ষম হয়।

"প্রাচ্য নয় পাশ্চাত্য নয়- ইসলাম ইসলাম"-এই ইনকিলাবী আওয়াজে ইমাম খোমেনী (রহঃ) সমগ্র বিশ্বের মজলুম মুসলমানকে মুক্তির দিশা বাতলিয়ে দিয়েছেন।

লেখক ঃ সহকারী সম্পাদক, মাসিক দীন দুনিয়া, বায়তুশ শরফ কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম

আজ পৃথিবীর দেশে দেশে নব উত্থিত ইসলামী বিপ্লবের জিহাদী কর্মীরা তাঁর সংগ্রামী জীবন ও চিন্তাধারা থেকে লাভ করছে মৃত্যুঞ্জয়ী অনুপ্রেরণা।

ইমামের জন্ম ও বাল্যকাল : ইমাম খোমেনী (রহঃ) ১৯০১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে প্রায় সাড়ে তিন শত কিলোমিটার দক্ষিণে মধ্য প্রদেশের খোমেইন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। দিনটি ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রিয়তমা কন্যা হযরত ফাতেমা জাহ্‌রা (রাঃ)-এর শুভ জন্মদিন। ইরানী জনগণ বহু শতাব্দী যাবত এ দিনটিকে শ্রদ্ধাভরে উদযাপন করে থাকে।

ইমাম খোমেনীর প্রকৃত নাম রুহুল্লাহ্‌। অর্থাৎ আল্লাহর রুহ বা চেতনা। তাঁর পিতার নাম আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ মুস্তফা মুসাভী এবং মাতার নাম হাজেরা। তাঁর পিতা-মাতা দু'জনেই ছিলেন প্রখ্যাত আলিম পরিবারের সন্তান। তাঁর দাদার নাম আল্লামা সাইয়্যেদ আহমদ মুসাভী এবং নানার নাম আয়াতুল্লাহ্‌ মির্জা আহমদ। উভয়ে ছিলেন ধর্মীয় শিক্ষক ও প্রখ্যাত আলেম।

ইমামের জন্মের মাত্র কয়েকমাস পর তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। পনর বছর বয়সে স্নেহময়ী মাও জান্নাতবাসী হন।

শৈশবের এসব বেদনা-বিধুর শোকাবহ ঘটনা তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জনে বিশেষ সহায়ক হয়। ব্যক্তিগত শত অসুবিধার মধ্যেও তিনি অটল মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যান এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষায় তাঁর প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগাতে শুরু করেন।

শিক্ষা জীবন : বাল্যকালে ইমাম খোমেনী (রহঃ) ছিলেন একজন বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রতিভাবান ছাত্র। প্রথমাবস্থায় তিনি বড় ভাই আয়াতুল্লাহ্‌ সাইয়্যেদ মুর্তাজা পসন্দিদাহ্‌র কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে তিনি আরাকের ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা কেন্দ্রে চলে যান। সেখানে প্রখ্যাত আলেম শেখ আব্দুল করিম হায়েরী ইয়াজদির কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এখানে তিনি মাতৃভাষা ফার্সী ছাড়াও আরবী সাহিত্যে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন।

আরাক নগরী থেকে শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় শিক্ষাবিদগণ পবিত্র কোমে চলে আসলে ইমাম খোমেনীও (রহঃ) সেখানে এসে তাঁর গবেষণামূলক অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। ১৯২৭ সালের মধ্যে তিনি ধর্মতত্ত্ব শিক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায় শেষ করেন। এ সময় তাঁর প্রবীণ শিক্ষক আয়াতুল্লাহ হায়েরী ইন্তেকাল করলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসাবে তিনি ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী আইনে একজন সুপণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ হিসাবে সর্বত্র পরিচিতি লাভ করেন। ইমামের শিক্ষা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মূল্যায়ন করে ওস্তাদবৃন্দ তাঁকে মুজতাহিদ হিসাবে ঘোষণা করেন। শিক্ষা জীবনে তিনি ফিকাহ্‌ ছাড়াও দর্শন,

আধ্যাত্মবাদ ও নীতিশাস্ত্রসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

ইমামত লাভ ঃ একজন আদর্শ ধর্মীয় শিক্ষক ও বিজ্ঞ আলেম হিসাবে তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে গোটা দেশের জনগণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হন। ইতোমধ্যে তদানীন্তন প্রধান ধর্মীয় নেতা আয়তুল্লাহ্ বুরুজারদির ইন্তেকালের পর ইমাম খোমেনীকে আলেম সমাজ ও জনগণ তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। এসময় তাঁর প্রায় ৩০ বছরের শিক্ষকতা জীবন পূর্ণ হয়। ইমামতের দায়িত্ব পালনের সুবাদে ১৯৬১ সাল থেকে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ইমাম খোমেনী (রহঃ) জেহাদের এক নতুন গতি সঞ্চার করেন। ১৯৬৩ সালে তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঃ ইরানের রাজতন্ত্রী পাহ্লভী বংশের অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে ইমাম খোমেনী (রহঃ) জীবনের গোড়া থেকেই বিক্ষুব্ধ ছিলেন। শিক্ষকতা জীবনের সূচনা থেকে তিনি তাঁর পরিবেশে রাজতন্ত্রের সমালোচনা শুরু করেন।

সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইমাম খোমেনীর আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন দেখা যায় "কাশফ-আল-আসরার" নামক তাঁর লেখা যুগান্তকারী গ্রন্থে। এতে তিনি ইরানের সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে মুসলমানদের প্রতি রাজতন্ত্র উৎখাত করে ইসলামী সমাজ কায়েমের আহবান জানান। শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ রাজনৈতিক মনোভাব গ্রহণ করায় স্বৈরশাসক শাহের গুপ্তচররা ইমামকে তাঁর কর্মতৎপরতা বন্ধের নির্দেশ দেয়। কিন্তু ধীরে অথচ অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে তিনি জনগণের মাঝে তাঁর জ্ঞানদীপ্ত বাণী প্রচার করতে থাকেন।

১৯৬৩ সালের ২২ মার্চ হযরত ইমাম জাফর সাদিক (রহঃ)-এর শাহাদাত দিবস উপলক্ষে কোমের ঐতিহাসিক ফায়জিয়া মাদ্রাসায় আয়োজিত মাহফিলে পুলিশের পৈশাচিক হামলায় বহু নিরীহ ছাত্র শাহাদাত বরণ করে। এ সময় দোর্দণ্ড প্রতাপশালী শাহের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র ভাষায় এক বিবৃতি প্রকাশ করে বলেন-ঃ

হে শাহ্! আমি তোমাকে নসিহত করছি যে, তুমি এ কাজ ছেড়ে দাও। সুবিধাভোগী সহচররা তোমাকে গাফিল করে দিচ্ছে। আমি চাই না যে, সেদিন আসুক যেদিন তোমাকে পালিয়ে যেতে হবে এবং জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। তিনি আরও বলেনঃ তুমি তোমার দুষ্কর্মসমূহ পরিত্যাগ কর। জাতির সাথে এত নির্মম কৌতুক করো না। ওলামায়ে কেরামের এত বিরোধিতা করো না। ওলামায়ে কেরাম কি নাপাক জানোয়ার? তুমি বলেছ এ'সব লোক অপবিত্র জানোয়ার। জাতি কি এদের সম্পর্কে এরূপই ভেবে থাকে? যদি ওলামায়ে কেরাম অপবিত্র জানোয়ারই হয়ে থাকে তাহলে সমগ্র জাতি কেন তাদের হস্ত চুম্বন করে? কখনো কি কোন ব্যক্তি অপবিত্র

জানোয়ারের হাত চুম্বন করে? ইমাম খোমেনীর এরূপ অনলবর্ষী বক্তব্যে শাহের মসনদ কেঁপে উঠে।

কারাবরণ ও নির্বাসন : ৩ জুন '৬৩ ইমাম খোমেনী বিদেশী শক্তির উপর শাহের নির্ভরশীলতা এবং বিশ্ব মানবতার দুশমন ইসরাইলের প্রতি সমর্থনের প্রতিবাদে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। ঐ ভাষণে তিনি মূলতঃ আলেম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। এতে আলেম সমাজ শাহ্ বিরোধী আন্দোলনকে দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দেন। শাহ্ ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

এর মাত্র দু'দিন পর ৫ জুন '৬৩ ইমাম খোমেনী (রহঃ)কে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু পূর্বাহ্নে প্রদত্ত ইমামের তেজোদীপ্ত ভাষণ কোমবাসীকে নামিয়ে আনে রাজপথে। বিদ্যুৎবেগে ইমামকে গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। একটানা দু'দিন ধরে রাজধানী তেহরানসহ দেশের প্রধান প্রধান শহরে শাহের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ক্রমবর্ধমান আন্দোলনকে দমিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ৫ জুন '৬৩ শাহ্ রাস্তায় ট্যাংক নামিয়ে বহু লোককে শহীদ করে। প্রকৃত প্রস্তাবে সেদিনই বপিত হয় ইরানে ইসলামী বিপ্লবের বীজ।

কারামুক্তি ও নির্বাসন : মুক্তিকামী মজলুম জনতার প্রবল চাপের মুখে শাহ্ বাধ্য হলো ইমাম খোমেনীকে মুক্তি দিতে। মুক্তিলাভের পর তিনি আবার ফিরে এলেন বিপ্লব প্রসবিনী কোম নগরীতে। পুনরায় আরম্ভ করলেন রাজতন্ত্র বিরোধী দুর্বার গণ-আন্দোলন।

শাহ্ ইমামকে পথের কাঁটা ভাবলো। তাই তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখার লক্ষ্যে ১৯৬৪ সালের ৪ নভেম্বর তুরস্কে নির্বাসনে পাঠানো হয়। ইরানের বিপ্লবী আলেম সমাজ ও ছাত্র-জনতা ইমামের নির্বাসনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনা করে আবেদন জানান। ঠিক সেই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে তুরস্ক সরকার ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে ইমাম খোমেনীকে শাহের ইংগিতে ইরাকে পাঠিয়ে দেয়।

নির্বাসিত অবস্থায় ইমাম খোমেনী (রহঃ) ইরাকের ঐতিহাসিক নাজাফ শহরে একটি বাসগৃহের ব্যবস্থা করেন। এখানে তিনি ইরান থেকে গোপনে আসা ইসলামী সমাজ বিপ্লবীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে থাকেন। পাশাপাশি ইরাকের বামপন্থী কম্যুনিস্ট সরকরের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপেরও সমালোচনা করতে শুরু করেন।

১৯৭৮ সালে ইমামের প্রথম পুত্র আলহাজ্ব মোস্তফা খোমেনী শাহের গুপ্ত পুলিশ বাহিনী সাভাক কর্তৃক শাহাদাত বরণ করলে ইরানী জনতার ক্ষোভ ও রোষাগ্নির যে

বহিঃ প্রকাশ ঘটে তাতে শাহ্ দিশেহারা হয়ে পড়ে। শাসক গোষ্ঠী বুঝতে পারে যে, প্রতিবেশী দেশ ইরাক থেকে নির্বাসিত ইমামের পরোক্ষ ইঙ্গিতে জনতা দিন দিন মারমুখো হয়ে পড়ছে। মৃত্যুকেও তারা পরোয়া করছে না। এমতাবস্থায় ইরাক সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ১৯৭৮ সালের ৩ অক্টোবর ইমাম খোমেনী (রহঃ)-কে ইরাক থেকে বহিষ্কার করা হয়।

ভগ্ন হৃদয়ে ইমাম কুয়েতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু রাজতন্ত্রের দোসর কুয়েতী সাবাহ্ সরকার তাঁকে সেদেশে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। অতঃপর ইমাম স্বীয় পুত্র আহমদের পরামর্শক্রমে ৫ অক্টোবর '৭৮ ফ্রান্সে গমন করেন। প্যারিসের নিকটবর্তী "নউফেলে লা শাতু" নামক একটি গ্রামে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখান থেকে ইরানী জাতির উদ্দেশ্যে শাহ্ বিরোধী ইসলামী বিপ্লবের পয়গাম পাঠাতে থাকেন।

এ সময় জনতার রুদ্ররোষে রেজা শাহ্ পাহ্লভীর আড়াই হাজার বছরের পাকাপোক্ত সিংহাসন নড়বড়ে হয়ে উঠে। আমেরিকা ও ইসরাইলের প্রত্যক্ষ মদদপুষ্ট শাহের সুসজ্জিত সেনাবাহিনী ও গুপ্ত পুলিশ বাহিনী কামানের গোলা দাগিয়েও জনতার বজ্রমুষ্টি স্তব্ধ করতে পারলো না। নির্যাতনের হাজার উপায়-উপকরণ ব্যর্থ হলে শাহ্ আমেরিকা ও পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর প্রিয়ভাজন শাপুর বখতিয়ার সরকারের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে ইরান থেকে পালাতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইরানী জনতা ইমাম খোমেনী ছাড়া আর কারো নেতৃত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে সুদীর্ঘ ১৫ বছরের নির্বাসিত জীবন ত্যাগ করে দিগবিজয়ী বীরের মত ফ্রান্স থেকে ১৯৭৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারী লক্ষ জনতার মাঝে ইমাম ফিরে আসেন।

ইমাম খোমেনী (রহঃ) লক্ষ লক্ষ শহীদের পবিত্র রক্তের বিনিময়ে ইরানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ও ইসলামী সরকার কায়েম করেন। দেশী-বিদেশী হাজারো ষড়যন্ত্র নস্যাত করে এবং ইরাক কর্তৃক ৮ বছরের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে এ অকুতোভয় বীর সেনানী ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানকে পৃথিবীর মানচিত্রে একটি সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত করেন।

ইন্তেকাল: প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা, কনিষ্ঠ পুত্র হুজ্জাতুল ইসলাম সাইয়্যেদ আহমদ খোমেনী, তিন কন্যা সিদ্দিকাহ, ফরিদাহ্ ও ফাতিমা, ১৩ জন নাতী-নাতনী এবং স্বদেশে ও বিদেশে কোটি কোটি ভক্ত অনুরক্তকে শোক সাগরে ভাসিয়ে তিনি ১৯৮৯ সালের ৩ জুনএ নশ্বর পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন। ৬ জুন কোটি লোকের জানাযা শেষে তেহরানস্থ বেহেশতে জাহরায় ইমামকে কবরস্থ করা হয়।

ধর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ইমাম খোমেনীর চিন্তাধারা : ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে কোন আলেম যখন মুসলিম জনতার উদ্দেশ্যে আহবান জানান

তখন সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট ও কিছু সরকারী আলেম ফতোয়া ছাড়েন 'ইসলামে রাজনীতি হারাম, যারা মসজিদে-মাদ্রাসায় রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় আলোচনায় লিপ্ত তারা সম্পূর্ণরূপে বিদয়াতে লিপ্ত।'

এমতাবস্থায় প্রশ্ন জাগে ইসলামে রাজনীতি কি হারাম? ধর্ম ও রাজনীতি কি একে অপরের পরিপূরক? এরূপ হাজারো প্রশ্নের উত্তর মেলে বিংশ শতাব্দীর ক্রান্তিকালে ইসলামী বিপ্লবের সফল রূপকার ইমাম খোমেনী (রহঃ)-এর চিন্তাধারায়।

ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতির বিভাজনকে প্রত্যাখ্যান করে ইমাম খোমেনী বলেনঃ ইসলাম ধর্ম রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন বা ভিন্ন – আমাদের যুবকদের মনে বদ্ধমূল এই ভুল ধারণাকে তোমরা ধূলিস্যাৎ করে দাও, মিথ্যা বানিয়ে দাও। দীন ইসলাম শুধু হায়েয-নিফাসের পাঠ দেয়, রাজনীতি বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় তার বলার বা করার কিছু নেই-এই মারাত্মক ভুল ধারণার পর্বতকে তোমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতো নিজেদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে জনমনে এই ধারণাই শক্ত করে বসিয়ে দিয়েছে যে, ধর্ম ও রাজনীতি পরস্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটির সাথে অপরটির একবিন্দু সম্পর্ক নেই। সেই সাথে তারা এই ধারণাও জনমনে সৃষ্টি করেছে যে, ইসলামের আলেমগণ রাজনীতি ও সামাজিক সমস্যাদিতে যথার্থ ভূমিকা পালনের যোগ্যতারই অধিকারী নয়। আমি জিজ্ঞেস করি, রাসূলে করিম (সাঃ)-এর সময়ে ধর্ম কি রাজনীতি থেকে ভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন ছিল? খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে রাজনীতি কি ধর্মহীন বা ধর্ম বিবর্জিত ছিল?

এ রকম ভুল ধারণা সৃষ্টি করে আসলে সাম্রাজ্যবাদীরা একটি লক্ষ্যই অর্জন করতে চেয়েছে আর তা হচ্ছে, একদিকে দীন ইসলামকে মানুষের জীবন ও সমাজ থেকে নির্বাসিত করা, বাস্তব জীবনে দীন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বোধ নিঃশেষ করে দেয়া এবং আলেমগণকে জনগণ থেকে এবং জনগণকে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও প্রতিষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন করা। কেননা আলেমগণই ইসলামের সঠিক বিপ্লবী জ্ঞানের সাথে পরিচিত। তারা জনগণকে ইসলামের প্রকৃত শত্রুদের চিহ্নিত করতে পারে এবং ইসলামের শাশ্বত বাণীতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। ওরা চাচ্ছে, তোমরা যেন কখনো সচেতন হয়ে না উঠ। কেননা সচেতন ও অনমনীয় মানুষকে ওরা খুব বেশী ভয় পায়। .... এ কারণেই ওরা আমাদের মধ্যে তেমন কোন সচেতন ব্যক্তির সন্ধান পেলে হয় তাকে চিরতরে স্তব্ধ ও নিষ্ক্রীয় করে দেবে, না হয় হত্যা করবে। আর হত্যা করা সম্ভব না হলে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করবে। তাও যদি সম্ভব না হয় তবে জনগণের মধ্যে রটনা করে দেবে যে, লোকটি রাজনীতি করে। .... অথচ এই অবুঝ লোকেরা এতটুকু বোঝে না যে, রাজনীতি করা হারাম নয়; রাসূলে করীম (সাঃ)ও রাজনীতি করেছেন, পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছেন এবং স্বীয় নেতৃত্বে দশ বছর পর্যন্ত তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে আমাদের জন্য প্রকৃষ্ট উদাহরণ রেখে গেছেন। সুতরাং

রাজনীতি করা শরীয়ত নিষিদ্ধ কাজ নয়। এই গোটা জগতই তো রাজনৈতিক। এখানে রাজনীতি না করলে টিকে থাকাই তো সম্ভব নয়।

আত্মসংশোধন ও নৈতিকতা প্রসঙ্গে ইমাম ঃ ব্যক্তিগত উন্নতি কি সামাজিক উন্নতি বিধান, সর্বক্ষেত্রেই ব্যক্তির আত্মসংযম ও আত্মসংশোধন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কারণ মানুষের অভ্যন্তরে ভাল ও মন্দ বা রূহ ও নফসের অবিশ্রান্ত সংঘাত লেগে আছে। যারা আল্লাহর হুকুম, রাসূলে পাক (সাঃ)-এর সুন্নত ও আউলিয়া-কেরামের দেখানো পন্থায় সাধনা চালিয়ে যায় তাদের রূহ নফসের উপর জয়ী হয়। ভালোর সৈনিকরা মন্দের বাহিনীকে পরাজিত করে। তখন সবর, শোকর, প্রেম, দয়া, দানশীলতা, আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গের বাসনা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলী মানব জীবনকে সুশোভিত করে। অন্যথায় মানুষ নফসের কামনা-বাসনায় তাড়িত হয়ে লোভ, মোহ, হিংসা, হিংস্রতা প্রভৃতি অমানবিক আচরণের মাধ্যমে পশুর স্তরে নেমে যায়। এরা দেশ, জাতি, ধর্ম ও সমাজের কল্যাণ বয়ে আনে।

আত্মসংশোধন ও নৈতিকতা সম্পর্কে ইমাম খোমেনী (রহঃ)-এর অভিমত হলোঃ আমি মনে করি নৈতিক সংশোধনের অভাব এবং ইসলামী নৈতিকতা সম্পর্কে অজ্ঞতাই মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্ততার মূল কারণ। আপনারা যদি এ প্রসংগে ইসলাম ও নবীদের ইতিহাসের দিকে তাকান তাহলে দেখতে পাবেন অন্য কিছুর চাইতে পথভ্রষ্ট ও অসচ্চরিত্র লোকদের দ্বারাই ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চারিত্রিক অসততাই তৌহিদবাদী ধর্মগুলোকে ধ্বংস করেছে এবং তাদের বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আল্লাহর শাশ্বত বাণী আল-কুরআন অন্যান্য বিষয়ের চাইতে মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক সংশোধনের উপর জোর দিয়েছে বেশী। কারণ অন্য কিছুর চাইতে মানুষের নৈতিক সংশোধনই বেশী প্রয়োজন। যারা এ গুণাবলী অর্জনে সক্ষম হবে তাদের দ্বারাই দুনিয়ার কামনা-বাসনা, ভয়-ভীতি প্রভৃতিকে উপেক্ষা করে দৃঢ়চিত্তে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ করা সম্ভব হবে। তারাই আনতে পারবে নির্যাতিত মানবতার মুক্তি ও স্বাধীনতা।

আলেম সমাজের প্রতি ইমামঃ আলেম সমাজের দায়িত্ব সম্পর্কে ইমাম খোমেনী বলেন ঃ ইরানের ইসলামী বিপ্লব নায়েবে রাসূল হিসাবে আলেম সমাজকে তার যোগ্য আসন প্রদান করেছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ভাল কাজে যেখানে আলেম সমাজের অবদান স্বীকৃত, সেখানে রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা তথা সামাজিক ক্রিয়াকর্ম থেকে তাদের সরিয়ে রাখা সাম্রাজ্যবাদী শোষক শ্রেণীর এক বিরাট ষড়যন্ত্র। শুধু তাই নয়-এই জনবিচ্ছিন্নতা কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী।

ইমাম খোমেনী (রহঃ) ইমামদের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর

অসিয়তনামায় সুস্পষ্টভাবে বলেনঃ শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজের প্রতি আমার পরামর্শ, বিশেষ করে আমাদের সম্মানিত দীনী উৎস মারজাদের (যারা জনগণের সকল দীনি কর্মকাণ্ডের দায়িত্বশীল যারা আলেম সমাজের সর্বোচ্চ স্তরের ব্যক্তিত্ব; দীনি মাদ্রাসাগুলোতে সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভের পর তারা নিজেরা অব্যাহতভাবে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা করে জনগণের দৈনন্দিন জীবন থেকে সর্বস্তরের মাসলা-মাসায়েলের উত্তর দিয়ে থাকেন) প্রতি আমার অসিয়ত-তারা যেন সমাজের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও সংসদ নির্বাচনের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি উদাসীন না থাকেন। এ সবের সংস্পর্শকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করবেন না। আপনারা সকলেই স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন, ভবিষ্যত বংশধররাও পড়বে এবং শুনবে যে, পাশ্চাত্য বা প্রাচ্যপন্থী ঝানু রাজনীতিবিদরা রাজনৈতিক পটভূমি থেকে উলেমাদের উৎখাত করতে চেয়েছিল, অথচ এ সমস্ত আলেমগণই শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের শিকড়কে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিপুল কষ্ট ও পরিশ্রমের বিনিময়ে। অপরদিকে আলেমরাও এই ঝানু রাজনীতিবিদদের ছল-চাতুর্যের খেলায় ধোঁকা খেয়েছিলেন আর রাষ্ট্রীয় ও সাধারণ মুসলমানদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে জড়িত হওয়াকে তাদের জন্য মর্যাদাহানিকর কাজ বলে মনে করতে শুরু করলেন এবং এও দেখেছেন, রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে কিভাবে আলেমগণ বিদেশী পুতুলদের কাছে রাজনৈতিক ময়দানকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন, সংবিধান, দেশ ও ইসলামের যে বিরাট ক্ষতি হয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন।

এখন যেহেতু সর্বশক্তিমান আল্লাহর রহমতে সকল বাধা-বিপত্তি অপসারিত হয়েছে এবং সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য ব্যক্তিগত দায়িত্ব এড়ানোর জন্য আর কোন ওজর আপত্তি থাকলো না। আমি আপনাদেরকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, তা হল মুসলমানদের সামাজিক কাজকর্মের ব্যাপারকে অবহেলা করা একটা অমার্জনীয় অপরাধ-কবিরা গুনাহ। প্রত্যেককে অবশ্যই সাধ্যমত সমাজে নিজ নিজ প্রভাব অনুযায়ী ইসলাম ও দেশের সেবা করতে হবে। মহান ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী পথভ্রষ্ট ব্যক্তিবর্গ, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মতাদর্শের প্রতি আসক্ত লোকদের এবং দুই-উপনিবেশবাদী পরাশক্তির দালালদের অনুপ্রবেশকে অবশ্যই কঠোরভাবে বাধা দিতে হবে। আপনাদের অবশ্যই জানা থাকা উচিত, ইসলাম ও মুসলিম দেশসমূহের দুশমন তথা আন্তর্জাতিক লুটেরা পরাশক্তিগুলো ক্রমান্বয়ে আমাদের দেশে ও অন্যান্য মুসলিম দেশে অনুপ্রবেশ করে সূক্ষ্মভাবে এবং খোদ দেশীয় লোকদের হাতেই ঐ সমস্ত দেশকে শোষণের জালে আবদ্ধ করে। আপনাদের অবশ্যই সজাগ দৃষ্টিতে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা উচিত। আর এ ধরনের অনুপ্রবেশের ইংগিত পাওয়া মাত্রই মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত।

ছাত্র সমাজের প্রতি ঃ আমরা সবাই বলে থাকি "আজকের শিশু আগামী দিনে জাতির কর্ণধার"। "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে"। এই শিশু-কিশোর-তরুণ শিক্ষার্থীদের বৈষয়িক শিক্ষা অর্জন ছাড়াও সামাজিক ক্রিয়াকর্মের জন্য দায়িত্বশীল হিসাবে গড়ে তুলতে না পারলে মুসলিম জনসমাজে নেতৃত্বের বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়। ইরানে আড়াই হাজার বছরের রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এক সময় ইরানের আলেম সমাজ ছিল পরমুখাপেক্ষী, মাসলা-মাসায়েল আর ফতোয়াবাজিতেই তাদের অধিকাংশ সময় কেটেছে। রাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এরূপ অবস্থায় মহা খুশিতে কাল যাপন করে। কারণ শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ড নিয়ে আলেম সমাজের পক্ষ থেকে কোন প্রতিবাদ না উঠলেই তাদের শাসন ও শোষণ প্রক্রিয়া নিরাপদ হয়। এ সময় ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা ম্লান হয়ে সমাজে দুর্নীতি, বেহায়াপনা ও সামাজিক অনাচার বৃদ্ধি পায়।

ইমাম খোমেনী (রহঃ) এ সত্য উপলব্ধি করেছেন বলেই একজন নীরব বিপ্লবী হিসাবে ৩০ বছর যাবৎ প্রচলিত রাজনীতির বাইরে থেকে ছাত্রদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলায় মনোনিবেশ করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন যে, সমাজের বড় বড় আলেম ও নেতৃস্থানীয় লোকদের পক্ষে দীর্ঘদিনের সংগ্রাম বিমুখতা ও আপোসকামিতার পথ পরিহার করে বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনার উপযোগী চেতনার অধিকারী হওয়া অত্যন্ত কঠিন। এ জন্যই ইরানে ইসলামী বিপ্লবের নেতৃত্ব প্রদানকারীদের মধ্যে এমন অনেককে দেখতে পাওয়া যায়, যারা এককালে ইমামের ছাত্র ও সহযোগী ছিলেন।

ছাত্র সমাজের কর্তব্য সম্বন্ধে ইমামের চিন্তাধারা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও পবিত্র। তিনি তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করতে যেয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেনঃ বস্তুতঃ তোমাদের ওপর কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। এখানে জ্ঞান আহরণ ও বিদ্যার্জনের কেন্দ্রে অবস্থানকালেই যদি তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন না কর, তোমরা যদি তোমাদের নিজেদেরকে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করার জন্য সাগ্রহে যত্নবান না হও, কেবল ফিকাহ ও উসুল সংক্রান্ত মাসলা-মাসায়েল শেখার কাজেই যদি এই সময়টা অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে অচিরেই তোমরা সমাজ ও জনগণের জন্য উপকারী না হয়ে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। জনগণের উপকার করার পরিবর্তে তোমরা তাদের ক্ষতি করার কাজে লিপ্ত হবে। আর তোমাদের আচার-আচরণ ও কাজকর্মের কারণে মুসলিম উম্মাহ্‌র একজন সদস্যও যদি পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তোমরা অচিরেই গুনাহ করে বসবে। তোমরা হবে সব চাইতে বড় অপরাধী। তখন এমন অবস্থার উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নয় যে, তোমরা তওবা করলেও

সে তওবা খোদার নিকট কবুল হবে না।

ঠিক যেমন, তোমাদের কারণে একটি লোকও যদি হেদায়েত প্রাপ্ত হয়, তাহলে তা তোমাদের জন্য হবে সূর্যালোকের চাইতেও অধিকতর কল্যাণের কারণ। হাদীস শরীফে তাই বলা হয়েছে"। এই মহান শিক্ষক ছাত্রদেরকে ভবিষ্যৎ জীবনের দিক নির্দেশনা প্রদান করে। আরও বলেনঃ তোমাদের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হচ্ছে, তোমরা নিজেদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলবে যে, গ্রাম বা শহরাঞ্চলে বসবাসকারী জনগণকে যেন তোমরা সঠিক পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব যোগ্যতা সহকারে পালন করতে পার। এইসব জ্ঞান কেন্দ্রে তোমাদের দিনরাত অবস্থানের মাধ্যমে তোমরা নিজেদেরকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলবে। এমন যোগ্যতা সম্পন্ন হয়ে ওঠবে যেন তোমরা জনগণকে ইসলামের বিধানাবলীর উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান করতে পার। কেননা তোমরা নিজেদেরকে যদি সংশোধন ও দোষত্রুটিমুক্ত পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ না কর, তোমরা যদি নৈতিকতার ক্ষেত্রে তাৎপর্যগতভাবে উন্নতমান ও পরিশুদ্ধি অর্জন না কর, তাহলে খুবই ভয় রয়েছে যে, তোমরা জনগণকে হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহ্ করে দেবে এবং জনগণের সম্মুখে ইসলাম ও দীনি আলেমদের একটা অত্যন্ত বীভৎস রূপ তুলে ধরবে।

অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সাহসী ইমাম ঃ ইমাম খোমেনী (রহঃ) সদা-সর্বদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর পথ অনুসরণ করতেন। তিনি কখনো অসত্য ও অন্যায়ের কাছে মাথানত করেননি। জেল, জুলুম, হুলিয়া, নির্বাসন-নির্যাতন যা কিছু তাঁর জীবনে এসেছে তাকে তিনি হাসি মুখে বরণ করে নিয়েছেন। রাসূলে পাক (সাঃ)-এর প্রকৃত অনুসারী হিসাবে "অত্যাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলা উত্তম জিহাদ" এই শাশ্বত বাণীকে নিজের জীবনের ব্রত হিসাবে বেছে নেন।

১৯৬৩ সালের ২২ মার্চ মাদ্রাসা ফয়জিয়ায় শাহ্ এর লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্র বাহিনীর হামলায় শত শত ছাত্র আহত হবার ঘটনায় ইমামের তেজোদীপ্ত ভূমিকা চিরস্মরণীয়।

সেদিন শাহ্কে উদ্দেশ্য করে তিনি তীব্র ভাষায় বলেনঃ হে শাহ্। আমি তোমাকে নসিহত করছি, তুমি এরূপ জঘন্য কাজ ছেড়ে দাও। পার্শ্বস্থ লোকেরা তোমাকে পথভ্রষ্ট করে দিচ্ছে। আমি চাই না যে, সেদিন আসুক যে দিন তোমাকে পালিয়ে যেতে হবে এবং জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে।

ইমামের এ ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছিল। ইরানের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে এবং ইসলামী বিপ্লবের হাজার হাজার কর্মীর বিরুদ্ধে শাহ্-এর নির্বিচার গণহত্যা ও নির্যাতনের বিনিময়েও তার গদি রক্ষা হয়নি। অবশেষে ১৯৭৯ সালের ১৬ জানুয়ারী রাতের আঁধারে তাঁকে একাকী ইরান থেকে পালাতে হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক যে তার বিমানটি পরিচালনার জন্য একজন পাইলটও রাজী হয়নি। সমস্ত

সশস্ত্র বাহিনী নির্বাসিত ইমামের অঙ্গুলি ইশারায় নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়ে।

ইসলামী বিপ্লবের জন্য সিপাহসালারঃ ইরানে ইসলামী বিপ্লবের সফলতার পেছনে রয়েছে ইমামের অটুট মনোবল ও দৃঢ় চিত্ততা। শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উৎখাতের পর ইমামের নেতৃত্বে ইরানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ শাহের উৎখাতের পর কেউ ভেবেছিল ইরানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ধাঁচের কম্যুনিজম কায়েম হবে। আবার কেউ কেউ ভেবেছিল আলেমদের দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা সম্ভব নয় বিধায় সেখানে পাশ্চাত্য ধরনের গণতন্ত্রী সরকার কায়েম হবে। কিন্তু না; সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে দৃঢ়চিত্ত ইমাম 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান' প্রতিষ্ঠা করে বিশ্ব ইতিহাসে এক নজীর স্থাপন করেন।

ইসলামী বিপ্লব সফল হওয়া সম্বন্ধে ইমামকে প্রশ্ন করা হলে তিনি সংক্ষেপে বলেনঃ যা হবার তা আল্লাহ্ পাকের হুকুমেই হয়েছে। আমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছি, আল্লাহ্ আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে এ সফলতা এসেছে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্যের কারণে দুনিয়ার কোন সমর্থন নিয়ে নয়। বরং আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরশীলতা এবং তাঁরই সাহায্যের ফলে, যা পরীক্ষিত হয়েছে লক্ষ লক্ষ লোকের শাহাদাত, পঙ্গুত্ব ও কোরবানীর বিনিময়ে।

এ সম্পর্কে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির মধ্য প্রাচ্যের ভাষা বিভাগের গবেষক প্রফেসর ডঃ হামিদ আলগারের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, আয়াতুল্লাহ খোমেনীর ক্ষেত্রে 'বিপ্লব' কথাটির অর্থ হচ্ছে এই যে, একজন বিপ্লবী নেতা হিসাবে তিনি নিছক বিশ্বাস ও আবেগের কারণে কোন বিশেষ লক্ষ্যের প্রতি শুধু নিবেদিতই নন, বরং তিনি এর সাথে একাত্মও। তিনি ছিলেন পুরোপুরি আপোষহীন। কিন্তু কেন? কারণ তিনি নিছক রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে নিয়োজিত তথাকথিত নেতাদের মত কোন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। তিনি কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য খোদা নির্ধারিত পথে চেষ্টা চালিয়েছেন মাত্র।

বিপ্লবের অব্যবহিত পর পুঁজিবাদী শক্তির ক্রীড়নক খালক ও কম্যুনিজমের ধ্বজাধারী তুদেহ পার্টির হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড এবং শাহের পদলেহী তথাকথিত প্রগতিবাদী মহিলাদের চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও ইমামের আহবানে ১৯৭৯ সালের ৩০ মার্চ এক গণভোটে ইরানী জনগণের শতকরা ৯৮·২ ভাগ ইসলামী প্রজাতন্ত্র কায়েমের পক্ষে ভোট প্রদান করে। এ নির্বাচন ছিল ইসলামী বিপ্লবের প্রথম গণভিত্তি। ১ এপ্রিল ইমাম আড়াই হাজার বছরের রাজতন্ত্রের পরিবর্তে ইরানকে "ইসলামী প্রজাতন্ত্র"

হিসাবে ঘোষণা প্রদান করেন।

পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে ইমাম খোমেনীর নির্দেশে ৭২ সদস্য বিশিষ্ট "মজলিসে খুবরেগান" কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংবিধান প্রণয়ন করেন। ১৯৭৯ সালের ৩ ডিসেম্বর শতকরা ৯৯·৫ ভাগ জনতার রায়ে এ ঐতিহাসিক সংবিধান গৃহীত হয়।

এই দৃঢ়চেতা ইমাম ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারীতে পার্লামেন্ট (মজলিস) নির্বাচন ঘোষণা করে জনতার প্রতি আহবান জানানঃ ইসলামী মজলিসে শুরায় এমন প্রতিনিধিদেরকে পাঠাতে হবে যারা প্রগতিশীল, একনিষ্ঠ, চিন্তাশীল, সাধারণভাবে সমস্ত মানুষের প্রতি বিশেষভাবে নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সেবক।

১১ মার্চ '৮০ তিনি জনতাকে আবার স্মরণ করিয়ে দেনঃ আপনারা আপনাদের ভোট তাদেরকেই দিন যারা ডান বা বাম কোন পন্থীই নয়; বরং যারা তাদের সম্মানজনক অতীত ও ইসলামী আইনের প্রতি তাদের অঙ্গীকার রয়েছে এবং তারা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌র কল্যাণের প্রতি একাত্মতার কারণে সুপরিচিত।

এ ভাবে ইমাম খোমেনী (রহঃ) স্বীয় চিন্তাধারার আলোকে শত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও একটি ইসলামী সরকার কায়েমে সক্ষম হন।

মজলিসে শুরার প্রতি ইমাম ঃ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সংস্কারক ও বিপ্লবী নেতা রাহবার খোমেনী (রহঃ) তাঁর দক্ষ নির্দেশনায় জনগণের ভোটে মজলিসে শুরার ২৩৪ জন সদস্য নির্বাচন করার পর মজলিসের প্রথম অধিবেশনে (২৬ মে ৮০) ১১ দফা ভিত্তিক যে বাণী পেশ করেন তাতে অনাগত ভবিষ্যতে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের 'মজলিসে শুরার" জন্য তা "ম্যাগনাকার্টা" হয়ে থাকবে। ইমাম সেদিন বলেনঃ সম্মানিত বন্ধুগণ! আপনারা এমন একটি জাতির প্রতিনিধি যার লক্ষ্য ইসলাম ও ঐশী ন্যায়নীতি ছাড়া আর কিছু নয়। আপনারা নির্বাচিত হয়েছেন জনগণের মধ্যে ইসলামী ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আমরা আশা করি, দেশের যারা বঞ্চিত ও দরিদ্র শ্রেণী, যারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাদের অবস্থার অনুসন্ধানকে আপনাদের কার্যক্রমের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অগ্রাধিকার দেবেন। আমরা আশা করি, দেশের প্রথম ইসলামী মজলিসে শুরা এই বঞ্চিত দরিদ্র শ্রেণীর উন্নতি বিধানকল্পে ব্যাপক আন্তরিক ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করবেন এবং এ কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দেবেন। এভাবেই আপনারা ইসলাম, স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য যে অংশটির চরম কুরবানী ও আত্মত্যাগের ফলে ইসলামী বিপ্লবের বিজয় সম্ভব হয়েছে আমাদের জাতির সর্বাধিক প্রিয়ভাজন সেই অংশটির ঋণ পরিশোধ করতে সচেষ্ট হবেন।

দেশের প্রথম মজলিস হিসাবে একে ভবিষ্যতের নমুনা হতে হবে। তার ভালো-মন্দ সবই ভবিষ্যত মজলিসসমূহে স্থানান্তরিত হবে। ফলে হয় আপনারা আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান লাভ করবেন নতুবা খোদা না করুন, অপমান-অসম্মানই আপনাদের ভাগ্য হয়ে দাঁড়াবে। আপনাদের পারস্পরিক বিতর্ক, আলোচনা ও অনিবার্য মতবিরোধসমূহ অবশ্যই পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে শান্ত, ভাবগম্ভীর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হওয়া উচিত। রেজাখান বা মোহাম্মদ রেজার আমলের পার্লামেন্টের মতো মোটেই হওয়া উচিত নয়। বিরোধী পক্ষের উপর প্রাধান্য অর্জনের লক্ষ্যে নীতিহীন উপদলীয় তৎপরতা বন্ধ করতে হবে। কেননা সমস্যাসমূহের ন্যায়ভিত্তিক ও যথাযথ সমাধান শান্তি ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশেই সম্ভব।

দেশের বর্তমান নাজুক পরিস্থিতি দাবী করছে যে মজলিস ও সরকারের যাবতীয় তৎপরতা সমন্বিত হতে হবে এবং ইসলামী প্রজাতন্ত্রের কোন অংশই অন্যের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। তাদের সবাইকে ইসলামের সেবার লক্ষ্যে নিজদেরকে নিয়োজিত করা উচিত যাতে করে তারা ঐশী সহযোগিতা লাভের উপযুক্ত হতে পারে। তাদেরকে অবশ্যই সদা-সর্বদা আল্লাহর ঐ বাণীকে মনে রাখতে হবে।

"তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হয়ে যেও না।" (৩ঃ১০৩)।

"আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য কর, পরস্পর ঝগড়া কারো না, এতে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের ক্ষমতা খর্ব হয়ে যাবে এবং ধৈর্য ধর; নিঃসন্দেহে আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সংগে রয়েছেন।" (৮ঃ৪৬)

দলাদলি সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। কেননা এতে লিপ্ত হলে আপনাদের সম্মান, ক্ষমতা, শক্তি সবই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

অভিভাবক পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দের নিকট আমার দাবী হচ্ছে যে, তারা বিপথগামী দল বা ব্যক্তির দিকে না তাকিয়ে ইসলামী প্রগতিশীল আইনসমূহ সংরক্ষণের লক্ষ্যে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে যাবেন। তাদের এ কাজ মহান আল্লাহ তায়ালা ও যুগের ইমামের (আল্লাহ তাঁর আগমনকে দ্রুত করুন) মহান খেদমত বলে পরিগণিত হবে।

ইসলামী বিপ্লবের কর্মধারা ঃ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবার পর তার বিরুদ্ধে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র এর নেতৃবৃন্দকে দিশেহারা করে তোলে। এমতাবস্থায় বিপ্লবের সাফল্যকে রক্ষা করা কঠিনতম দায়িত্ব হয়ে পড়ে।

দূরদর্শী ইমাম এ পর্যায়ে তাঁর চিন্তাধারা তুলে ধরেন ইসলামী বিপ্লবীদের মাঝে। "ইসলামী বিপ্লবের কর্মধারা" শীর্ষক ভাষণে আমরা দেখতে পাই তিনি স্বল্পমেয়াদী ও

দীর্ঘ মেয়াদী দু'টি পরিকল্পনা পেশের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র, সরকার ও জনগণকে রক্ষা করার দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

ফায়জিয়া ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব লারনিং-এ প্রদত্ত উক্ত ভাষণে ইমাম খোমেনী (রহঃ) বলেনঃ সরকারসমূহের মতো বর্তমান মুহূর্তে আমাদের জাতীয়ভিত্তিক দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী এ দু'ধরনের পরিকল্পনা প্রয়োজন। স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা হলো বিপ্লবী আন্দোলনকে রক্ষা করা। আমরা যদি তা করতে ব্যর্থ হই, খোদা মাফ করুন যদি ঐক্যবদ্ধভাবে সামনে অগ্রসর হতে না পারি তবে ইতিপূর্বেকার ন্যায় শত্রুতার মোকাবেলা করতে হবে।

আমাদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হলো বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজের পূর্ণত্ব দান করা। এটাই আমাদের প্রধান কর্তব্য। আমাদের সাফল্যের গোপন রহস্য নিহিত রয়েছে এ সর্ব সম্মত শ্লোগানের মধ্যে যে আমরা শয়তানী সরকারকে ঘৃণা করি এবং তার উৎখাত সাধন করে এমন একটি ধর্মতাত্ত্বিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চাই যার নির্দেশাবলী তত্ত্ব ও বাস্তবের প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

আপনারা যদি সুরুচি বোধসম্পন্ন হয়ে থাকেন তবে ইসলামের লক্ষ্যকে অগ্রসর করানো আপনাদের দায়িত্ব। আপনারা যদি নারী জাতি ও ছেলে মেয়েদের ইসলামী পদ্ধতিতে যথার্থ শিক্ষাদান করতে পারেন তবে আপনাদের দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত হবে। আল্লাহ আমাদের মাফ করুন যদি আমাদের যত্নে ও তত্ত্বাবধানে সুরুচিহীন অনৈসলামী সন্তান-সন্ততি গড়ে উঠে তবে তা হবে ইসলাম ও দেশের জন্য ধ্বংসের কারণ।

দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচীর আওতায় আমাদেরকে অবশ্যই পিতা-মাতা, গৃহ শিক্ষক, লেখক এবং অন্যান্যদের ধর্মীয় প্রশিক্ষণ দিতে হবে, যাদের যত্ন ও তত্ত্বাবধানে আমাদের নতুন বংশধর গড়ে উঠবে। সন্তান প্রতিপালন ও সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে একজন মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক। মানুষকে মনুষ্যত্ববোধ শিক্ষা দেয়ার জন্যে আদম (আঃ) হতে মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত নবী ও রাসুল আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত হয়েছেন। পুঁজিবাদী ও কম্যুনিস্টদের প্রতি দয়া হয় যে, তারা এ ধরনের শিক্ষাদানকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য জ্ঞান করে।

ইসলামী শরিয়ার বাস্তবায়ন ঃ ১৯৭৯ সালে ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামী বিপ্লব কায়েম হবার পর পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যম, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্যের শেখ ও বাদশা শাসিত দেশসমূহ এবং তাদের ভাতাপ্রাপ্ত কিছু আলেম প্রচার করল যে, ইরানে ইসলামী বিপ্লব কায়েম হয়নি; বরং যা হয়েছে তা হলো 'শিয়াইজম'। কিন্তু আমরা ইরানের বর্তমান শাসন কাঠামো প্রত্যক্ষ করলে দেখতে পাই, ইরানের আর্থ-সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামী বিধিবিধান সাংবিধানিকভাবে কায়েম হয়েছে। ইসলাম পরিপন্থী

আইন রচনা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। সুদভিত্তিক লেনদেন বন্ধ করা হয়েছে। ইসলামের পঞ্চ-ফরজ রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন ও অনুসরণের জন্য তথা নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত প্রভৃতি পালনে উৎসাহিত করা হয়েছে। মদ্যপান, মাদক ব্যবসা, জুয়াখেলা, বেশ্যাবৃত্তি, উলঙ্গপনা ও পর্দাহীনতা হারাম ঘোষিত হয়েছে।

'সৎ কাজের নির্দেশ ও অসৎকাজে নিষেধাজ্ঞা' আরোপিত হয়েছে। এর আলোকে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উম্মাহ্‌র কল্যাণে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও প্রচার মাধ্যমকে সদা প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এসব কিছু বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা তা বাস্তবায়ন করছেন।

সাম্রাজ্যবাদীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ঃ নব উত্থিত ইসলামী বিপ্লবকে সমূলে বিনাশ করার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা দুই পরাশক্তি রাজতান্ত্রিক আরব দেশসমূহের আর্থিক সহযোগিতায় ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে ইরানের উপর দীর্ঘ মেয়াদী এক নিষ্ঠুর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। শিশু ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত এ জঘণ্য হামলা ছিল রসূলে পাক (সঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিশু ইসলামী রাষ্ট্র মদীনার উপর মক্কার কাফেরদের হামলার সাথে তুলনীয়। বদর যুদ্ধে যদি মহান আল্লাহর অপার করুণায় ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী বিজয়ী না হতো তবে আমরা আজ অবধি ইসলামের রশ্মি পেতাম কিনা সন্দেহ। ঠিক অনুরূপভাবে বন্ধুহীন, অস্ত্রহীন ইরানী জাতি ইমাম খোমেনীর জেহাদী অনুপ্রেরণায় পরাশক্তিসমূহের পূর্ণ সহযোগিতা প্রাপ্ত একটি সুসজ্জিত বাহিনীর বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ ৮ বছর আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালিয়ে যায়। শাহাদাত প্রত্যাশী ইরানী মুসলমানদের উপর যখন সাধারণ যুদ্ধে তারা এঁটে উঠতে পারলো না তখন রাসায়নিক অস্ত্রের মাধ্যমে ইরানের শহর-নগর-বন্দর-পল্লী-প্রান্তরে ব্যাপক গণহত্যা আরম্ভ করে। এমতাবস্থায় ইমাম খোমেনী তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে বলেনঃ হে আমার বিপ্লবী সন্তানেরা! হে তোমরা-যারা তোমাদের পবিত্র গর্ব ও গৌরব থেকে এক মুহূর্তের জন্যও হাত গুটাতে রাজি নও। তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের খেদমত করার পবিত্র ভালবাসার পথেই আমার জীবনের মুহূর্তগুলো পার করেছি। আমি জানি যে জাতিসংঘের যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব মেনে নিতে তোমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তোমাদের এ বৃদ্ধ পিতারও কি কষ্ট হচ্ছে না? আমি জানি যে, শাহাদাত তোমাদের কাছে মধুর চেয়েও মিষ্টি। তোমাদের খাদেমের কাছেও কি তদ্রুপ নয়? ধৈর্য ধারণ কর, কেননা আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। তোমাদের বিপ্লবী আক্রোশ ও বিদ্বেষকে সিনাসমূহে ধারণ করে রাখ, তোমাদের দুশমনদের প্রতি গজব ও ক্রোধের দৃষ্টিতে তাকাও, আর জেনে রাখ যে, বিজয় তোমাদেরই।

বড় শয়তানের মুখোশ উন্মোচন ঃ ইরানে ইসলামী বিপ্লব কায়েমের পর সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা হলো ইমাম খোমেনীর চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৭৯ সালের ৪ নভেম্বর একদল ছাত্র কর্তৃক তেহরানস্থ মার্কিন দূতাবাস অবরোধ যা সমসাময়িক পৃথিবীর কূটনৈতিক বিধানের বিপরীত। কেন এমন হলো? এটি ছিল এশিয়ায় সি,আই,এ'র গোয়েন্দা বৃত্তির নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এখানে বসেই কূটনীতির নামে যত শয়তানী কুমন্ত্রণা ও রক্তক্ষয়ী ক্ষমতার পালাবদলের রূপরেখা প্রণীত হত।

ছাত্ররা মার্কিন দূতসহ ৪৩ জন গুপ্তচরকে বন্দী করতে সক্ষম হয়। গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা দলিলসমূহ পুড়ে ফেলার পরও ছাত্ররা দূতাবাসের বিভিন্ন কক্ষ থেকে ৫৩টি গোয়েন্দা দলিলের খসড়া উদ্ধার করতে সমর্থ হয়, যাতে ইসরাইলের সহযোগিতায় এতদ'ঞ্চলের মুসলিম দেশগুলিকে করদ রাজ্যে পরিণত করার নানা কৌশল লিপিবদ্ধ ছিল।

বন্দী গোয়েন্দাদের উদ্ধার করতে এসে 'তাবাশ মরুভূমিতে' মার্কিন কমান্ডোদের আত্মহনন ছাত্রদের অবরোধকে বিশ্ব-স্বীকৃতি দান করে। আর ইমাম খোমেনীর উপর আল্লাহর রহমত যে পরিপূর্ণ ছিল তারও প্রমাণ মেলে।

দায়ী ইলাল্লাহর দায়িত্ব পালনে ইমাম ঃ ইমাম খোমেনী ছিলেন সত্যিকারের নায়েবে রাসুল (সাঃ)। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রকে মোটামুটিভাবে সফলতা দানের পর রাসূলে পাক (সাঃ) যেরূপ তৎকালীন বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে বিশেষতঃ তৎকালীন পৃথিবীর দুই পরাশক্তি পারস্য ও রোমান সম্রাটের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে ছিলেন, ঠিক অনুরূপভাবে এই বিংশ শতাব্দীর প্রগতি ও উৎকর্ষের যুগে ইমাম খোমেনী সোভিয়েত সাম্রাজ্যের তৎকালীন অধিকর্তা প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য পোষণের এবং কম্যুনিজম ছেড়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অনুসারী হওয়ার যে দাওয়াত প্রদান করেন তা আধুনিক বিশ্ব ইতিহাসে এক অনন্য দলিল হিসাবে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে।

তিনি তাঁর পত্রে নাস্তিক্যবাদের অপমৃত্যুর যে পূর্বাভাস দেন তাঁর ইন্তেকালের দু'বছর পর তা বাস্তবে পরিণত হয়। আজ সোভিয়েত সাম্রাজ্য নেই, ক্ষমতায় গর্বাচেভ নেই, নেই কম্যুনিজমের যাঁতাকল।

ইমাম খোমেনী বলেছিলেনঃ জনাব গর্বাচেভ। এটা আজ সবার নিকট স্পষ্ট যে, এখন থেকে সমাজবাদ বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসের যাদুঘরগুলোতে তালাবদ্ধ হয়ে থাকবে। কেননা মানব সন্তানদের সত্যিকারের সমস্যা সমাধানের উপায় মার্ক্সবাদে নেই। কারণ এটি একটি বস্তুবাদী মতবাদ। বস্তুবাদ মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সমস্যা সমাধানের কোনরূপ দিক নির্দেশনা দিতে পারে না। অথচ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানব

সমাজের এটিই মৌলিক সমস্যা।

তাঁর সে দাওয়াত মিঃ গর্বাচেভ গ্রহণ না করলেও কমিউনিজম গিয়েছে রাজনৈতিক ইতিহাসের যাদুঘরে আর সোভিয়েত সাম্রাজ্য হয়েছে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো। এর বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ৬টি স্বাধীন মুসলিম প্রজাতন্ত্রসহ অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ।

ইসলামী ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ইমামঃ ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পর থেকে ইমাম খোমেনীর চিন্তাধারা ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলে বিশ্বব্যাপী ইসলামী ঐক্যের সুবাতাস বইতে শুরু করেছে। শিয়া-সুন্নী মতভেদ অনেক কমেছে। এ ব্যাপারে তিনি যেসব ভাষণ, বাণী ও নির্দেশ প্রদান করে গেছেন তা ইসলামের ইতিহাসে অকাট্য দলিল হিসাবে স্থান পাবে।

বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই মহানবী (সাঃ) এর জন্ম উৎসব ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষে ১২ থেকে ১৭ই রবিউল আউয়াল আন্তর্জাতিক ভাবে "ঐক্য সপ্তাহ" পালনের নির্দেশ প্রদান করেন ইমাম খোমেনী। ঐক্য সপ্তাহ আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হচ্ছে।

ইমামের ঐক্যের আহবান ইরানী সংবিধানের ৩ নং ধারা কর্তৃক স্বীকৃত। তিনি বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের প্রতি ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের আহবান জানিয়ে বলেছেনঃ হে মুসলিমগণ! জেনে রাখুন, অনৈক্য এবং বিভেদ হতে জন্ম নিয়েছে মুসলিম দেশগুলোর যাবতীয় সমস্যা। বস্তুতঃ বিজয় লাভের রহস্য নিহিত রয়েছে ঐক্যের মাঝে, সহযোগিতার মাঝে। যারা শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কাজ করে তারা ইসলামের দুশমনদের ষড়যন্ত্র কার্যকর করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। এরা রাশিয়া ও আমেরিকার দালাল।

মুসলমানদের মাঝে ফাটল ধরাতে পারে, এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকা সকল ইরানী ভাইদের কর্তব্য এবং বিশ্বের সকল শিয়া মতাবলম্বীদের কর্তব্য। তাদেরকে সুন্নত পন্থীদের জামাতে শরীক হয়ে নামাজ আদায় করতে হবে। ঘরে পৃথকভাবে জামাত করে নামাজ পড়াকে পরিহার করে চলতে হবে।

আমরা সকলে ভাই ভাই। শিয়া-সুন্নী সকল ভাইয়ের জন্য যাবতীয় মতপার্থক্য পরিহার করা কর্তব্য। বর্তমানে আমাদের মতপার্থক্যের ফলে এমন লোকজন উপকৃত হচ্ছে যারা শিয়া- সুন্নী কোন মতেরই পক্ষপাতি নয়। তারা তো দলমত নির্বিশেষে মুসলমানদেরই নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। তাদের উদ্দেশ্য হলো আমাদের মাঝে বিভেদ ছড়িয়ে দিয়ে স্বার্থ হাসিল করা। বিচক্ষণতার সাথে আপনাদের অনুধাবন করতে হবে যে, আমরা সকলেই মুসলমান-কুরআনের অনুসারী, আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী।

কাজেই যা কুরআন এবং তাওহীদের অনুকূলে যায় সে প্রয়াস চালানোই আমাদের সবার কর্তব্য।

ইরানের পররাষ্ট্র নীতি ঃ ইসলাম তথা মুসলমানদের স্বার্থে ইমাম খোমেনীর চিন্তাধারার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে ইরানের পররাষ্ট্র নীতিতে।

আল-কুদ্‌স এর মুক্তি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রতিবছর রমজানের শেষ শুক্রবার যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে ইমাম খোমেনীর ঘোষণা অনুযায়ী বিশ্বের দেশে দেশে "আল্-কুদ্‌স দিবস" পালিত হচ্ছে। বিভিন্ন মুসলিম দেশের সরকারও এ দিবসের প্রতি রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। এ দিবসটি পালনের ফলে আল-কুদ্‌স মুক্তকরণের আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী ইহুদীবাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ঘৃণা ও ক্ষোভ দিন দিন প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে।

ইমাম খোমেনী কর্তৃক ফিলিস্তিনী মুসলিম জনগণের স্বাধীনতার জেহাদকে পূর্ণ সমর্থনের ফলে ১৯৮৭ সাল থেকে দীর্ঘ ছয় বছরব্যাপী রক্তক্ষয়ী ইন্তিফাদা (গণ অভ্যুত্থান) ইহুদীবাদের তখ্‌ততাউস কাঁপিয়ে তুলেছে।

ইমাম খোমেনীর ইসলামী ইরানই মুসলমানদের প্রকৃত বন্ধু। ইরানই সর্বপ্রথম তেহরানস্থ ইসরাইলী দূতাবাসকে পূর্ণাঙ্গ ফিলিস্তিনী দূতাবাসে পরিণত করেছে। ইমামের তিরোধানের পর ১৯৯০ সালের ১৪ মে ফিলিস্তিনীদের জেহাদকে সফল করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয়ভাবে আট দফা আইন পাশ করে যাতে ফিলিস্তিনী ভাইদের সার্বিক সহযোগিতার গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে।

ইমাম খোমেনী কর্তৃক বিশ্বব্যাপী ইসলামী বিপ্লব কায়েমের সংগ্রামে সহযোগিতা দানের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ইরান বিভিন্ন দেশে নির্যাতিত মুসলমানদের সহযোদ্ধা হিসাবে পাশে দাঁড়িয়েছে।

পবিত্র হজ্বের তাৎপর্য সম্পর্কে ইমাম ঃ ইসলামের অন্যতম ফরজ হলো সামর্থবান ব্যক্তিদের হজ্ব পালন। রাসূলে পাক (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের পর ঐতিহাসিক হজ্ব সম্মেলন একটি নীরব ধর্মীয় সম্মেলন হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে। অথচ মুসলমানদের বিশ্ব সম্মেলন হিসাবে একে অনেক অর্থপূর্ণ কাজে লাগানো যেত। যেরূপ লাগিয়েছিলেন রাসূলে পাক (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীন।

ইসলামী বিপ্লবের পর ইমাম খোমেনীর চিন্তাধারায় উজ্জীবিত ইরানের লক্ষ লক্ষ হাজীরা ইহুদীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু কামনা এবং ইসলামী ঐক্যের লক্ষ্যে যে বজ্রকঠিন শ্লোগান উচ্চারণ করছে তাতে দুনিয়ার তাবৎ খোদাদ্রোহী শক্তি ও ইহুদীবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদীদের টনক নড়ে উঠেছে। ফলে বিশ্বের প্রতিটি কোন্ থেকে আগত অবশিষ্ট লক্ষ লক্ষ হাজীরাও ইসলামের শাশ্বত জেহাদী অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে। তারা

ইমামের [illegible]তে কোটি জনতার শো[illegible]াহাজারি

দায়ী ইলাল্লাহ্‌র শপথ গ্রহণ ও স্বদেশে রাজতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামী বিপ্লবের কাজকে ত্বরান্বিত করছে।

মুরতাদের বিরুদ্ধে ইমামের ফরমান ঃ বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে পবিত্র কুরআন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রকাশ্য নিন্দাকারী নাস্তিক–কম্যুনিষ্ট–মুরতাদদের বিরুদ্ধে ইমাম খোমেনী মৃত্যু পরওয়ানা জারি। যে মৃত্যুদণ্ড একজনের প্রতি জারী হলেও তার ভীতিকর প্রভাব পড়েছে পৃথিবীর তাবৎ আল্লাহ্‌ ও রাসূলদ্রোহীদের উপর। এ কারণেই দেখা যাচ্ছে বৃটিশ রাজকীয় বাহিনীর সুরক্ষিত নিরাপদ বেষ্টনীতে অবস্থান করেও ইহুদীদের প্রত্যক্ষ দালাল মুরতাদ সালমান রুশদী আজ জীবন্মৃত। তার বিকৃত মস্তিষ্কপ্রসূত অবৈধ প্রকাশনা "শয়তানের পদাবলী'র অনুবাদকারী জাপানী লেখক স্বজাতির হাতে নিহত।

এভাবে মহান আল্লাহ, পবিত্র কুরআন, রাসূলে পাক (সাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের বিরুদ্ধাচরণকারী ও ব্যঙ্গকারীদের গর্দানোপরি ইমাম খোমেনীর নাঙ্গা তলোয়ার কোশমুক্ত থাকবে অনন্তকাল।

মুসলিম নারী জাগরণের পথিকৃত ঃ ৬০ ও ৭০ দশকে পারস্যের রাজধানী তেহরান ছিল বিশ্ব প্রসিদ্ধ পতিতাবাজার। নীতি ও নৈতিকতার অধঃপতনে ইরানী ললনারা ছিল ইহুদী–খৃষ্টান পর্যটকদের বাড়তি আকর্ষণ। ইরানের সমুদ্র সৈকত আর সুইমিংপুলগুলো ছিল নগ্নস্নাতা যোড়শীদের আড্ডাখানা। শাহ্‌ তার রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য পারিবারিক বন্ধনকে শিথিল করে দিয়ে ইরানী যুবক–যুবতীদেরকে এভাবে জাহান্নামের দ্বার প্রান্তে ঠেলে দিয়েছিলেন।

ইসলামী বিপ্লবের সময় এ পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। নবী নন্দিনী হযরত ফাতেমা যাহ্‌রা (রাঃ) এর অনুসারী ইরানী মহিলাদের এরূপ করুণ দৃশ্যে ইমাম খোমেনীর অন্তর কেঁদে উঠে। তিনি তাঁর সুমহান ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আশাপ্রদ বক্তৃতা–বিবৃতির মাধ্যমে ইরানী নারীদেরকে তাদের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করাতে সক্ষম হন। ফলে এ নারী সমাজের গৃহগুলো ইসলামী বিপ্লবের এক একটি দুর্গে পরিণত হয়।

বিশ্ববাসী দেখেছে কাল চাদর পরা ইরানী মহিলাদের বজ্রকঠিন গগন বিদারী শ্লোগানে কিভাবে রেজা শাহ্‌ পাহলভীর তখত–তাউস ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। কিভাবে তেহরানস্থ মার্কিন ও ইহুদী গুপ্তচরের আড্ডাখানা (দূতাবাস) ধ্বংস হয়েছে। তারা এও প্রত্যক্ষ করেছে যে, ইরানী নারীরা তাদের স্বামী–সন্তান–ভাইকে জেহাদের ময়দানে নওশার বেশে পাঠিয়েছে আবার শহীদের গর্বিতা মা–বোন–স্ত্রী রূপে তাদের লাশ বরণ করে নিয়েছে। ইরাক কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া ৮ বছরের যুদ্ধে বিপ্লবী গার্ডদের

সহযোদ্ধা হিসাবে হাজার হাজার ইরানী মহিলা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে। তাদের এসব কিছুই ছিল আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে। তারা তাদের রূপ ও যৌবনকে 'আল্লাহর রঙে রাঙ্গিয়েছে' বলেই আজ ইরানী নারীরা বিশ্ব মুসলিম নারী সমাজের আদর্শ। অন্যদিকে শহীদের মা ও বীরাঙ্গনা ও নারীরা আজ ইরানের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক অঙ্গণে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হিযাবসহ সমতালে কাজ করে যাচ্ছে।

শিল্প–সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইমাম ঃ মানবজীবনে শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কে ইমাম খোমেনী অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। শিল্প ও সংস্কৃতির কল্যাণকর দিকগুলোর প্রতি তিনি সর্বদাই সমর্থন করতেন। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সংস্কৃতির ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে তিনি জনগণ ও সংস্কৃতিসেবীদের সর্তক করে দিতেন। ইমামের বিভিন্ন বক্তব্যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

সমাগত রেডিও–টেলিভিশন কর্মীদের উদ্দেশ্যে দেশগঠন ও ইসলামী সাংস্কৃতিক কার্যক্রম উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ বঞ্চিত দেশগুলির অনগ্রসরতার একটি কারণ হচ্ছে এই যে, এরা এদের জনগণের মানসিক বিকাশ ঘটাতে দেয়নি। (পাশ্চাত্যমুখী) প্রচারণা এমন এক পর্যায়ে পৌছেছিল যে, জনসাধারণ নতুন কোন কাজে হাত দিতে ভয় পেত। ..... (বিগত দিনে) কে কতটুকু পাশ্চাত্য অনুসরণ করতে পেরেছে তার উপরই ব্যক্তি বিশেষের উন্নতি বা অবনতি নির্ধারণ করা হত। তারা আমাদেরকে পাশ্চাত্যের রীতিনীতি গ্রহণের উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছিল এবং আমাদেরকে পরিণত করেছিল পাশ্চাত্যের দ্রব্য সামগ্রী ব্যবহারকারী ভোক্তা সমাজে। ..... সত্য প্রচারে নির্যাতিতের জন্য যতটা মঙ্গলজনক, অত্যাচারীদের পক্ষে ততটাই ক্ষতিকর। প্রচার মাধ্যমকে সত্য প্রচার ও মানবিক গুণাবলী অর্জনের কাজে লাগাতে হবে।

ইমাম খোমেনীর মতে সমাজে দু'ধরনের শিল্পকলা রয়েছে। যথা– (১) কল্যাণকর শিল্পকলা, (২) ক্ষতিকর শিল্পকলা।

কল্যাণকর শিল্পকলাঃ সঞ্জীবনী সংগীতের দেশাত্মবোধক সংগীত, বিপ্লবী সংগীত ও চিত্রকলা হলো কল্যাণকর শিল্পকলা, যা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ।

ক্ষতিকর শিল্পকলাঃ ক্ষতিকর সংগীত যা যুবসমাজের ভাল–মন্দ বিচারের ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয় এবং তাদের দৈহিক কামনাকে উত্তেজিত করে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তা অবৈধ। রেডিও, টেলিভিশনে এ ধরনের সংগীত প্রচার করা দেশ ও জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।

এ মানদণ্ড তিনি চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও আরোপ করেন। ফলে নাচ–গান, দাঙ্গা–হাঙ্গামা ও অশ্লীলতা বিবর্জিত ইরানী চলচ্চিত্র আজ বিশ্বের দেশে দেশে সমাদৃত হচ্ছে। ইরানী ক্যালিগ্রাফী, হস্তশিল্প ও চিত্রশিল্প পৃথিবী ব্যাপী ঈর্ষণীয় বাজার পাচ্ছে।

ইমাম খোমেনী (রহঃ) কাব্য প্রতিভা ঃ হযরত ইমাম খোমেনী (রহঃ) ছিলেন দারুণ প্রতিভাদীপ্ত কবি; কিন্তু তিনি ক্ষমতায় থাকাতো দূরের কথা তাঁর জীবদ্দশায়ও তিনি তা ফাঁস হতে দেননি যে, তিনি কাব্যচর্চা করতেন। আসলে তিনি 'অজ্ঞাত'ই থাকতে চেয়েছিলেন। এটা তার আত্মসচেতনতা, বিবেক, প্রচার বিমুখতা প্রভৃতির পরিচায়ক। অথচ তিনি ফারসী সাহিত্যের প্রথম সারির অন্যতম খ্যাতিমান কবি।

ইমাম খোমেনী (রহঃ) এর কবিতা পড়তে গেলে এমন সব আধ্যাত্মিক জগতের হোতাদের কথা মনে পড়ে, যাঁদের অন্তর আল্লাহর নূরে উদ্ভাসিত এবং যাঁরা আত্মসচেতন, বিবেকবান এবং প্রচার বিমুখ।

ইমামের কাব্য প্রতিভা যে কতো শক্তিমান ও কতো উঁচুদরের তা ঐতিহ্যময় ও ঐশ্বর্যময় ফারসী সাহিত্যের সুপণ্ডিত ও সমঝদারগণই বলতে পারেন। ইমাম তুলনামূলকভাবে লিখেছেন খুব কম ..... কিন্তু যা দিয়ে গেছেন তাঁর ভক্ত অনুরক্ত, অনুরাগী ও সাহিত্যমোদীদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

ইরানে ইমামের কবিতা সম্বলিত কোন পৃষ্ঠা, পুস্তিকা বা বইকে লোকেরা "স্বর্ণপত্র" হিসাবে খরিদ করে এবং বাসস্থান অফিস–আদালত ও মসজিদ মাদ্রাসায় অতি যত্নের সাথে সেঁটে রাখে। ইমামের গজল তথা খোদা প্রেমের কবিতাগুলোতে যে বাণী বক্তব্য নিহিত আছে তা যেন ফারসী সাহিত্যের সকল দিকপাল; যেমন– সাদী, হাফিজ, আত্তার, রুমী, জামী, নেজামী, খৈয়াম, শাবেস্তারী– সবারই মুখবন্ধ মনের কথা ও আকুতি।

ইন্তেকালের অব্যবহিত পর ১৩ জুন '৮৯ যেদিন তাঁর পুত্র হুজ্জাতুল ইসলাম আহমদ খোমেনী হযরত ইমামের স্বহস্তে লিখিত লিপিসহ তাঁর একটি "হে প্রিয়তম সুহৃদ আমার" আধ্যাত্মিক কবিতা প্রকাশ করলেন, তা রাষ্ট্রীয় রেডিও, টেলিভিশন এবং পত্র–পত্রিকায় অতি গুরুত্বের সাথে প্রচার ও প্রকাশ করা হয়। এ কবিতার মূল আলোচ্য বিষয় আশিক–এ দিওয়ানা পরম প্রিয় আল্লাহ্ তায়ালার দীদার লাভের অস্থির কামনা। এর উপমা–উৎপ্রেক্ষা আধুনিক ও প্রাচীন কাব্য সাহিত্যের যে কোন প্রথম শ্রেণীর কবিতার সাথে তুলনীয়।

ইমামের প্রকাশনা ঃ আমরা ইমাম খোমেনী নামের যে মহাপুরুষকে জানি তিনি শুধু রক্তঝরা বিপ্লবের প্রতীক নন; তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ আলেম–এ দ্বীন, আদর্শ গবেষক ও লেখক। ৩০ বছরের ছাত্র জীবন ও ৩০ বছরের শিক্ষকতা জীবনে তিনি জাতির মুক্তির জন্য বক্তৃতা–বিবৃতি ছাড়াও বহু প্রবন্ধ–নিবন্ধ রচনা করে ইসলামী আন্দোলনের পথে জনমত গড়ে তোলেন; বিশেষতঃ নির্বাসিত জীবনে তিনি অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। এসব ছিল তাঁর নীরব অথচ সংশোধিত চিরস্থায়ী বিপ্লবের মহৌষধ। এর দ্বারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শিক্ষক–শিক্ষার্থী, রাজনৈতিক

ও সমাজকর্মীরা সুফল ভোগ করবে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। কিতাবু আরবাইন (পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত)

২। আল-তাহেরা,

৩। তাহ্‌রির উল-ওয়াসিলাহ্‌,

৪। ইখতিলাফ ওয়াল বিলায়া,

৫। মিসবাহ্‌-উল-হুদা,

৬। কাশফুল আসরার,

৭। মিসবা-উল-উন্‌স,

৮। সিররুস সালাহ্‌,

৯। আসরারুস্‌ সালাহ্‌,

১০। তলব ওয়া ইরাদাহ্‌,

১১। জিহাদ-ই-আকবর,

১২। অসিয়তনামা।

সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত আমলের জন্য ইমামের উপদেশ ঃ মহান আল্লাহ্‌ মানুষ ও জ্বীন জাতিকে একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। প্রতি পদে পদে যে ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণে নিজের জীবনকে অতিবাহিত করে, সেই তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়। মুসলমানের জিন্দেগীতো আমলের জিন্দেগী। ইমাম খোমেনী (রহঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল ছিলেন। সেজন্যই আমরা দেখি চির বিদায়কালে অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে মাহবুবে এলাহীর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে তিনি মিলিত হয়েছেন।

এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ নিজ (ব্যক্তিগত) আমলী জিন্দেগীতে যে সব ইবাদত করে উপকৃত হয়েছেন তা সাধারণ মানুষকেও ব্যক্তিগত জীবনে আমল করার জন্য উপদেশ দিয়ে গেছেন। মূলতঃ এসব নছিহত মহানবী (সাঃ) হাদীসের মর্মবাণীর পুনঃস্মরণ।

নিম্নে ইমামের কতিপয় নসিহত ঃ

১। সপ্তাহে অন্ততঃ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখবে।

২। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথা সময়ে আদায় করবে।

৩। ঘুমের সময় কমিয়ে অধিক সময় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতে অতিবাহিত

করবে।

৪। কৃত ওয়াদা পালন করবে।

৫। দরিদ্রদের সহায়তা করবে।

৬। অপরের নিন্দা করা থেকে বিরত থাকবে।

৭। সাধারণ পোশাক পরিধান করবে।

৮। অতিরিক্ত কথা বলবেন না, বেশী বেশী দোয়া পাঠ করবে।

৯। ধর্ম, সমাজ ও দর্শনের ক্ষেত্রে বেশী বেশী জ্ঞান অর্জন করবে।

১০। ভাল কাজের বড়াই করবে না, কৃত পাপের কথা স্মরণ করবে।

১১। উপকারী খেলাধুলা চর্চা করবে।

১২। কারিগরী জ্ঞান রাখবে।

উপসংহার ঃ পরিশেষে একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, বালাকোটে শহীদ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ও শহীদ ইসমাঈল ব্রেলভী (রঃ) এর ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের রক্তক্ষয়ী জেহাদ, উনিশ শতকে জামাল উদ্দীন আফগানী (রহঃ) এর ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলন, বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে মহাকবি আল্লামা ইকবালের মুসলিম গণজাগরণ আন্দোলন, ইসলামী সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েমের স্বপ্ন, অত্যন্ত জটিল ও নাজুক পরিস্থিতিতে ইমাম খোমেনী (রহঃ) ইরানের জমিনে বাস্তবায়ন করে পৃথিবীর ইতিহাসে এক নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটি হচ্ছে আগামী শতাব্দীর মুসলিম মুজাহিদদের জন্য 'ইসলামী রাষ্ট্র' কায়েমের এক বাস্তব নমুনা।

এই অকুতোভয় যোদ্ধা আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ ও রাসূলের (সাঃ) আদর্শ অনুসারে বিশ্বব্যাপী মুসলিম ঐক্যের শ্বেত পতাকা উত্তোলন করে গেছেন। শুধু তাই নয় "প্রাচ্য নয় পাশ্চাত্য নয় ইসলামী বিপ্লব" এর একলা চলো নীতিতে বিশ্বাসী ইমাম খোমেনী (রহঃ) একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে দুই পরাশক্তির ষড়যন্ত্রের সকল জালকে ছিন্নভিন্ন করে ইসলামী বিপ্লবের স্থিতিশীলতা দান করে গেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও চিন্তাধারায় উজ্জীবিত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান আজ 'মুস্তাদআফিন' দের আশ্রয়স্থল।

পরবর্তী শতাব্দীতে পৃথিবীর যে কোন জনপদে জেগে উঠা ইসলামী বিপ্লবের জেহাদী কর্মীরা তাঁর জীবন ও কর্ম থেকে লাভ করবে সীমাহীন অনুপ্রেরণা। তিনি হবেন জঙ্গে জিহাদে নবীন বিপ্লবীদের আদর্শ রাহ্‌বার। তিনি হবেন পৃথিবীর দেশে দেশে ইহুদীবাদ, 'শয়তানে বুজুর্গ' আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ এবং রাজতন্ত্রী ও স্বৈরাচারী

শাসকদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে জিহাদ্‌কারী মুজাহিদদের অবিসংবাদিত সিপাহ্‌সালার।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। আলোর স্মারক
(ইতিহাসে চিরভাস্বর অবয়ব খোমেনী), প্রকাশনায়ঃ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা।

২। আলোর পথে (ইমাম খোমেনীর আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক অসিয়তনামা), ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা।

৩। ইরানে ইসলামী বিপ্লব, মাওলানা মোহাম্মদ ছমির উদ্দীন, দ্বীনে হক প্রকাশনী, গাজীপুর, ঢাকা।

৪। ইসলামী ঐক্য, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা।

৫। হাজার বছরের বিস্ময়, এ, এন, সালামত উল্লাহ্‌, তাযকীয়া প্রকাশনী, ঢাকা।

৬। ইসলামী আদর্শ একটি বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা, শহীদ আয়াতুল্লাহ্‌ সাইয়্যেদ মুহাম্মদ হোসাইন বেহেশ্‌তী, আল-কুদ্‌স পাবলিকেশনস, ঢাকা।

৭। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের মজলিসে শূরা, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা।

৮। ইসলামী বিপ্লবের কর্মধারা, ইমাম খোমেনী (রহঃ), ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা।

৯। জাতিসমূহের আগামী দিনের পথ ইসলামী বিপ্লব মসিহ মুহাজেরী, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা।

১০। চলতি শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলন, শহীদ মুর্তাজা মোতাহারী, হিজবুল্লাহ প্রকাশনী, ঢাকা।

১১। হজ্জের রাজনৈতিক তাৎপর্য, মাওলানা ছমির উদ্দীন, আল-আমিন প্রকাশনী, ঢাকা।

১২। মিখাইল গর্বাচভের প্রতি ইমাম খোমেনীর দাওয়াত, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা।

১৩। সালমান রুশদীর বিরুদ্ধে ইমাম খোমেনী (রহঃ) এর ঐতিহাসিক ফতোয়ার প্রভাব (প্রবন্ধ), এ্যাডভোকেট সা'দ আহমদ, ঢাকা।

১৪। শিক্ষাঙ্গনে নৈতিকতা, ইমাম খোমেনী (রহঃ), ডন পাবলিসার্স, ঢাকা।

১৫। ইমাম খোমেনীর কবিতা, মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান, সহিফা প্রকাশনী, ঢাকা।

১৬। নিউজ লেটার এর বিভিন্ন সংখ্যা।

১৭। দৈনিক মিল্লাত-এর বিভিন্ন সংখ্যা।

১৮। দৈনিক নয়া বাংলা (চট্টগ্রাম) এর বিভিন্ন সংখ্যা।

19. IMAM KHOMEINI : as I saw him, ROBIN WOODSWORTH CARLSEN, Cultural Centre of Islamic Republic of Iran, Dhaka.

কবিতা

কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা কবিতা

অসহায় মেঘের তিমিরে

[হযরত ইমাম খোমেনী আল মুসাভী (রহঃ) কে]

তালিম হোসেন

আমি তো জানি না আমাকে এবং জানি না আমার
কি জানার। তাই চিনেছেন যিনি, জেনেছেন, সেই
আ'রিফকে আমি খুঁজছি প্রাণের আলো-আঁধারির
প্রদোষ-উষায়, দীপ্ত দিনের ঝলসানো রোদে
প্রাণের আয়না কিছু দেখায় না। আমি অসহায়
মেঘের তিমিরে, ঘন কুয়াশায় হাঁটছি কেবল
প্রান্তরে বনে, সাগরে পাহাড়ে নামছি উঠছি
এখনো একাকী ঠিকানা বিহীন। একী সন্ধান!

যিনি জেনেছেন, তাঁর চিত্তের আলোকিত পটে
আমার ছায়া কি কখনো পড়ে না? জেনে শুনে তিনি
আসেন না কেন, শুধান না কেন- এই দুঃসহ
রোগ-শয্যায় ব্যথা নীল মুখ কেন পড়ে আছি,
কেন যে সাধ্য নাই সেই দিকে পাশ ফিরবার
যে দিকে আলোর জোয়ার বইছে দু'কূল ভাসিয়ে।

যাঁকে জেনেছেন সে আ'রিফ, তাঁকে দৃষ্টির পটে
আমি যে কখনো আনতে চাইনি; সাহস পাইনি।
জানি না সে পট মহাকাশ কিনা, সমুদ্র কিনা,
পর্বত তাঁকে ধারণ করতে পারে কিনা, -আমি
না জেনেই দূরে সরে আছি তাই, কিছু না জেনেই

জড়ীন শড়কের গান
আশরাফ সিদ্দিকী

কত যে তারার মহাসমুদ্র কেটে কেটে অবশেষে
নয়া আফতাব জাগলো গুমের দেশে
নীল ঝরোকায় রূপালী ঝলক–বিছানায় জেগে দেখি
এ কোন্ ইমাম ডাকছে আমায় একি!
রঙীন মিনারে আজান হেঁকেছে এ কোন্ মুয়াজ্জিন!
দুয়ারে আমার নওল আশার হাসছে নতুন দিন!

আসছে কি সেই ইরানীগুলের নয়া মখ্‌মল্ দিন!!
দেখেছি–দেখেছি কোথায় দেখেছি রিনিক ঝিনিক
কাঁপছে স্মৃতির বীণ
আলবুরুজের চূড়ায় চূড়ায় কেঁপে কেঁপে উঠা দীপ্ত সুরঙীন .....
গ্রানাডার লাল মিনারে মিনারে ঝলমল মল্ দীপ্ত সুরঙীন .....
দরিয়ার নীল ঢেউয়ের দোলায় খল্ খল্ খল্ দীপ্ত সুরঙীন .....
দুয়ারে আমার আসলো কি সেই দিন?
দুয়ারে আমার আসলো এ কোন দিন?

কত যে ব্যথার মহাকারবালা কত পলাশীর রাত
কত শ্বাপদের ভয়াল নখরাঘাত
পার হয়ে এযে কাবাশহরের জড়ীন শড়ক বুঝি
আজকে আবার পেয়েছি হঠাৎ খুঁজি!
কত না সিরাজ। আলী হায়দার, তারিক দল
কাফেলায় মোর জোগায় আজকে বল।
টগ্ বগ্ বগ্ লক্ষ তাজীর খুরে খুরে কাঁপে ধূলি
আমরা চলেছি নতুন গজল তুলি
বক্ষে মোদের কাবা তসবির নয়নে হেরার নূর
কণ্ঠে মোদের পাক কোরানের সুর ···
এ কোন ম'সুমী নতুন হাওয়ায় উড়ছে নিশান মোর

জড়ীন শড়কে হাসছে নতুন ভোর।
দিকে দিকে বাজে আসমানী দিলরুবা
মারহাবা–ইয়া–মারহাবা!

ক্রুর–এজিদ আর মীর জাফরের ফেরেববাজীর ছল
হয়তো আজিও হয়নিকো নির্মল
মরু সাইমুমে যদিবা কভু ঢাকেই জড়ীনরাহ
জানি আছে মোর লা–শরীক আল্লাহ!
নতুন ইমাম দাঁড়ায়েছে আজ আকাশে তাহার শির
ডিম্ ডিম্ ডিম্ লক্ষ দামামা বাজছে সুগম্ভীর
জড়ীন শড়কে লাখো জনতার ভিড়
জড়ীন শড়কে ভূখা জনতার ভিড় · · · · ·
জড়ীন শড়কে লাখো মজলুম পেয়েছে সুসংবাদ
এ পথেরি শেষে আছে সে ঈদের চাঁদ।

ঃ ঐ আসে আসে জড়ীন শড়কে লাখো জনতার নাচছে হৃদয়বীণ ঃ
ঃ আলবুরুজের চূড়ায় চূড়ায় কেঁপে উঠা সেই দীপ্ত ঈদের দিন
ঃ গ্রানাড়ার লাল মিনারে মিনারে কেঁপে উঠা সেই দীপ্ত ঈদের দিন · · · ·
ঃ ইউফ্রেটিস আর তাইগ্রীস তীরে কেঁপে উঠা সেই দীপ্ত ঈদের দিন · · ·

হে কাফেলা দল! চলো চলো জোর পায়
কাবার মিনার ঐ দেখো দেখা যায়!!

সে আ'রিফ যিনি জেনেছেন, তাঁকে জানার জানায়
পরম জানার দীপ্ত বিহারে কখনো একটু
দেখা যায় কিনা–প্রেক্ষাগৃহের পর্দার পাশে
তাই জেগে আছি ভীরু কাঙালের প্রতীক্ষা নিয়ে;
হায় সন্ধান, ক্লিষ্ট আঁধারে একী সন্ধান!

চিনেছেন যিনি, জেনেছেন, সেই আ'রিফকে আমি

খুঁজছি কেবল। এই সন্ধান দু' চোখের আলো
নিঃশেষ করে করে শেষ হবে। তারপর যদি
আমার সময় ফুরায়, আমার এই জানা তবু
রয়ে যাবে চির অফুরান–যাঁকে খুঁজছি কেবল,
জীবনে কখনো দেখা পাইনি, সে না দেখা আ'রিফ
যাঁকে জেনেছেন, তাঁর সময়ের শেষ নাই। তাই
তাঁর সময়ের পটে অন্ততঃ আমার জানার
ইচ্ছাকে আমি চির জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো
রেখে যাব যাতে চির অজানার বুকে সে চিহ্ন
গোলাপের শেষ ক্রন্দন নিয়ে কাঁটা হয়ে জাগে।

ধারালো তলোয়ার (ইমাম খোমেনীর)

আবদুস্ সাত্তার

১.
ইরান বিরান হতে
চলেছিল, ইমাম খোমেনী
সেই ক্ষণে তুমি এলে
আঁধার বিদীর্ণ করা মুনি।

২.
ইরান আকাশে দেখি
নতুন আলোর ঝলকানি,
তোমারও মুখে শুনি
ইসলামী অমোঘ সে বাণী।

৩.
তোমার কবিতা পড়ে
এ জীবন উচ্চকিত হয়,
সারাটি জীবন তুমি
গেয়েছো হ্যাঁ, প্রশান্তির জয়।

৪.
কেবল শাসক নও,
সুদৃঢ় সে কবিতার মিলে
বেঁধেছো সমগ্র জাতি,
প্রশান্তি ও আনন্দ নিখিলে

৫.
ইরান বিরান নয়
এসেছে কি নব জাগরণ,
স্মৃতিতে থাকবে তুমি
জানি জানি, জানি আমরা।

সিন্দাবাদ

আবুল খায়ের মুসলেহ্ উদ্দিন

উর্মিল সমুদ্রে পাল তুলে দাও দৃঢ় হাতে
নির্ভীক নাবিক সিন্দাবাদ
আকাশে আওয়াজ তোলে তোলো ধ্বনি প্রতিধ্বনি
বজ্রনাদে বলো জিন্দাবাদ।

দিগন্ত আঁধার ঝড়ে, ঘূর্ণিবাত্যা কষাঘাতে
ছিন্ন খাড়া মাস্তুলের পাল
ইস্পাত কঠিন এতে ভয় নেই মুমিনের
শক্ত হাতে ধরে থাকো হাল।

সমুখে সুবর্ণ দিন, সূর্য ওঠে বিজয়ের,
তূর্যনাদ, বুলন্দ আওয়াজ
জনতার কোটি কণ্ঠে, মিছিলের কলরোলে
রাজপথ মুখরিত আজ।

ঈমানের দ্যুতি যদি বুক জুড়ে, কালেমায়
কণ্ঠ যদি উদাত্ত উদাব
সঙ্গী তবে মহান মহিম প্রভু, বিশ্বাসীর
জন্যে তাঁর করুণা অপার।

Ayatullah Ruhullah Khomeni

A A Rezaul Karim Chowdhury

(1)
Five years back thou shook off thy mortal coil,
And left the splendour of thy immortal soul
On this unhappy planets, broiling soil
The beauty, majesty and glow of thy being
Thy song, slogan, speech, voice and feeling
Still ring and ring
On a great opening and flowering
Into our ears, hearts and beings
With splendid magnificent meanings
For faith, Iman, Islam and Kalema
In a world torn, tormented by matter and spirit's dilemma
Thou hath pronounced and established the conquest of spiritover matter
Thou hath trampled super powers with the help of Supreme power
Indeed thou art the Saint Saviour
A great, grand, lefty symbol and triumph tower
Thou hath fulfilled the great meaning of thy name,
As a sign of Allah-Ayatullah-Thou shine infame
As a spirit of Allah-Ruhullah-thou-faced two modern devils
And hath shown the way to save man from their ills,
Thou hath expelled all enemies within of Islamic Revolution
Holding high values of Islam and Iran
Thou hath set up a society in Iran
Where men, women, high, low enjoy due status
Where Mahmud and Ayaz
Stand side by side in Namaz
Bow, prostrate, uniformly with Allahu Akbar away
Now that the oppressors are gone
The oppressed are coming on and on
New Iranian Social order based on Islam

Has rescued man from Shahi Jahannam.
Oh Allah Almighty! Glory be to thee,
Thou hold the key
To success here and hereafter,
With Khomeni thou hath opened a new chapter
Thou hath put him up as an answer
To the prayers of a troubled world order capitalist
Created by atheist demons, polytheist beast sand capitalist
dragons message and his pinions
Whom to beat and defeat Ruhullah has spread
Believers of the world unit -Oh Ruhullah thy mighty
In Symphony with Quran's-"Hold-fast together
The Rope of Allah," - is a signal prisage
To the death, drowning and destruction
Of new Nimrod, Pharuo and Karun
With swollen pride they are now grown
To kill Muslims all the world over
Vandalising Mosque, Minar and tower.
Trinity, Trishool and the Zionist snake
Have joined hands to shake
The believers away from faith and life
Stagged everywhere harrowing slrife
Each day Ashura, Karbala each land
This is the slogan of Believers
With the banner of Tauhid in hand
Come, come, Muslimeen from each land
Line up with Ruhullah's army band
Fight foes within and without
Pronounce death for every Rushdie
Who are fed by Judo-Hindu-Christian ghee
Shake off all enemy tentacles
Break, break, all shackles
Miracles after miracles have been displayed
Through Ruhullah's noble soul
They, are meant to show and restore
The lost goal of mankind;
8 years war engineered by devils
Oh thy people
Oh Ruhullah, has methed into the air like a bubble

Those who acted on devils behest
Have reaped and are reaping their harvest
Death and devastation Carter Abrahas
Elephantine commandos
Quelled, silenced all devils' raving bravados
Thou hath faretod collapse of
Atheist Marxist communism
The world now wathces the terrible
Trails and sequence of Marxist anarchism
For Morted Rushdie your sentence of death
Obliges the hiding wondering beast
To hold a life with suffocated breath
Al Quds initiated by thee
At the end of Ramzan
In days of Nazath
To kill the Zionist snake
Thou hath opened the path
Sha's overthrow is a great miracle
We shall always call and recall.
Blessed be thy being, seir, savant Ayatullah
Thou hath awakned in us a fortified hope
No more shall we in darkness grope
Taohid-we shall hold aloft
From it we shall budge not
Follow shall we the Prophet's beaten Path
Shall Combine Jehad with Monazath
Mix tears with blood
Bring Noah's flood
Thine is Noah's are
Floating safe its bark
Our sighs on high heaven overcast
Shall turn into Hud's blast
Our prayers and prostrations on earth
Against our killers
Shall shake the earth
With rumbling noise and quake
An wipe out today's Ad and Samud,
Protagonists of Sodom's homosexuality
Highway robbery, open air Parkian crimes

Oh Lord of all the worlds
Destroy them-lock, stock, barrel
With Aids, volcanic eruptions
Stony rains, earthquakes
And and nuclear explosion.
Ayatullah's body is gone, his ideals shine
They are growing like luxuriant eglantive
Blooming and blossoming with great fragrance
With Taohidi, Risalati and Shahidee magnificance
Bosnia, Algeria, Hind, Kashmir and Palestine
Everywhere Safar-e-Shahadath is in line
The way Ruhullah has shown
The flag Ayatullah has flown
The ideal Khomeni has blown
Far and wide we have known
Marhum Imam is the Harbinger of Mahdi
A remedy to all the world's malady
Face to face with one eyed Dazzal
Help us, O Lord with Mahdi's advent
Help us O Lord with is as breath
Hasten O Lord the battle of Armagedlon.

খোমেনী খোমেনী

মরহুম মেজর (অবঃ) এম, এ, জলিল

খোমেনী খোমেনী খোমেনী
না না না মরেনি মরেনি
দুস্থ দুঃখীর দিশারী
মানবতার প্রহরী
সভ্যতা তোমার কাছে ঋণী।।

হে রুহানী ধ্যানী
হে তাপস আপোষহীন জ্ঞানী
বিশ্বে এনেছো আলোর ঝলকানি
সভ্যতা তোমার কাছে ঋণী।।
তুমি তো নীতিবাদী
তুমি সত্যবাদী
তুমি যুগশ্রেষ্ঠ জেহাদী
সভ্যতা তোমার কাছে ঋণী।।
হে রাহবারে উম্মতি
হে যোদ্ধা ইমাম সমাজপতি
হে ইসলামের কাণ্ডারী
সভ্যতা তোমার কাছে ঋণী।।
মুসলমানের পূর্ণ জাগরণী
হে মহাত্মা তব আত্মারই ধ্বনি
দিকে দিকে আজ উঠিয়াছে রণি
সভ্যতা তোমার কাছে ঋণী।।
জগতের যত রুশদী
কাফের মুশরিক ইহুদী
শুনে নাও বেঁচে আছে খোমেনী
সভ্যতা তোমার কাছে ঋণী।
তুমি নাই তোমার বাণী
তুমি নাই তোমার কাহিনী
জানি জানি তোমার সকল নির্দেশ জানি
সভ্যতা তোমার কাছে ঋণী।।

IMAM-E MUJTAHID-O-INQELAB-E-IRAN

JAMAL MASHRIQUI

O the land of Hussainy's courage Salute to thee
The Crusade of life gracefully moves along thy Valley
The Veils of Communism lacerated by the stroke of thy perceptions
O the mark of Imam's strong emotions.

In the waves of thy rivers there is restless effect for human kind
The whirl-wind has bloomed roses in thy barren land
Thy song of religion is recited in thy mountaineous regions
O the Country of prosperous conslusion.

The plectrum of thy speeches is story of future information
The Milkyway of Science and Arts is Scattered from every Stairs and doors of Thine
The star of thy greatness existing from heaven to heaven
O the Hussainy's Caravan.

Thy drinkers have learnt discipline of drinking toast
Now no wickedness is poured from the goblet of thy tavern
The SAQI has broken the glass of absurdity into pieces
O the Lord of torrent illumination.

The brilliancy of the Sun is doomed in thy atom
In thy breast there is book ensuring life's wisdom
The West is perplexed with thy reasoning
Thou art trustworthy of revolution.

Every moment of thine is the forerunner of life's dignity
Thy face is justice thy grace is democracy
Thy sons have demolished the arrogant throne & Crown
O the heral of existence and being.

In the pride of thy leadership Self respect is boisterous
There lies the charactor of the Prophet's Grandons in thy Valorous
Thy sympathisers attained the Karbala's smartness
O the breaker of the enemy's ranks absurd

اُردو مجلس بنگلہ دیش

امامِ خمینی رحمۃ اللّٰہ

جمال مشرقی

تو کہ جس کی ٹھوکرون مین تاج شاھی ہے وقیع
تو کہ اِک مرد قلندر تو کہ اِک عالی مقام

تو کہ جس کی ضرب سے درکا حصارِ کوہ قاف
تو کہ جس کی فکر سے مسکانقابِ سُرخ فام

تو کہ جس کی زندگی جہد مسلسل کی دلیل
تو کہ خوش خُلقی کاپیکر تو کہ تیغ ہے نیام

تو کہ ھے جس کی فراست کا زمانہ معترف
تو کہ ھے جس کی سیاست مین اُخوت کاپیام

تو کہ جس سے گمر ھی کو مل گئی ھے آ گھی
تو کہ جس نے تیری گی کو روشنی بخشی تمام

تو کہ جس نے وقت کی آواز کو دی شُعلگی
تو کہ جس کے عزم سے جمھور کا قائم نظام

تو کمالِ عشق کی منزل شعورِ زیست تو
تو امین سطوتِ صدق وصفا فکرِ دوام

تو جبین وقت پر تحریر شانِ کردگار
تو نشانِ حُرّیت سبط پیمبر کا غلام

اے حُسینی جرأتون کا مظھر کامل امام
اسلام واسلام واسلام واسلام

রাখালের বাঁশির সুরে

সিরাজুল হক

রাখালের বাঁশির সুরে একদিন
জেগে উঠে লক্ষ-কোটি প্রাণ,
যুগ যুগ সঞ্চিত ইতিহাসের
হলো উন্মেষণ।

মুক্ত বিহঙ্গের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়ে এলো রাজপথে, পতঙ্গের মতো
ঝাঁপ দিল স্বৈরাচারীর প্রজ্বলিত
দাবানলে, পরম মুক্তির তরে
মানুষ অগনন।

আস্বাদিতে মুক্তির স্বাদ, পরেছিলো গলে
শাহাদাতেরই বিজয় অর্ঘ্য তারা
সাক্ষী তার এই বেহেশতে জাহ্‌রা।
মদমত্ত দর্পীর দুঃশাসনের হলো অবসান
তিমির অমানিশাভেদী হলো এক
নবীন দিনের আগমন।

কি অবাক কাণ্ড! অশান্ত এই ধরণীর 'পরে
চারিদিকে পড়ে গেলো সাড়া, এলো এক
নতুন জোয়ার রেঁনেসার শত শতাব্দী পরে
এই পৃথিবীতে-উচ্ছল প্রাণ;
প্রাণভরে বিশ্ব মানবতা আজ
গাহে ফের নব জীবনের গান।

কত আশা মনে, কঠিন অবরুদ্ধ জীবনে
মুহূর্তের তরে মুক্তির স্বাদ
আস্বাদিবে আজ মানব সন্তান;

তাই মুখে সবার লা-শারীক আল্লাহ ....
তূর্য ধ্বনি, আর চারিদিকে
গগনভেদী শ্লোগান।

সহসা থেমে গেলো নট-নটিনী-বারাঙ্গনার
অতৃপ্ত কামনা-বাসনার সনাতনী আয়োজন,
থেমে গেলো পৈশাচিকতা মুহূর্তের তরে
খোদার দেয়া এই জমিনের 'পরে।

কম্পিত পদে করিল প্রস্থান
অভিশপ্ত শয়তান,
শোষণে-শাসনে যার একদিন
প্রকম্পিত হয়েছিলো সারাটি জাহান।

হলো বিতাড়িত সে সব ঘাতকের দল
হায়েনার বেশে নিয়েছিলো কেড়ে
রাতের অন্ধকারে এক দিন
দুঃখিনী মায়ের আদরের ধন।
বাজপাখীর মতো নিয়েছিলো কেড়ে
অলক্ষে যুবক-যুবতী অগনন,
হিংস্র দানবের মতো করেছিলো বধ
সাক্ষী তার এই "লবন হ্রদ"।

কোথা সে তখতে তাউস!
কোথা সে শ্বেত মর্মরে গাঁথা
অনুপম বালাখানা জালিমের,
সকলই হয়েছে নিঃশেষ প্রলয়ের ডাকে-
যেন এক খণ্ড কিয়ামত।

কোথাও জনাকীর্ণ নগরীর প্রাণ কেন্দ্রে
অথবা শৈল চূড়ে নিবিড় বনচ্ছায়ে,
কোথাও সফেদ-নীলাভ সমুদ্র তীরে
আজও দাঁড়িয়ে আছে কালের সাক্ষী হয়ে ....

সবুজের সমারোহ আর অঢেল সৌন্দর্য এসে
যেথা এক দিন চুমু খেতো
জালিমের ললাটে ললাটে।

দাঁড়িয়ে আছে ক্ষুধিত পাষাণের মতো
একঠাঁই নিঝুম-নিস্তব্দ
বালাখানাগুলো, দাঁড়িয়ে আছে
প্রায়শ্চিত্যের প্রহর গুনে গুনে।

সেখানে নাই আজ নূপুরের ধ্বনি
নর্তকীর,
আর না আছে আনাগোনা
কিংকরীর,
যেথা চলে না শরাব শিরাজী – প্রগলভতা,
চলে নাকো উৎকট আনন্দ অভিসার–
আর আস্ফালন,
মুহূর্তের প্রলয় নিনাদে
হয়ে গেলো সব খান খান।

এইরূপে এ মর্তের পৃথিবীতে
রচিত হয় ইতিহাস বারংবার।

দাঁড়াও পথিক! অপলক নেত্রে
করো অবলোকন মুহূর্তের তরে ....
জিন্দেগীর এ চরম পরাভব।
দেখে যাও এ পৃথিবীর শাহেনশাহী,
দেখে যাও দাম্ভিকের নির্মম পরিহাস,
দেখে যাও এ বিজন বিরানপুরী,
যেথা নাই কোন প্রাণ স্পন্দন
আর না আছে সাড়া
আমি একদিন দেখে এসেছি
শয়তানের এই চিড়িয়াখানা।

[৪, কুচেহ বানেহ (আমীর আতাবাক), তেহরানঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ ইং]

ইমামের উষ্ণীষ

হাসান আবদুল কাইয়ুম

আমি স্বপ্ন দেখি একটি পরিচ্ছন্ন দিনের
একটি মানচিত্রের মনন গভীরে
আমার আত্মার উচ্চারণ শুনি
আমার চৈতন্য নদী সমুদ্রের ওপারে
উত্তোলন করে একটি পতাকা
যেখানে সোনালী সন্ধ্যা চাঁদের সুষমা ছড়ায়
একজন মর্দে মু'মিন সফেদ শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত নূরানী অবয়বে
ঋজুতার বৈভব মেখে অগ্রসর হন উদ্দীপ্ত পদক্ষেপে
প্রশস্ত পেশানীতে তাঁর সমুজ্জ্বল সময়
শান্ত সুনিবিড় জীবন স্পন্দিত প্রাজ্ঞ প্রাণ
আলখিল্লার আস্তিনে তাঁর প্রলম্বিত সমগ্র পৃথিবী
মিছিলে মিছিলে ভরে ওঠে নগর বন্দর শহরে পথ
জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে বুলন্দ আওয়াজঃ
খোশ আমদিদ হে রাহবার, হে ইমাম
সহসা স্তব্ধ হয়ে যায় শোষকের দীঘল জুলুম
কলো উষ্ণীষের শীর্ষে জাগে প্রশান্তির পয়গাম
আমার চৈতন্য নদী সমুদ্রের এপারে বিস্ময়ে বিমূঢ়
তাকিয়ে দেখে এক ঝাঁক শব্দের সান্নিধ্য সুষমা
বিদগ্ধ পর্বত যেনো নির্ঘাত তরঙ্গ তুলে
এগিয়ে আসে বিমোহন বিম্বিত বিভায়
নিকষ কালো অন্ধকারে প্রচন্ড আলোর গতিতে
আমি সময় শুনি বিস্ফোরণের
হে নদী ঝড় হও এখানে এই সবুজ চত্বরে
ইমামের উষ্ণীষে দেখো যুগান্তের আহবান।

বিপ্লব ও মহান ইমাম

আবদুল মুকীত চৌধুরী

মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত 'ইজমে'র অপমৃত্যু দেখে
তোমার নিয়তি নিয়ে অঙ্ক কষা ভুল
পাশ্চাত্যের পন্ডিতেরা চুলচেরা বিশ্লেষণ শেষে
তেমন সিদ্ধান্তে গেলে হাস্যকর ভবিষ্যদ্বাণী
আক্কেল গুড়ুম আর বেধড়ক নাকানী-চুবানী
বুদ্ধির উর্ধ্বে এই মার
এ বিপ্লব বলে গেলো, 'বিজ্ঞ বন্ধু'রা হুঁশিয়ার।

স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে
এ বিপ্লব আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়েছে
সার্বভৌম মর্যাদার ভাষ্য দিয়েছে।
দুই মেরু বিপরীত-শোষণের এপিঠ ওপিঠ;
আদর্শের ভিন্ন অবস্থান-
মানুষ ও রাষ্ট্র এর অভিধানে পেয়েছে সম্মান।

এ বিপ্লব বলে গেলো শিয়া নয়, সুন্নীও নয়
নির্যাতিত আজ মুসলমান
এবার দাঁড়াতে হবে শীশাঢালা প্রাচীর সদৃশ
একতার বিকল্প নেই
এবং জানিয়ে দিলো
ঐক্যবদ্ধ এ জনতা বিজয়ী হবেই।

বিপ্লব দিয়েছে সেই বিশ্বাসের ভিত
যেখানে কথিত 'মোল্লা' রাষ্ট্র পরিচালনায়
কেরদানী দেখায়।
অবাক বিস্ময়
মুরুব্বীরা মারপ্যাঁচে লজ্জানত হয়।

সর্বহারা শোষিতের মুক্তির মিছিলে
আমরা নেতৃত্ব দেবো
এ বিপ্লব তাও বলে গেলো
বলে গেলো 'মুসতাদ্‌আফীন'
তোমাদের জন্য হোক পৃথিবীর সমাগত দিন।

এ বিপ্লব ভূমিষ্ঠ যখন
পৃথিবীর দুই প্রান্তে ক্ষমতার সশরীরী নর্তনকুর্দন
কেমন তিলিসমাত
প্রবল অভ্যুত্থানে একজন হলো কূপোকাত
অন্যজন ব্যস্ত ঘরে নেভাতে আগুন
কাঁচের গ্লাসের মত ভেঙ্গে চৌচির
আশ্চর্য কাহিনী এই এ কালের ইতিহাসে নেই
ব্যর্থ সব ভাষ্যকার এ অংকের হিসাব কষেই।

এ বিপ্লব অনাগত বহু বিপ্লবের
কেন্দ্রীয় সূতিকাগার
আগামীতে এই ইশতিহার
শৃঙ্খলিত পৃথিবীর বিধ্বস্ত বহু জনপদে
মজলুম মানুষের রক্তস্নাত আত্মার পরতে পরতে
দেশে দেশে চালিয়ে দেয়া রাষ্ট্র-যন্ত্রণায়
ছড়াবেই বিপ্লবের গান
এ বিপ্লব অগণিত নৈশ তাঁবুর
দুঃসহ রাত্রি শেষঃ ঘুমভাঙ্গা ভোরের আযান।

তোমার আগমনে

মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান

তোমার আগমনে হে প্রিয়!
কী অবাক করা সাজে রঙিন এ শহর
কতো অনিদ্র রজনী কেটে যায় অধীর
অসহ্য প্রতীক্ষায়
নগরের অলিগলি মাঠঘাট ধুয়ে হয় সাফ
যেনো নিশিতে পতিত সুঁই-ও তোলা যায়
গোলাবপাশ ছড়ায় মাতানো সুঘ্রাণ
কাশানের কামছার থেকে আনীত গোলাব জল
জমিন থেকে তাই এবার গগন পানে
পবিত্র সুরভী উড়ে
অবশেষে আসে সেই মহালগন
সারা আসমান জুড়ে ছড়ানো
কলেমার মহাপতাকা উড়িয়ে
ঘটে তোমার আগমন
কোটি কোটি হাত জানায় আদরের আবেশ
ক্ষণিকের জন্যেও নীরব নয় দরুদ আর
তকবিরের রেশ
তোমায় দেখে উল্লসিত জনতার মুখ
যেনো শিরাজের ফুটন্ত গোলাপ
অসহায় মজলুমের বুকে আসে দুর্দান্ত প্রতাপ
তোমার আগমন দেখে
খিড়কী পথে এফ্রিত ছুটে পালায়
ফেরেশতার আগমনে যেন দানবের প্রস্থান
জা'য়াল হাক্কু ওয়া যাহাকাল বাতিল
আহা! কি অপূর্ব উল্লাস সর্বহারার মনে
বিজয়ের উষালোক ছড়ায়
আড়াই হাজার বছরের অমানিশা শেষে
শহীদদের সুখময় বাগিচা বেহেশতে জাহরায়
সাফ সাফ বলে দিলে তুমি এ ইলহামী ঘোষণা ঃ

"শাহী সরকারের মুখ গুঁড়ো করে দেবো
করবো ঐশী সরকার গঠন।"
আহা! কি অবাক উল্লাসে ফেটে পড়ে বঞ্চিত মুস্তাযাফ
অথচ নিয়াভারান শাহী ভবন থেকে শুরু করে
ক্রেমলিন হোয়াইট হাউজে ছড়িয়ে পড়ে
আতঙ্ক ও ধসের আঘাত
তাই এমনি অলৌকিক আগমন
হে প্রিয়তম ঘটুক বারবার
ফলুক জালিমদের উপর চির অভিসম্পাত
হে প্রিয়তম! অব্যাহত থাকুক তোমার জ্যোতির্ময় পথ
প্রতিশ্রুত মাহদীর আগমন তক।

ইমাম

আবদুল হাই শিকদার

বাতাসে বারুদ ক্ষত-বিক্ষত
আকাশে আকাশে মেঘ
ক্ষুধিত ব্যথিত মানুষের আহাজারী
আহরিমানের কুমন্ত্রণায় দলিত মখলুকাত
আমুদরিয়ার কিনারে কিনারে হত্যার তাণ্ডব

পাখিরা সেদিন শিখেছে হিংসা
সঙ্গীত গেছে দরিয়ার নোনা জলে
ইস্পাহানের গোলাপ বাগানে পিশাচের বিভীষিকা
মানুষের খুনে তেহরান লালে লাল
দিওয়ান হাফিজ সিরাজের গোরে লজ্জায় মরে থাকে

আকাশে ইরান দেখেনিকো পাখি
বাগানে ছিলো না ফুল
গোখরোর মতো ঘৃণ্য জাহহাক
ভয়াল অন্ধকার
হৃদপিণ্ডের দিকে তাক করে রেখেছিল বল্লম
তুসে নিভেছিলো প্রভাতের আলো
ফেরদৌসের কালাম

জাহহাকের দাঁত হামানদিস্তা ক্রুদ্ধ বুলডজার
শাহনামার চরণে চরণে বেদনা বৃষ্টিপাত
হাতির দাঁতের কিংখাবে মোড়া ফায়জিয়ারের পথে
লণ্ড ভণ্ড পড়ে থাকে মৃত সোনার আতরদান
কোমের রেহেলে কেঁপে ওঠে কুরআন

পাহলভিদের টেবিলে তখন বিয়ারের উল্লাস
নগ্ননারীর দেহের লাস্যে মূর্চ্ছা গিয়েছে ইরান
মূর্চ্ছিত দেশে পেন্টাগনের গলিত পুঁজির ঢেউ
মিনারের সব মাথায় মাথায় পশ্চিমী বেনো হাওয়া
নগ্ননারীর দেহের লাস্যে মূর্চ্ছা গিয়েছে ইরান

ইরান অপেক্ষা করে কায়ুমুরসের জন্য
ব্যাঘ্রচর্ম পড়ে নেমে আসবে প্রবল পুরুষ
ইরান অপেক্ষা করে ফারিদুনের জন্য
জাহহাকের খুনে যে দূর করবে ইরানের সব গ্লানি
ইরান অপেক্ষা করে কায়খশরু ফরেঙ্গীস
মার্কিনী আফ্রাসিয়াবের হাত থেকে
উদ্ধারের আগুন নিয়ে আসবে সে আর কবে
ইরানের আত্মা হৃদয় বিছিয়ে অপেক্ষা করে
নতুন কালের রুস্তম কই রাক্ষসের পদধ্বনি
রাহবর কই মানুষের রাহবার

রক্ত ও ঘৃণার মধ্যে ইরান মুহ্যমান
অথচ আকাশে তখনও দেখি না জিবরাইলের ডানা
আসে না খোদার বার্তাবাহক শান্তির নব নবী
নবীরা আসে না তবুও খোমেনে একদিন কাঁপে মাটি
নীল আসমানে কেঁপে ওঠে ঝড় মানুষের মুনাজাতে
আলবুর্জের শিখরে শিখরে পাথরের মারহাবা
গাছেরা দোলায় সবুজ পতাকা নূরের তাজাল্লিতে
হাজেরার কোলে এ কোন শিশু এমন মোহন রূপ
পিতা মুস্তফা শোনে সেই মুখে শাহাদাৎ উথলায়

এতো শিশু নয় হাজেরার কোলে নতুন ইসমাইল
যেন বনি ইসরাইলের মধ্যে এলেন মূসা
যেন সিন্ধুর কিনারে দাঁড়ালেন মুহাম্মদ বিন কাশিম

মুহূর্তে গনগন করে দেশ–রাহবর ওই এলো
টগবগ করে ফুটে ওঠে দেশ–রাহবার ওই এলো
শত যন্ত্রণা ফুল হয়ে ফোটে–রাহবার ওই এলো

ইমাম তুমি তাকালে সামনে জালিমের জিন্দান
ভেঙ্গে খান খান নমরুদ আর ফেরাউন ভূপাতিত
ইমাম তুমি দু'হাত বাড়ালে ওমনি ফুটলো গোলাপ
বারুদে বারুদে জাগালে দারুণ জীবনের অংকুর

ইনসানিয়াত তোমার গর্বে পৃথিবীর পথে পথে
ফেরি করে আজ নতুন শরাব স্বপ্নের কলরব
সাম্য শান্তি মৈত্রীর বরাভয়

আলজেরিয়ার পথে পথে আজ তোমার জিন্দাবাদ
মালয়েশিয়ার বন মর্মরে তোমার জিন্দাবাদ
বুখারার প্রতি ইটে ইটে আজ তোমার জিন্দাবাদ
কাবুলের প্রাণ সারারাত জাগে তোমার জিন্দাবাদ
বসনিয়ার সব ব্যথিত শিশুরা তোমার জন্য কাঁদে

ইমাম তোমার আলখেল্লায় আবে হায়াতের ছায়া
দু' চোখে তোমার মুহাম্মদের প্রেম
যুদ্ধ ও প্রেমে মহিমান্বিত আলীর জুলফিকার
আলবুর্জের শিখরের চেয়েও মস্তক যার উঁচু

বাংলাদেশের গৃহকোণে বসে মজলুম চঞ্চল
ইমাম এখানে হোসেন ও এজিদে প্রতিদিন কারবালা
প্রতি ময়দানে বুকের রক্ত সিমারের হাতে ঝরে
গলিত পুঁজির বিকারে সবুজ কাশেম হয়েছে হত
আগ্রাসনের মুখে টলমল পালিক ভালোবাসা

ইমাম এখানে বজ্রের মতো জ্বলে ওঠো কল্যাণ
জং ধরা সব বক্ষে জাগুক জিহাদের গর্জন
তোমার মোহন রূপের মদিরা ইমাম এখানে দাও
সখিনার শোক ধুয়ে মুছে নেবে এমন নিশান উড়াও

ইমাম তোমার আলখেল্লায় আবে হায়াতের ছায়া
ইমাম তোমার কণ্ঠে আমার মুহাম্মদের নাম

মর্দে মুমিন

মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

মর্দে মুমিন জাগিল আজ ইসলামের ঐ ঝাণ্ডা নিয়ে,
মরণ আঘাত হানিছে দেখ শয়তানের ঐ বক্ষে গিয়ে।
উদিল আজ ইসলামেরই সূর্য পুনঃ দুনিয়া জুড়ে,
নয়া জাহেলী অন্ধকারের বক্ষ চিরে তারই নূরে।
নমরূদের ঐ তখত ভাংলো, ভাংলো আশা ফেরাউনের,
ইব্রাহীমের বজ্র নিনাদ হাঁকছে দেখো বীর ইরানের।
ডাকে আজ–মুসলিম জাগো ইরান থেকে বীর খোমেনী,
ক্রেমলিনে শ্বেত–প্রাসাদে কাঁপন এলো ঐ যে শুনি।
জাগল আজি দেখ্ ইরানে ইমাম মেহদীর বীর সেনারা,
ঝড়ের বেগে যায় এগিয়ে নিপাত যাবে দাজ্জালেরা।
রুশ–আমেরিকা ধ্বংস হউক, নিপাত যাক ইসরাঈল,
মজলুম যারা হোক মুক্ত হাঁকে আজান সিংহদিল।
মোরা মুসলিম মসজিদে আকসায় পড়ব নামাজ বিজয় বেশে,
দলিয়া মথিয়া ইসরাঈল নাপাক, যেতে হবে সেই তীর্থ দেশে।
হবে আফগান মুক্ত মুসলিম হাঁকিতে আজান কণ্ঠ মেলে,
হবে আফগান মুক্ত মুসলিম হাঁকিতে আজান কণ্ঠ মেলে,
হবে খান খান রুশ–ক্রেমলিন, বুখারার যাবে দুয়ার খুলে।
জাগে লেবানন ত্যাগী মুসলিম হানে আঘাত ইহুদী বক্ষে,
শহীদের লোহে জাগে লাখ গাজী, আল্লাহ আছেন শহীদ পক্ষে।
ফিলিস্তিন ফের হবে মুক্ত ইসরাঈল সে যাবে নিপাত,
মার্কিন তিলিস্মা হবে নিঃশেষ হয়ে বীরদের বুলেট পাত।
জাগো মুসলিম, ধরো অস্ত্র, পরো রণসাজ যাও এগিয়ে,
দেখো দুশমন শংকায় তোর কাঁপে ঘনঘন যায় পালিয়ে।
তুমি বীর উন্নত তব শির আল্লাহর আশীস তোমার 'পরে,
দেখো উর্ধ্বে ফেরেশতা গগনে সাজে রণসাজ তোমার তরে।
এক আল্লাহর সৈনিক তুমি তোমার বক্ষে পাক কোরআন,
মুখে কলেমা হাতে অস্ত্র তোমার রক্তে মিশা ঈমান।
বাতিলের যত ঝড়ের মোচড় আছড়ে পড়বে তোমার পায়ে,
বাজায় ডংকা মুক্তি আজান মজলুমেরা ঐ তোমায় পেয়ে।
ওহে মুসলিম, ওহে রণবীর, ওহুদ বদর তাবুকের বীর,
আজি কারবালা খুঁজিছে তোমায়, ডাকে কলকলে ফোরাতের তীর।

(রচনাকাল ঃ ১৯৮৪)

ইমাম

সৈয়দ মূসা রেজা

ক. ইমামের ডাক শুনে
ঘুম ভাঙ্গে শত নিঃস্বের
ইমামের দুশমন, দুশমন আমাদের
দুশমন সারা বিশ্বের।

খ. চোখ মেলে তাকালে গোলাপ
সাগরের ঘন নীলে
আলোকের ঝিলমিলে
নিজের ভেতরে শোনে হৃদয়ের তাপ!
জোয়ারের কলতানে শোনা যায় নাম
উদ্বেল আসমান
মাতোয়ারা এই গান
ঈদের অনন্ত চাঁদ ইমাম ইমাম।

গ. ঘুম আসেনি, ভুখ কমেনি রাত্তিভর
দেহের গগ্নে মেদ জমেছে কামনা-জ্বর
কাস্তে হাতুড়ি লাঙ্গল কোদাল সব অবাক
শরীর নিয়ে যে অনেক হয়েছে-এবার থাক
অমর আত্মা এবার না হয় দেহ জুড়াক
ভুখার নামেতে গলাবাজরা নিপাত যাক
ভুখা মানুষের জীবন হতে যে রাত্তি সাফ
ডাক দিয়েছে ইমাম, জাগে 'মুস্তাযাফ!'

ঘ. এই যে তলোয়ার
থাকবে না এর ধার
সূর্যও মেঘে ঢাকা পড়ে
আল্লাহ্‌র নেয় নাম
মন জুড়ে ইমাম
সত্যের পথে যারা লড়ে
অবিরাম বারবার
দুর্জয়দুর্বার!

আল্লাহ্ তো তাঁর উপর রহমত নাজিল করবেনই

আহছান–উস–সামী

কম্যুনিজমের কঙ্কাল একদিন
যাদুঘরে রাখা হবে জানি নিশ্চয়,
হে গর্বাচেভ সত্যকে মেনে নিন
ইসলাম দেবে শান্তির বরাভয়।

এ তো সেই বাণী, যে বাণী ইব্রাহিম
শুনিয়েছিলেন নমরুদকে একদা
ঊষর মরুতে এই বাণী রিমঝিম,
যুগে যুগে সব ফেরাউন সর্বদা –

ঈমান না এনে ডুবেছে অথৈ জলে;
ওদের মৃত্যু যেন বিড়ালের বমি,
ওদের রাজ্য ছেয়ে গেছে জঙ্গলে
যাদুঘরে ঠাঁই পেয়েছে ওদের মমি।

শ্বাপদ মুক্ত আজ ভলগার তীর
মেঘ ভেঙ্গে নামে স্বাধীনতা রোদ্দুর,
মনে পড়ে যায় সেই মহা মনীষীর
অমোঘ সে কথা, যে কথায় ভঙ্গুর –

সমাজবাদের ইমারত গেল ধ্বস,
তিনি নবী নন তিনি খাঁটি উম্মত
শেষ রাসুলের, আল্লা'র সন্তোষে
ভেঙেছেন তিনি জালিমের সুখ–তখ্‌ত্।

ইমাম খোমেনী–অবিনাশী এক নাম
ইমাম খোমেনী–অত্যাচারীর ত্রাস
এই নামে নেয় মরুচারী বিশ্রাম
মরুদ্যান সে নাম মধু–নিশ্বাস।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ঢাকা, বাংলাদেশ